প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬০
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

সূচী

লেখক প্রসঙ্গে

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের বিতর্কিত পুরুষ ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের জন্ম ১৮৮৫ সালে, নটিংহ্যামশায়ারের ইস্টউডে। মধ্যবিত্ত এক খনি-শ্রমিকের সংসারে পাঁচটি সন্তানের মধ্যে ডেভিড ছিলেন চতুর্থ। মা-র সঙ্গে ডেভিডের সম্পর্ক ছিলো আশ্চর্য নিবিড়।

ছেলেবেলায় প্রথমে নটিংহ্যাম হাইস্কুলে এবং পরে নটিংহ্যাম ইউনি-ভারসিটি কলেজে পড়াশুনো করেছেন ডেভিড। পরবর্তী জীবনে ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সাল অব্দি তিনি নিজেও শিক্ষকতা করেছেন ক্রয়ডনের ডেভিডসন রোড স্কুলে। মা-র মৃত্যুর সামান্য কয়েক সপ্তাহ পরেই ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য হোয়াইট পিকক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে জেসি চেম্বার্সের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে লুই বরোজের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন ডেভিড। অথচ জেসির সঙ্গেও তিনি দেখাসাক্ষাৎ করতেন, তাছাড়া লণ্ডনে হেলেন কর্কের সঙ্গেও তিনি এক নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলেন। কিন্তু কোনো সম্পর্ককেই তিনি সার্থক করে তুলতে পারলেন না। নিদারুণ হতাশায় তাঁর স্বাস্থ ভেঙে পড়লো, বাধ্য হয়েই তিনি শিক্ষকতার জীবনে ইতি টেনে দিলেন। পরে প্রমাণিত হয়েছিলো, দুরন্ত ক্ষয় রোগের জীবানু তখনই বাসা বেঁধেছিলো ডেভিডের দেহের খাঁচায়।

১৯১২ সালের বসন্তে ফ্রিডা উইকলি নামে এক বিবাহিতা রমনীকে নিয়ে ডেভিড জার্মানীতে পালিয়ে গেলেন। ফ্রিডা ছিলেন ডেভিডের প্রাক্তন শিক্ষক, নটিংহ্যাম ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক, আর্নেস্ট উইকলির স্ত্রী। বিয়ের পর ১৯১৪ সালে দুজনে আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ততোদিনে সাহিত্যিক হিসেবে খানিকটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ডেভিড। ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে তিনি শেষ করলেন তাঁর দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস দ্য রেইনবো এবং উওমেন ইন লাভ।

ডেভিডের রক্তে ছিলো যাযাবরী নেশা। মহাযুদ্ধের পরবর্তী দিন-গুলোতে সিসিলি থেকে সিংহল, অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউ মেক্সিকোর পথে-প্রান্তরে অক্লান্ত আগ্রহে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন এই উদাসী পথিক। অবশেষে স্বাস্থ্যের কারণে এবং বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে ১৯২৫ সালে তিনি আবার ইউরোপে ফিরে এলেন। কিন্তু আরও অনেক প্রতিভাবানের মতো ডেভিডও শেষ জীবনে শান্তি পাননি। ১৯২৮ সালে তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস লেডি চ্যাটার্লিস লাভার অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। আঁকা ছবিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো তার আগেই। অবশেষে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ভেনিসে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এই মহান জীবন-শিল্পীর। সেটা ১৯৩০ সাল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে লরেন্সকে সব্যসাচী বললে এতোটুকুও বাড়িয়ে বলা হয় না। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে সন্দেহাতীত। অথচ তাঁর লেখা আজও পণ্ডিত-জনের কাছে বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ বলেন, লরেন্সের লেখায় আদি রসের অহেতুক আধিক্য। আবার কারুর মতে, লরেন্স বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যৌন মনস্তত্ত্বকে ডেভিড লরেন্স তাঁর সাহিত্যে এক অসাধারণ শিল্পিত সুষমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। স্থূল দেহবাদ নয়—দেহের সোপান বেয়ে রূপ থেকে অরূপলোকে উত্তরণ সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। তাই লরেন্সের সাহিত্য কীর্তিকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

ঘোড়-ব্যবসায়ীর মেয়ে

'তা মেবল, তুমি তাহলে কি করবে বলে ঠিক করেছো?' নির্বোধের মতো রসিকতা করে প্রশ্ন করলো জো। নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই মনে করছিলো। জবাবটা না শুনেই মুখটা এক পাশে ফিরিয়ে সে জিভের ডগা দিয়ে এক টুকরো তামাক বের করে থু থু করে সেটা বাইরে ফেলে দিলো। নিজের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকায় অন্য কোনো ব্যাপারেই তার কোনো মাথা-ব্যথা নেই।

সকাল বেলা জলখাবরের টেবিলটাকে ঘিরে বসে ওরা তিন ভাই আর এক বোনে মিলে খানিকটা এলোমেলো ভাবে একটু পরামর্শ করে নেবার চেষ্টা করছিলো। সকালের ডাকে আসা খবরটা ওদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেষ আঘাতটা জানিয়ে গেছে। সব কিছুই এখন শেষ। ভারি ভারি মেহগনি কাঠের আসবাব শুদ্ধ খাবার ঘরটাও যেন বিষণ্ণ মুখে সব কিছু শেষ হয়ে যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু পরামর্শ করে কিছুই লাভ হলো না। টেবিলের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে ধূমপান করতে করতে, ভাসা-ভাসা ভাবে নিজেদের অবস্থার কথা চিন্তা করতে থাকা তিনটি পুরুষেরই চোখে-মুখে নিষ্ফলতার ছায়া। মেয়েটি এদের মধ্যে একা—খানিকটা ছোটখাটো চেহারা, বিষাদ মাখানো মুখ, সাতাশ বছরের একটি মেয়ে। ভাইদের মতো ও একই জীবনের শরিক নয়। মুখের ভাবলেশহীন কাঠিন্যটুকু না থাকলে ওকে সুন্দরীই বলা চলতো। ওর ভাইরা তাই ওর মুখটাকে বলে 'বুল ডগ'।

বাইরে থেকে ঘোড়ার পায়ের এলোমেলো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। ব্যাপারটা দেখার জন্যে তিনজন পুরুষই নিজেদের কুর্সিতে টানটান হয়ে বসলো। ওরা দেখলো, হলি গাছের যে ঘন ঝোপগুলো বড়ো রাস্তা থেকে ওদের উঠোনের ফালিটাকে আলাদা করে রেখেছে, তারই ওধারে এক পাল বড়ো বড়ো ঘোড়া শরীর দুলিয়ে তাদের উঠোন থেকে বেরুচ্ছে। এই শেষবার ব্যায়াম করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। তাদের হাত দিয়ে এই শেষ ঘোড়া বিক্রি। সমালোচকদের মতো কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তিন

ভাই। নিজেদের জীবন এমন করে ভেঙে পড়ায় ওরা তিনজনেই আতংকিত। বিপদের যে অনুভূতি ওদের জড়িয়ে রেখেছে, তা যেন ওদের মনের স্বাধীনতাকেও খর্ব করে দিয়েছে।

তবু ওরা শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে। সব চাইতে বড়ো ভাই জো'র বয়েস তেত্রিশ—সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, জৌলুসময় চেহারা, মুখখানা লাল, ভাসা-ভাসা চঞ্চল দুটি চোখ। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সে কালো গোঁফজোড়াতে পাক দিচ্ছিলো। হাসবার সময় জো' অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দাঁত বের করে হাসে। হাবভাব নির্বোধের মতো। দু চোখের অসহায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করছিলো সে। এমনধারা ভাগ্য বিপর্যয়ে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

ভারবাহী বিশাল ঘোড়াগুলো শরীর দুলিয়ে চলে গেলো। চারটে ঘোড়া, পরস্পরের সঙ্গে লেজে-মাথায় বাঁধা। বড়ো রাস্তা থেকে যেখানে একটা গলি বেরিয়েছে, সেখানকার মিহি কালো কাদা বিদ্রূপভরে বড়ো বড়ো খুরে মাড়িয়ে, উদ্ধত-উল্লাসে শরীরের শেষাংশ দুলিয়ে ওরা বাঁক নিয়ে গলির দিকে আচমকা কয়েক পা দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলো. ওদের প্রতিটি পদক্ষেপে এক প্রচণ্ড ঘুমন্ত শক্তির পরিচয়—আর সেই সঙ্গে আছে নির্বুদ্ধিতা, যা ওদের পরাধীন করে রেখেছে। প্রথম সহিসটা পেছন ফিরে তাকিয়ে দড়িতে ঝাঁকুনি দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মিছিল গলি ধরে চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে বেড়াঝোপের ওধারে শেষ ঘোড়াটার তেজময় শরীরের পেছন দিকে লেজটা শক্ত হয়ে উঠে রইলো ওপরের দিকে।

অসহায় চকচকে চোখে তাকিয়ে রইলো জো। ঘোড়াগুলো তার কাছে প্রায় নিজের শরীরটার মতো। জো-র মনে হচ্ছিলো, তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। ভাগ্য ভালো, তাই সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। মেয়েটির বাবা পাশের একটা জমিদারির নায়েব. কাজেই তিনি জো-কে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। বিয়ে করে জোয়াল কাঁধে নিতে হবে তাকে। তার সত্যিকারের জীবনটা শেষ হয়ে গেছে—এখন থেকে সে হবে একটা পরাধীন জানোয়ার।

অস্বস্তিভরে মাথাটা এক পাশে ঘোরালো জো। ঘোড়াগুলোর পায়ের শব্দ তার কানে প্রতিধ্বনির মতো বেজে বেজে উঠছিলো। এক নিদারুণ অস্থিরতায় খাবারের থালা থেকে এক টুকরো শুয়োরের মাংস তুলে নিলো সে। তারপর একটা অস্পষ্ট শিস দিয়ে, চুল্লির জালিটার কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটার

দিকে ছুঁড়ে দিলো টুকরোটা। মাংসটুকু খেয়ে জন্তুটা তার চোখের দিকে তাকাতেই জো-র মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বোকার মতো উঁচু গলায় সে বললো, 'মাংস আর বড়ো একটা পাবি না রে, হতভাগা বেজ...'

কুকুরটা ভয়ে ভয়ে একটু লেজ নেড়ে, শরীরের পেছন দিকটা নিচু করে একটা পাক খেয়ে ফের শুয়ে পড়লো।

টেবিলে আবার এক অসহায় নীরবতা নেমে এলো। একরাশ অস্বস্তি নিয়ে নিজের কুর্সিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইলো জো। পারিবারিক বৈঠক না ভাঙা অব্দি এখান থেকে তার যাবার ইচ্ছে নেই। মেজ ভাই ফ্রেড হেনরির সুঠাম, ঋজু, তৎপর চেহারা। অনেক বেশি মানসিক স্থৈর্য নিয়ে সে ঘোড়াগুলোর চলে যাওয়া লক্ষ্য করেছে। জো-র মতো সে-ও যদি একটা জানোয়ার হয় তো বলা চলে, সে এমন একটা জানোয়ার যে নিজে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে—নিজে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে কোনো ঘোড়াকে সে বশ মানাতে পারে এবং তার হাবভাবে এই সহজাত প্রভুত্বের ভঙ্গিটা একেবারে সুস্পষ্ট। কিন্তু জীবনের এমনধারা পরিস্থিতির ওপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাদামি রঙের কর্কশ গোঁফজোড়াকে সে ঠোঁট থেকে ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে, নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে বসে থাকা বোনটির দিকে বিরক্তির চোখে তাকালো।

'তুমি তাহলে কিছুদিনের জন্যে লুসির কাছে গিয়ে থাকছো, তাই তো?'

মেয়েটি কোনো জবাব দিলো না।

'তা ছাড়া আর কি করবে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' ফ্রেড ফের বললো।

'ঝি-গিরি করবে,' ছোট্ট করে মন্তব্য করলো জো।

মেয়েটির মুখে একটি পেশীও নড়লো না।

'ওর জায়গায় আমি হলে, নার্সিং শিখতে যেতাম,' সব চাইতে ছোটো ভাই ম্যালকম বললো। সে এ সংসারের 'ছোটো খোকা'—বাইশ বছরের হাসিখুশি টগবগে যুবক।

কিন্তু মেবল তার কথায় ভ্রূক্ষেপও করলো না। আজ এতো বছর ধরে ভাইরা ওকে নিয়ে এতো কথা বলেছে যে আজকাল তাদের কথা ও প্রায় কানেই তোলে না।

তাপচুল্লির তাকে রাখা মার্বেলের ঘড়িটাতে মিষ্টি সুরে আধ-ঘণ্টার ঘণ্টি বাজলো। আগুনের কাছে বেছানো কম্বলটা থেকে অস্বস্তিভরে উঠে, কুকুরটা প্রাতরাশের টেবিলে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকালো। তবু অর্থহীন

পরামর্শের নামে ওরা বসেই রইলো।

হঠাৎ জো বললো, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে উঠছি।' কুর্সিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে পা দুটো একটু ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সে ঘোড়সওয়ারদের মতো ভঙ্গিমায় হাঁটু দুটোকে নিচের দিকে একটা ঝাঁকুনি দিলো। তারপর এগিয়ে গেলো আগুনের কাছে- তবু ঘর থেকে বেরুলো না। অন্যেরা কি বলে বা করে তা জানার জন্যে সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো। তামাকের নলটাতে তামাক ভরতে ভরতে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় নাটুকে-সুরে বলতে শুরু করলো, 'কিরে যাবি না কি আমার সঙ্গে? যাবি? যেতে হবে, কিন্তু অনেক দূর যা মনে হচ্ছে তার চা তেও দূরে। শুনছিস?'

কুকুরটা আস্তে আস্তে লেজ নাড়লো। আর মানুষটা চোয়াল বাড়িয়ে, দু হাত দিয়ে তামাকের নলটাকে আড়াল করে, এক মনে সেটা টানতে টানতে তামাকের মধ্যেই হারিয়ে ফেললো নিজেকে। কিন্তু পুরো সময়টাই সে আনমনা দুটো বাদামি চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো কুকুরটার দিকে। কুকুরটাও তার দিকে তাকিয়ে রইলো বিষণ্ণ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে। হাঁটু দুটো ছড়িয়ে জো দাঁড়িয়ে রইলো একেবারে ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গিমায়।

'লুসির কাছ থেকে তুমি কি কোনো চিঠিপত্র পেয়েছো?' ফ্রেড হেনরি পোনকে জিজ্ঞেস করলো।

'গত সপ্তাহে পেয়েছি,' জবাব এলো নির্বিকার স্বরে।

'কি লিখেছে ও?'

কোনো জবাব নেই।

'ও কি তোমাকে সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছে?' ফ্রেড তবু নাছোড়।

'লিখেছে, ইচ্ছে হলে আমি তা করতে পারি।'

'তাহলে তুমি বরঞ্চ সেটাই করো। ওকে লিখে দাও, তুমি সোমবারে যাচ্ছো।'

এ কথারও কোনো জবাব এলো না।

ফ্রেড হেনরি অধীর হয়ে বললো, 'কি, তুমি তাহলে তা-ই করছো তো?'

মেবল তবু জবাব দিলো না। ঘর জুড়ে শুধু নিষ্ফল নৈঃশব্দ আর নিঃসীম বিরক্তি। ম্যালকমের মুখে বোকাটে হাসি।

'আজ থেকে আসছে বুধবারের মধ্যে তোমাকে মনস্থির করে ফেলতে হবে,' চড়া গলায় জো বললো, 'তা না হলে শান বাঁধানো পথেই তোমাকে থাকার জায়গা খুঁজতে হবে।'

মেয়েটির মুখখানা অন্ধকার হয়ে ওঠে। তবু ও চুপ করেই বসে রইলো।

ম্যালকম লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো, 'জ্যাক ফারগুসন আসছে।'

'কোথায় ' জো-র চড়া গলাতেও উচ্ছ্বাসের সুর।

'এই তো, এই মাত্র জানলাটা পেরিয়ে গেলো।'

'ভেতরে আসছে ?'

ম্যালকম দরজাটা দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকালো, 'হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। মেবল টেবিলের মাথাব কাছে অপরাধীর মতো বসে রইলো। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে একটা শিসের শব্দ শোনা যেতেই কুকুরটা উঠে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করতে শুরু করলো। জো দরজাটা খুলে উঁচু গলায় বলে উঠলো, 'আরে এসো, এসো।'

এক মুহূর্ত পরেই একটি যুবক ঘরে এসে ঢুকলো। ওভারকোট, লাল-রঙা পশমী রুমাল আর টুপিতে তার সর্বাঙ্গ মোড়া। টুপিটা আবার কপালের দিকে টেনে নামানো, সেটা সে ঘরে ঢুকেও খোলেনি। যুবকের উচ্চতা মাঝারি, মুখখানা খানিকটা লম্বা আর ফ্যাকাশে, চোখ দুটো যেন ক্লান্ত।

ম্যালকম আর জো দুজনেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো, 'আরে এসো, জ্যাক। বোসো, বোসো।' ফ্রেড হেনরি শুধু বললো, 'এসো, জ্যাক।'

'কি খবর ?' স্পষ্টতই ফ্রেড হেনরিকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলো আগন্তুক।

'সেই একই। বুধবারের মধ্যে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।... তা তোমার কি ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা লেগে গেছে।'

'তাহলে এখানেই থেকে যাও না ?'

'থেকে যাবো ? যখন আর নিজের পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারবো না, তখন যদি সে সুযোগ হয়।' যুবকের গলাটা ধরা-ধরা, কথায় স্কচ্-টান।

'ডাক্তারই যদি সর্দিতে কাবু হয়ে পড়ে, তা হলে তো চমৎকার।' জো মহা আনন্দে হৈহৈ করে বলতে থাকে, 'রোগীদের পক্ষে ব্যাপারটা ঠিক ভালো বলে মনে হয় না, তাই নয় কি ?'

ডাক্তার আস্তে আস্তে তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেন, তোমার কি কিছু হয়েছে না কি ?'

'হয়েছে বলে আমার তো জানা নেই। নিকুচি করেছে তোমার চোখের— কিন্তু কেন বলো তো ?'

'রুগীদের সম্পর্কে তোমার এতো চিন্তা, তাই ভাবলাম তুমিও তাদের মধ্যে একজন কি না!'

'মোটেই না! আমাকে কোনোদিনও কোনো হতভাগা ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি, আশা করি হবেও না।'

ঠিক এই সময়েই মেবল টেবিল থেকে উঠে পড়ায় সবাই যেন ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। থালাগুলো একত্র করে গুছোতে শুরু করে মেবল। ডাক্তার ওর দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। এসে থেকে এ পর্যন্ত সে মেয়েটিকে কুশল সম্ভাষণ করেনি। একই রকম নির্বিকার মুখে ট্রে-টা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও।

'তোমরা সবাই তাহলে কখন যাচ্ছো?' প্রশ্ন করে ডাক্তার।

'আমি এগারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরছি,' ম্যালকম জবাব দেয়। 'তুমি কি একা গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছো, জো?'

'হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে তা-ই বলেছি।'

'তাহলে আমরা বরং ওটাকে নিয়ে আসিগে চলো। চলি, জ্যাক, যাবার আগে তোমার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, তাই এখনই বিদায় নিয়ে রাখলাম।'

ডাক্তারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ম্যালকম ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার পেছনে জো। জো-কে দেখে মনে হয় যেন দু পায়ের মাঝখানে লেজ গুটিয়ে রাখা একটা কুকুর।

'সত্যি, ও একেবারে বিশ্রী অবস্থা!' ফ্রেড [illegible]-এর সঙ্গে একা হতেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি বুধবারের আগেই চলে যাচ্ছো?'

'সেই রকমই হুকুম।'

'কোথায় যাচ্ছো? নর্দাম্টনে?'

'হ্যাঁ।'

'যাচ্ছেতাই কাণ্ড!' ফারগুসনের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো বিরক্তি।

দুজনের মাঝখানে স্তব্ধতা নেমে আসে।

'তোমার সব বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে?' ফের প্রশ্ন করে ফারগুসন।

'প্রায়।'

আবার খানিকক্ষণ নীরবতার পর ডাক্তার বলে, 'তোমার জন্যে আমি ভীষণ অভাব অনুভব করবো, ফ্রেড।'

'আমিও তোমার অভাব অনুভব করবো, জ্যাক।'

'তুমি না থাকলে আমার একেবারে জঘন্য লাগবে!'

ফ্রেড হেনরি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিছুই বলার নেই। টেবিলটা সাফসুফো করার কাজ শেষ করতে মেবল ফের ঘরে এসে ঢোকে।

তাহলে আপনি কি করছেন, মিস পারভিন ?' ফারগুসন ওকে জিজ্ঞেস করে। 'দিদির কাছে যাচ্ছেন ?'

ভয়ংকর দুটি স্থির চোখ মেলে ফারগুসনের দিকে তাকায় মেবল। ওই দৃষ্টি চিরদিনই ফারগুসনকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তোলে, তার আপাত স্বস্তিকে অস্থির করে দেয়।

'না,' মেবল জবাব দেয়।

'দোহাই তোমার! তুমি তাহলে কি করতে চাও, বলো তো ?' অর্থহীন তীব্রতায় চিৎকার করে ওঠে ফ্রেড।

মেবল শুধু মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিজের কাজ করে যায়। সাদা টেবল-ঢাকাটা ভাঁজ করে, অন্য একটা ঢাকনা বিছিয়ে দেয় টেবিলে।

'এমন গোমড়-মুখো কুত্তী আর দুটো জন্মায়নি,' ওর ভাই বিড়বিড়িয়ে বলে।

ডাক্তার আগ্রহী চোখ মেলে মেবলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু মেবল সম্পূর্ণ নির্বিকার মুখে কাজ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওর চলে যাওয়া লক্ষ্য করে ফ্রেড হেনরি। তারপর নীল চোখ দুটোতে তীব্র আক্রোশ ফুটিয়ে মুখ কুঁচকে বলে, 'গাধার মতো চেঁচিয়ে ওর কান ঝালাপালা করে দিলেও তুমি ওর মুখ থেকে একটি কথা আদায় করতে পারবে না।'

ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, 'ও তাহলে কি করবে ?'

'কি করে বলবো ?

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ডাক্তার নড়েচড়ে প্রশ্ন করে, আজ রাতে কি তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে ?'

'দেখা – কিন্তু কোথায় ? আমরা কি তাহলে জেসডেল-এ যাচ্ছি ?'

'জানি না। আমার যা সর্দি লেগেছে। ঠিক আছে, আমি তাহলে মুন অ্যাণ্ড স্টারস-এ আসছি।'

লিজি আর মে অন্তত একটা রাতের মতো ফাঁকে পড়ুক, কি বলো ?'

'ঠিক তাই—যদি আমার শরীরের অবস্থা যদি এখনকার মতো থাকে।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না।'

ওরা দুজনে একসঙ্গে বারান্দাটা পেরিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাড়িটা বড়োসড়ো, কিন্তু নির্জন—এখন চাকরবাকরও কেউ নেই।

পেছন দিকে ইটে বাঁধানো ছোট্ট একটা উঠোন, তারপরে মিহি লাল নুড়ি বেছানো এক বিশাল চত্বর। দু ধারে ঘোড়ার আস্তাবল। অন্য দুদিকে, যতোদূর দেখা যায়, শীতে জীর্ণ ভিজে জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

আস্তাবলগুলো এখন শূন্য। এ বাড়ির কর্তা জোসেফ পারভিন লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তিনি ঘোড়া বেচাকেনার একজন বড়ো ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন। আস্তাবলগুলো তখন ঘোড়ায় বোঝাই হয়ে থাকতো। ঘোড়া, ব্যবসাদার মানুষ আর সহিসদের এখানে ছিলো নিত্য আসা-যাওয়া। বাড়ির রান্নাঘর ছিলো চাকরবাকরে ভর্তি। কিন্তু ইদানীং অবস্থাটা পড়ে আসছিলো। ভাগ্য ফেরাবার জন্যে ভদ্রলোক দ্বিতীয় বার বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই গোল্লায় গেছে। ধার-দেনা আর পাওনাদারের হুমকি ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

মাসের পর মাস মেবল অভাবের মধ্যে এই বিশাল পুরীতে চাকরবাকর ছাড়া একলাই ওর অপদার্থ ভাইদের জন্যে সংসার চালিয়েছে। দশ বছর ধরে এই সংসার চালাচ্ছে ও। কিন্তু আগে খরচাপাতির জন্যে টাকার কোনো অভাব হয়নি। তখন সব কিছু যতো স্থূল আর অমার্জিতই থাকুক না কেন, টাকা-পয়সার জোরটা ওকে অহংকারী আর আত্মবিশ্বাসী করে রেখেছিলো। বাড়ির পুরুষমানুষরা নোংরা ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারে, রান্নাঘরের ঝি-চাকরানিদের ধুনিদের চরিত্র সম্পর্কে বদনাম থাকতে পারে, ভাইদের জারজ-সন্তানও থাকতে পারে—কিন্তু যতোদিন টাকা পয়সা ছিলো ততোদিন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রচণ্ড অহংকারী আর সকলের চাইতে খানিকটা আলাদা বলে মনে করেছে মেবল।

ব্যবসাদার আর অমার্জিত লোকজন বাদে এ বাড়িতে তখন বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউই আসতো না। দিদি চলে যাবার পর মেবল মেয়ে-বন্ধু বলতে কাউকেই পায়নি। কিন্তু তাতে ওর কিছু এসে যায়নি। ও নিয়মিত গির্জায় যেতো, বাবাকে দেখাশুনো করতো। মাকে ও ভালবাসতো, ওর চোদ্দ বছর বয়সের সময় মা মারা যান। তাঁর স্মৃতি নিয়েই দিন কাটতো ওর। বাবাকেও ও ভালোবাসতো, কিন্তু একটু অন্যভাবে। চুয়াল্ল বছর বয়সে বাবা ফের বিয়ে করার আগে পর্যন্ত বাবার ওপরে ও নির্ভর করতো, তাঁর কাছে ও নিরাপত্তা অনুভব করতো। কিন্তু তারপরেই বাবার সম্পর্কে ও বিমুখ হয়ে ওঠে। আর এখন বাবা মারা গিয়েছেন, ঋণের মধ্যে অসহায় করে রেখে গেছেন ওদের সবাইকে।

অভাবের দিনগুলোতে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে মেবল। এ পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যেই যে আশ্চর্য জান্তব দম্ভবোধের প্রাধান্য ছিলো, তা অবিশ্যি কোনো কিছুতেই টলবার নয়। কিন্তু এখন মেবলের কাছে সমাপ্তি এগিয়ে এসেছে। তবু ও দম্ভ ছাড়তে রাজি নয়। ও আগের মতোই নিজের ইচ্ছেমতো পথে চলবে। নিজের পরিস্থিতির চাবিকাঠি চিরদিন নিজের কাছেই রাখবে। দিনের পর দিন ও বোকার মতো জেদ ধরে সব কিছু সহ্য করে এসেছে! আজ আর কেন ও চিন্তা করবে? কেন অন্য কারুর কাছে জবাবদিহি দেবে? সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, পরিত্রাণের কোনো পথ নেই— এটুকুই তো যথেষ্ট। এই ছোট্ট শহরের রাজপথ দিয়ে ওকে আর সকলের চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি চলতে হবে না। দোকানে গিয়ে সস্তা খাবার কিনে নিজেকে আর ছোটো করতে হবে না। এ সব কিছুই এখন শেষ। এখন ও আর কারুর কথাই ভাবে না. নিজের কথাও না। নির্বোধের মতো, একগুঁয়ের মতো ও যেন এক পরম আনন্দে তন্ময় হয়ে আছে। কারণ ক্রমশ ও এগিয়ে চলেছে ওর পূর্ণতার দিকে ওর মহিমান্বিতা পরলোকগতা মায়ের কাছাকাছি, যেখানে গেলে ও নিজেও মহিমময়ী হয়ে উঠবে।

বিকেল বেলা একটা ছোটো ব্যাগে কাঁচি, স্পঞ্জ আর ছোট্ট একটা বুরুশ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো মেবল। বিধুর হয়ে ওঠা গাঢ় সবুজ প্রান্তর আর অদূরে কারখানাগুলোর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠা শীতের ধূসর দিন। চুপি চুপি আল পেরিয়ে কারুর দিকে না তাকিয়ে শহরের ভেতর দিয়ে দ্রুত পায়ে ও এগিয়ে চললো গির্জার কবরখানার দিকে।

এখানে এলে ও চিরদিনই নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করে। যেন কেউ ওকে দেখতে পাবে না। যদিও গির্জার দেয়ালের কাছ দিয়ে যেতে থাকা যে কোনো পথচারীই অনায়াসে ওকে দেখে ফেলতে পারে. তবু একবার এই বিরাট গির্জার ছায়ায় কবরগুলোর মাঝখানে এসে দাঁড়ালে নিজেকে ওর সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। মনে হয়, গির্জার পুরু দেয়ালের আড়ালে ও যেন অন্য এক দেশে রয়েছে।

কবরের ঘাসগুলো সযত্নে ছেঁটে দিয়ে ছোটো ছোটো ফিকে গোলাপী চন্দ্রমল্লিকাগুলোকে টিনের ক্রুশটাতে সাজিয়ে দিলো মেবল। তারপর পাশের একটা কবর থেকে একটা খালি পাত্র নিয়ে, তাতে করে জল এনে, স্পঞ্জ দিয়ে সযত্নে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমাধির মর্মর পাথরগুলোকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলো।

কাজটা করে আন্তরিক তৃপ্তি পেলো মেবল, মায়ের পৃথিবীর সঙ্গে যেন এক

প্রত্যক্ষ সংযোগ অনুভব করলো ও। এক পরম সুখের সীমানায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো, এ কাজটা করে মা-র সঙ্গে ওর যেন এক অতি সূক্ষ্ম অথচ আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে। কারণ পৃথিবীতে ও যেভাবে জীবন কাটায়, মা-র কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মৃত্যুর জগৎ তার চাইতে অনেক বেশি বাস্তব।

গির্জার একেবারে কাছেই ডাক্তারের বাড়ি। সামান্য একজন চাকরিজীবী সহকারী ডাক্তার হিসেবে ফারগুসনকে গ্রামাঞ্চলে গোলামি করতে হয়। বহির্বিভাগের রোগীদের দেখার জন্যে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে কবরখানার দিকে এক ঝলক তাকাতেই আপন কাজে মগ্ন হয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখতে পেলো সে। মেয়েটি এতোই তন্ময় আর কাছে থাকা সত্ত্বেও এতো দূরের, যে ওর দিকে তাকালে মনে হয় যেন অন্য এক জগতের দিকে তাকানো হলো। চলার গতি শ্লথ করে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই ওর দিকে তাকিয়ে রইলো ফারগুসন।

ফারগুসনের দৃষ্টি অনুভব করে চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। ওদের দৃষ্টি মিলিত হলো। দুজনেই তক্ষুনি ফিরে তাকালো আবার—কি করে যেন দুজনেই অনুভব করলো, পরস্পরের কাছে ওরা ধরা পড়ে গেছে। মাথা থেকে টুপিটা তুলে, রাস্তা ধরে চলে গেলো ফারগুসন। কিন্তু সমাধি-ফলক থেকে তার দিকে দীঘল-অন্ধকার-চোখ তুলে তাকিয়ে থাকা সেই মেয়েটির মুখখানা তার মনে একটা দৃশ্যের মতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে রইলো। ওই আকুল মুখখানি যেন তাকে সম্মোহিত করে দিয়েছে। ওর চোখ দুটিতে এমন এক প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে যা ফারগুসনের সমস্ত সত্তাকে বন্দী করে ফেলেছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো উগ্র ওষুধ পান করেছে সে। এর আগে সে দুর্বলতা অনুভব করতো—মনে হতো বুঝি তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন ফের তার মধ্যে জীবন ফিরে এসেছে নিজেকে নিজের বিরক্তিকর দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্ত বলে মনে হচ্ছে তার।

দ্রুত হাতে অপেক্ষাকৃত লোকগুলোর শিশিতে সস্তা ওষুধ পুরে, যতো শীঘ্রি সম্ভব ডাক্তারখানার কাজ সেরে ফেললো ফারগুসন। তারপর চায়ের আগেই অন্য এক জায়গায় কয়েকজন রোগীকে দেখার জন্যে যথারীতি তাড়াহুড়ো করে ফের বেরিয়ে পড়লো। পারলে সর্বদাই সে পায়ে হেঁটে যাওয়া পছন্দ করে, বিশেষ করে শরীরটা যখন ঠিক সুস্থ থাকে না। এখন ফারগুসনের মনে হয়, তার মধ্যে ফের গতি ফিরে এসেছে।

বেলা পড়ে আসছিলো। ধূসর বিষণ্ণ স্যাঁতসেঁতে শীতের বিকেল। কনকনে

ঠাণ্ডায় কাজের ক্ষমতাও ভোঁতা হয়ে আসে। কিন্তু ফারগুসনের অতো চিন্তা করার বা লক্ষ্য করে দেখার কি দরকার? কালো ছাই বেছানো পথ ধরে দ্রুতপায়ে পাহাড়টার ওপরে উঠে সে মুখ ঘুরিয়ে ঘনসবুজ ক্ষেতগুলোর ওধারে তাকালো। দূরে ছোট্ট শহরটা যেন ছাইচাপা আগুনের মতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে। একটা মিনার, গির্জার চূড়া, যেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক-গাদা ঘরবাড়ি। শহরের এদিককার একেবারে শেষ প্রান্তে পারভিনদের বাড়ি, ওল্ডমেডো। ঢালু জমিতে থাকাব জন্যে বার-বাড়ি আর আস্তাবলগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো ফারগুসন। ও বাড়িতে তাকে আর বড়ো একটা যেতে হবে না। আরও একটা জায়গা গেলো। এই নোংরা অচেনা শহরে যে একটি মাত্র পরিবারের সঙ্গ তার ভালো লাগতো, তা-ও সে আজ হারাতে চলেছে। এখন বাকি রইলো শুধু কাজ আর কাজ, শুধু খনি আর লেহার বারখানার শ্রমিক-দের বাড়িতে বাড়িতে অনবরত ক্লান্তিকর যাতায়াত। এ কাজ তাকে ক্লান্ত করে তোলে অথচ এ কাজের জন্যে সে এক নিবিড় আর্তিও অনুভব করে। এ কাজের মাধ্যমে সে অমার্জিত, স্থূল, নিদারুণ আবেগ বশ মানুষগুলোর জীবনের একেবারে কাছাকাছি চলে যেতে পারে। ফারগুসনের ভাষায়, সে ওই নরকের গহ্বরগুলোকে ঘৃণা করে। অথচ বাস্তবিক পক্ষে এ কাজ তাকে উত্তেজিত করে তোলে—ওই রুক্ষ, খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর সাহচর্য তার স্নায়ুগুলোতে উদ্দীপনা জোগায়।

ওল্ডমেডোর নিচে সিক্ত-সবুজ ক্ষেতগুলোর মাঝখানে গভীর একটি বর্গাকার পুকুর। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে ইতস্তত ঘুরেফিরে ডাক্তারের ক্ষিপ্র দৃষ্টি আচমকা আবিষ্কার করলো, কালো পোশাক পরা একটি ছায়ামূর্তি গেটের দরজা পেরিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফের তাকালো ফারগুসন। মানুষটা নিশ্চয়ই মেবল পারভিন। আচমকা ফারগুসনের মনটা প্রাণময় আর একাগ্র হয়ে উঠলো।

মেয়েটা পুকুরে নামছে কেন? রাস্তা ছেড়ে একখানা চড়াইতে চড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ফারগুসন। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় সে শুধু একটা ছায়া-মূর্তিই দেখতে পেলো। আলোতে কম যে নিজেকে একজন অলোকদ্রষ্টা বলে মনে হচ্ছিলো তার—মনে হচ্ছিলো সাধারণ দৃষ্টিতে নয়, সে যেন মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটিকে। ফারগুসনের মনে হলো, একটু অন্য দিকে চোখ ফেরালেই এই বিশ্রী গাঢ় অন্ধকারে মেবলকে সে হারিয়ে ফেলবে।

একমনে মেয়েটির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো ফারগুসন। স্বেচ্ছায় নয়,

যেন একটা আরোপিত শক্তি মেয়েটিকে মাঠ পেরিয়ে সোজা পুকুরের দিকে নিয়ে চলেছে। পুকুরের ধারে গিয়ে এক মুহূর্ত একটু দাঁড়ালো ও, একটি বারও মাথা তুলে তাকালো না। তারপর আস্তে আস্তে জলে গিয়ে নামলো।

ফারগুসন নিস্পন্দ হয়ে দেখলো, ছোটখাটো ছায়ামূর্তিটা স্বেচ্ছায় একটু একটু করে পুকুরটার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে—স্থির জল ওর বুক অব্দি উঠে এসেছে, তবু ও ক্রমশ এগিয়ে চলেছে আরও গভীরতার দিকে। তারপর বিকেলের মরা আলোয় ফারগুসন ওকে আর দেখতে পেলো না।

'দেখেছো কাণ্ড।' অবাক-বিস্ময়ে সে বলে উঠলো, 'এ কি বিশ্বাস করা যায়?'

দ্রুত পায়ে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাঠ পেরিয়ে, দু হাতে ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে পুকুরের দিকে ছুটতে লাগলো ফারগুসন। কয়েক মিনিট বাদেই হাঁপাতে হাঁপাতে পুকুরের ধারে গিয়ে পৌঁছলো সে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। তার দু চোখের দৃষ্টি যেন পুকুরের মরা জলের গভীরে ঢুকে মেবলের খোঁজ করতে লাগলো। হ্যাঁ, জলের ঠিক তলায় ওইটেই বোধহয় মেবলের কালো পোশাকের অন্ধকার ছায়া।

সাহস করে আস্তে আস্তে ফারগুসন পুকুরে গিয়ে নামলো। তলার গভীর নরম কাদায় তার পা বসে গেলো, মৃত্যু-তুহিন জল জড়িয়ে ধরলো তার পা-দুটোকে। এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে জলে মিশে থাকা পচা কাদার দুর্গন্ধ অনুভব করছিলো সে, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছিলো তার। তবু না পেছিয়ে, সে সবে নজর না দিয়ে, আরও গভীর জলে নামতে লাগলো সে ঠাণ্ডা জল তার উরু, কোমর ছাপিয়ে পেট অব্দি উঠে এলো। শরীরের নিম্নাংশ ওই জঘন্য নোংরা জলে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। তলার কাদা এতো নরম আর পেছল যে ফারগুসনের ভয় হচ্ছিলো হয়তো সে মুখ থুবড়ে তলিয়ে যাবে। সাঁতার সে জানে না, তাই তার আরও ভয়।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে জলের নিচে হাতড়ে হাতড়ে মেবলের খোঁজ করার চেষ্টা করলো ফারগুসন। মৃত্যুর মতো হিম জল তার বুকের কাছে দুলে উঠলো। ফের একটু গভীরের দিকে নেমে গেলো সে, জলের চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো আবার। তারপরেই মেবলের পোশাকটা তার হাতে ঠেকলো, কিন্তু আঙুলের নাগাল এড়িয়ে গেলো পোশাকটা।

ফারগুসন মরিয়া হয়ে মেবলের পোশাকটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতেই ভারসাম্য হারিয়ে সেই বীভৎস দুর্গন্ধময় জলের নিচে তলিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত উন্মাদের মতো লড়াই চালিয়ে অবশেষে যেন অনন্তকাল পরে আবার সে

পায়ের নিচে মাটি পেয়ে উঠে দাঁড়ালো—হাঁপাতে হাঁপাতে তাকিয়ে দেখলো চারদিকে। তারপর জলের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, মেবল তার কাছেই ভেসে উঠেছে। ওর পোশাকটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ওকে নিজের কাছে টেনে আনলো সে। তারপর ফের ডাঙায় গিয়ে ওঠার জন্যে পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

সাবধানে আস্তে আস্তে পুকুর থেকে উঠতে লাগলো ফারগুসন। জল এখন তার পা অব্দি মাত্র। পুকুরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এখন তার মনভরা স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতা। কোনো রকমে টলতে টলতে ভেজা কাদার ভয়াবহতা থেকে মেবলকে তুলে, ওকে পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো সে।

মেবল তখন সম্পূর্ণ অচেতন। ওর মুখ দিয়ে জল বের করে, জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলো ফারগুসন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেই বুঝতে পারলো, ফের স্বাভাবিক ভাবে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে শুরু করেছে। আর সামান্য কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করার পর সে অনুভব করলো, মেবলের শরীরে প্রাণ ফিরে আসছে। নিজের হাতে মেবলের শরীরের উত্তাপ অনুভব করলো সে। ওর মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে, শরীরটা নিজের ওভারকোটে জড়িয়ে, চারদিকের আবছা ধূসর পৃথিবীটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলো ফারগুসন। তারপর ওকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চললো মাঠের ভেতর দিয়ে।

পথ যেন ফুরোতেই চায় না। বোঝাটা এতো ভারি যে ফারগুসনের মনে হচ্ছিলো, সে কোনোদিনই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু শেষ অব্দি সে আস্তাবলগুলোর উঠোনে গিয়ে পৌঁছলো, তারপর বাড়ির উঠোনে। দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো সে এবং রান্নাঘরে চুল্লির কাছে বেছানো কম্বলে মেবলকে শুইয়ে, ওর নাম ধরে ডাকলো। বাড়িতে কেউ নেই। অথচ চুল্লিতে আগুন জ্বলছে।

শুশ্রূষা করার জন্যে ফের মেবলের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলো ফারগুসন। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত ভাবেই বইছে। চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা, যেন জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কি যেন নেই। আসলে নিজের চেতনা ও ফিরে পেয়েছে, কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ও এখনও অচেতন।

এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে বিছানা থেকে কয়েকটা কম্বল নিয়ে এলো ফারগুসন। গরম করার জন্যে কম্বলগুলোকে সে আগুনের কাছে রেখে দিলো। তারপর মেবলের ভিজে-কাদার-গন্ধে ভরা পোশাক-আশাক ছাড়িয়ে, তোয়ালে দিয়ে ওকে মুছিয়ে, ওর নগ্ন শরীরটা কম্বলে জড়িয়ে রাখলো। এবারে একটু মদ

খুঁজে পাবার জন্যে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। সামান্য একটু হুইস্কি ছিলো। নিজে এক চুমুক খেয়ে, খানিকটা সে মেবলের মুখে ঢেলে দিলো।

ফলটা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেলো। পূর্ণ দৃষ্টিতে ফারগুসনের মুখের দিকে তাকালো মেবল—যেন বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ও ফারগুসনকে দেখছিলো, কিন্তু এই সবেমাত্র ও ফারগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে।

'ডাক্তার ফারগুসন?'

'কি?'

ওপরে গিয়ে কিছু শুকনো পোশাক-আশাক খুঁজে নেবার ইচ্ছায় ফারগুসন তখন নিজের কোটটা খুলে ফেলছিলো। কাদাজলের দুর্গন্ধ সে আর সহ্য করতে পা ছিলো না। তাছাড়া নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সে শঙ্কিত।

'আমি কি করেছিলাম?' মেবল জিজ্ঞেস করলো।

'পুকুরে গিয়ে নেমেছিলে' জবাব দিলো ফারগুসন। অসুস্থ মানুষের মতো সে তখন কাঁপতে শুরু করেছে। মেবলের কথায় কান দেবার মতো অবস্থাও তার নেই। মেবল তখনও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ফারগুসনের মনে হলো, তার সমস্ত চেতনা যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। অসহায়ের মতো সে ও তাকিয়ে রইলো মেবলের দিকে। ক্রমশ তার কাঁপুনিটা একটু শান্ত হয়ে এলে, ফের জীবন ফিরে এলো তার শরীরে।

'আমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো?' ফারগুসনের দিকে তেমনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্ন করলো মেবল।

'হয়তো মুহূর্তের জন্যে হয়েছিলো,' জবাব দিলো ফারগুসন। নিজেকে দিব্যি ধীর-স্থির-শান্ত বলে মনে হচ্ছিলো তার। কারণ সেই বিরক্তিকর পরিশ্রমের গ্লানি কেটে গিয়ে তার দেহে আবার শক্তি ফিরে এসেছে।

'এখনও কি খারাপই আছে?'

'আছে কি?' ফারগুসন একটু ভেবে বললো,'নাঃ, দেখে তো তা মনে হচ্ছে না!' মুখটা এক পাশ ঘুরিয়ে নিলো সে। কারণ এখন তার ভয় করছিলো, কেমন যেন হতবিহ্বল বলে মনে হচ্ছিলো নিজেকে—কারণ আবছা আবছা তার মনে হচ্ছিলো, এ ব্যাপারে মেবলের শক্তি তার চাইতে বেশি। ও দিকে মেবল সম্পূর্ণ সময়টা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে অপলক চোখে। 'পরার মতো কিছু শুকনো পোশাক-আশাক কোথায় পাবো, বলতে পারো?' মেবলকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'তুমি কি আমার জন্যেই জলে ঝাঁপ দিয়েছিলে নাকি?' প্রশ্ন করলো মেবল।'

'না, হেঁটে হেঁটেই জলে গিয়ে নেমেছিলাম।' ফারগুসন বললো, 'তবে একবার ডুবেও গিয়েছিলাম।'

এক মুহূর্ত দুজনেই নিশ্চুপ। ফারগুসন খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। শুকনো পোশাক পরার জন্যে ওপরে যেতে তার ভীষণ ইচ্ছে। অথচ তার মনে আর একটা ইচ্ছেও রয়েছে। মেবল যেন ধরে রেখেছে তাকে। মেবলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছেশক্তি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, যেন ত্যাগ করেছে তাকে। অথচ নিজের ভেতরে উত্তাপ অনুভব করছে ফারগুসন। পোশাক-আশাক গায়ে লেপটে থাকা সত্ত্বেও এখন সে আর একটুও কাঁপছে না।

'কেন তুমি ও কাজ করলে?' মেবল শুধালো।

'কারণ আমি তোমাকে অমন একটা বোকার মতো কাজ করতে দিতে চাইনি।'

'বোকামো নয়,' সোফার একটা ছোট্ট গদি মাথায় দিয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ফারগুসনের দিকে তেমনি ভাবে তাকিয়ে মেবল বললো, 'আমি ঠিক কাজটাই করতে গিয়েছিলাম। সেটা আমি তখন ভালোভাবেই বুঝে পেরেছি।'

'আমি ভিজে পোশাকগুলো পালটে আসি,' ফারগুসন বললো। কিন্তু মেবল নিজে না পাঠালে ওর উপস্থিতি থেকে সরে যাবার ক্ষমতা ফারগুসনের নেই। যেন মেবলের হাতের মুঠোয় তার প্রাণটা রয়েছে, কিছুতেই সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারছে না। কিংবা সে নিজেও হয়তো তা চায় না।

আচমকা উঠে বসলো মেবল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ও নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচকিতা হয়ে উঠলো। শরীরে জড়ানো কম্বলগুলোকে অনুভব করলো ও, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও ওর চেনা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ও বুঝি উন্মাদ হতে চলেছে। ফারগুসন ভয়ে নিস্পন্দ। যেন কি খোঁজার জন্যে বিস্ফারিত চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলো মেবল। এবং তারপরেই দেখলো, ওর পোশাকগুলো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

'আমার পোশাক কে ছাড়িয়েছে?' অনিবার্য পূর্ণদৃষ্টি ফারগুসনের মুখের ওপর মেলে রেখে প্রশ্ন করলো মেবল।

'আমি, তোমাকে সুস্থ করে তুলতে।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফারগুসনের দিকে তাকিয়ে রইলো মেবল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

ফারগুসন শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তার মনটাও যেন

গলে যাচ্ছিলো তখন।

হাঁটুতে ভর রেখে একটু এগিয়ে গিয়ে মেবল দু হাতে ফারগুসনের পা দুটোকে জড়িয়ে ধরলো, ফারগুসনের হাঁটু আর উরুতে সজোরে চেপে ধরলো নিজের বুক দুটিকে, এক আশ্চর্য অস্থির নিশ্চয়তা নিয়ে তাকে আকর্ষণ করতে লাগলো নিজের মুখের দিকে, গলার দিকে। প্রথম পাওয়ার জয়োচ্ছাসে ঝলমলে দুটি রূপান্তরিত করুণ চোখ তুলে ফারগুসনের দিকে তাকালো ও।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো,' মেবলের অস্ফুট কণ্ঠে এক আশ্চর্য আবেগ, আকুলতা আর আত্মপ্রত্যয়ের স্বর। 'তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসো, আমি জানি।'

আবেগে আকুল হয়ে ভিজে পোশাকের ওপর দিয়ে ফারগুসনের হাঁটুতে, পায়ে নির্বিচারে চুমু খেতে থাকে ও—যেন আর কোনো দিকেই ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ফারগুসন চোখ নামিয়ে মেবলের এলোমেলো ভিজে চুল আর অবারিত, নগ্ন কাঁধ দুটির দিকে তাকায়। মুগ্ধ, বিহ্বল আর শংকিত হয়ে ওঠে সে। মেবলকে ভালোবাসার কথা সে কোনোদিনও ভাবেনি, ভালোবাসতে চায়ওনি। মেবলকে যখন সে উদ্ধার করে এনেছে, সুস্থ করে তুলেছে তখন সে ছিল ডাক্তার আর মেবল ছিলো একটি অসুস্থ নারী। মেবল সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিগত চিন্তা তার মনে কখনই ছিলো না। না, এই ব্যক্তিগত বিষয়ের সূত্রপাতটা তার কাছে ভীষণ অপ্রীতিকর, এটা তার পেশাদারী মর্যাদার পরিপন্থী। এভাবে তার পায়ে মেবলের জড়িয়ে থাকাটা একেবারে জঘন্য ব্যাপার। ভীষণ বিশ্রী। ফারগুসনের সমস্ত সত্তা প্রচণ্ড ভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু—তবু এ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার ক্ষমতা তার নেই।

ফের ফারগুসনের দিকে তাকালো মেবল। ওর দু চোখে দুরন্ত প্রেমের সেই নিবিড় আকুলতা, বিজয় উচ্ছ্বাসের সেই ভয়াবহ অলৌকিক দীপ্তি। ওর মুখ থেকে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়া কোমল অনুরাগের কাছে ফারগুসন নিতান্তই অসহায়। অথচ কোনোদিনই সে ওকে ভালোবাসতে চায়নি — কোনোদিনও না। তার প্রচণ্ড জেদ কিছুতেই ওকে পথ ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো,' অস্ফুটে, গভীর আর আবেগ ভরা আশ্বাসে মেবল আবার বলে, 'তুমি আমায় ভালোবাসো।'

মেবলের হাত দুটো ফারগুসনকে আকর্ষণ করে, নিজের কাছে টেনে নামাতে চায়। ফারগুসন ভয় পায়, এমন কি একটু আতংকিতও হয়ে ওঠে। কারণ

সত্যিই মেবলকে ভালোবাসায় কোনো উদ্দেশ্যই তার ছিল না। অথচ মেবলের হাত তাকে নিজের দিকে টানছে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে দ্রুত একটা হাত বাড়িয়ে মেবলের নগ্ন কাঁধটা আঁকড়ে ধরে ফারগুসন। যে হাতখানা মেবলের নরম কাঁধটাকে চেপে ধরে, একটা আগুনের শিখা যেন সেই হাতখানাকে পুড়িয়ে দেয়। মেবলকে ভালোবাসার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিলো না—তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি তার আত্মসমর্পণের বিরোধী। ব্যাপারটা একেবারে ভয়ংকর। অথচ কি অপরূপ ওর কাঁধের সেই স্পর্শ, কি সুন্দর ওর মধুর মুখের দীপ্তি! মেয়েটা কি পাগল? ওর কাছে আত্মসমর্পণ করাটা ফারগুসনের কাছে ভয়াবহ। তবু তার মনে একটা ব্যথাও যেন জেগে থাকে।

মেবলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েছিলো ফারগুসন। কিন্তু তার হাতটা তখনও মেবলের কাঁধে স্থির। আচমকা ভীষণ নিস্পন্দ হয়ে গেছে মেবল। চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকালো ফারগুসন। দ্বিধায় আতংকে মেবলের চোখদুটি এখন বিস্ফারিত। ওর মুখ থেকে আলো মুছে যাচ্ছে, ফিরে আসছে ধূসরতার এক নিদারুণ ছায়া। ওর দুচোখ ভরা প্রশ্নের ছোঁয়া আর সেই প্রশ্নের পেছনে মরণ চাহনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না ফারগুসন।

মনে মনে গুমরে উঠে হাল ছেড়ে দেয় ফারগুসন, নিজের হৃদয়কে মেবলের দিকে এগিয়ে দেয় সে। আচমকা তার মুখে এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। আর তার মুখের দিকে একটানা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকা মেবলের চোখদুটি জলে ভরে ওঠে একটু একটু করে। ফারগুসন লক্ষ্য করে, একটা শান্ত ঝর্ণার মতো ওর চোখদুটো রহস্যময় জলে ভরে উঠেছে। নিজের বুকের ভেতরে তার হৃদয়টা যেন জলে যায়, গলে যায়।

মেবলের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না ফারগুসন। হাঁটু মুড়ে বসে মেবলের মুখখানা সে দু হাতে নিজের গলার কাছে চেপে ধরে। একেবারে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে থাকে মেবল। ফারগুসনের মনে হয়েছিলো, তার হৃদয়টা বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তার বুকের গভীরে সেই হৃদয়টাই যেন কি এক নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে থাকে। ফারগুসন অনুভব করে, মেবলের চোখের জলের উষ্ণ ধারা আস্তে আস্তে তার গলাটা ভিজিয়ে তুলছে। কিন্তু তবু সে নড়তে পারে না—পুরুষ-জীবনের এক শাশ্বত মুহূর্তে অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে থাকে সে। মেবলের মুখখানা নিজের একেবারে কাছাকাছি চেপে ধরাটা তার কাছে নিতান্ত জরুরী হয়ে ওঠে। মেবলকে সে আর কোনোদিনও ছেড়ে দিতে পারবে না। কোনোদিনও তার বাহুর

ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দিতে পারবে না ওর মুখখানিকে। বুকের মধ্যে এই যন্ত্রণা নিয়েই সে চিরদিন বেঁচে থাকতে চায়, এ যন্ত্রণা তার কাছে জীবনও বটে।

নিজের অজান্তেই মেবলের ভিজে, নরম, বাদামি চুলগুলোর দিকে তাকালো ফারগুসন এবং একেবারে অতর্কিতেই সেই বদ্ধ নোংরা জলের দুর্গন্ধ অনুভব করলো আবার। সেই মুহূর্তে মেবলও আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ফারগুসনের দিকে তাকালো। ওর চোখ দুটো অতলান্ত আর আন্তরিক। ওই চোখদুটোকে ভয় পায় ফারগুসন -- ওর চোখের সেই ভয়ংকর অতলান্ত দৃষ্টি সে দেখতে চায় না। তাই কি করছে তা না জেনেই ওকে চুমু দিতে শুরু করলো সে।

মেবল যখন ফের তার দিকে মুখ ফেরালো, তখন মেবলের মুখে একটা অস্পষ্ট কোমল আভা জেগে উঠতে শুরু করেছে। ওর দু চোখে আনন্দের সেই সর্বনেশে দীপ্তি, যাকে ফারগুসন সত্যিই ভয় পায়। অথচ এখন মেবলের চোখে সেই দীপ্তিটুকুই দেখতে চায় সে, কারণ ওর চোখে সংশয়ের দৃষ্টি তার কাছে আরও বেশি ভয়াবহ।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?' খানিকটা দ্বিধাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলো মেবল।

'হ্যাঁ,' অনেক কষ্টে জবাব দিলো ফারগুসন। কথাটা মিথ্যে বলে কষ্ট নয়। কষ্ট হবার কারণ, কথাটা সবেমাত্র সত্যি হয়ে উঠেছে। ফারগুসনের সদ্য-বিদীর্ণ হৃদয় থেকে যেন ফের ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে এলো কথাটা। কথাটা সত্যি হয়ে উঠুক, তা সে এখনও চায় না।

মুখ তুলে ফারগুসনের দিকে তাকালো মেবল, ফারগুসন নিচু হয়ে শান্ত ভঙ্গিমায় চুমু দিলো ওর ঠোঁটে—একটি চুমু, যেন শাশ্বত অঙ্গীকার। চুমু খাবার সময় বুকের মধ্যে ফের সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করলো ফারগুসন। মেবলকে সে কোনোদিনও ভালোবাসতে চায়নি। কিন্তু এখন সে সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। ব্যবধান পেরিয়ে মেবলের কাছে চলে এসেছে সে—পেছনে যা কিছু ফেলে এসেছে, তা সবই এখন শীর্ণ সঙ্কুচিত আর অর্থহীন।

চুমু দেবার পরে মেবলের চোখদুটি আবার আস্তে আস্তে জলে ভরে উঠলো। কোলের ওপরে হাত দুটো জড়ো করে, মুখখানা এক ধারে নুইয়ে, ফারগুসনের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে, স্থাণু হয়ে বসে রইলো ও। আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ওর দুচোখের জল। দুজনেই সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। ফারগুসনও চুল্লির কাছে বেছানো কম্বলে বসে রইলো নিস্পন্দ হয়ে। বুকের ভেতর-

তার যন্ত্রণাটা যেন শেষ করে ফেলছিলো তাকে। সে কি মেবলকে ভালো-বাসবে? তাহলে এরই নাম প্রেম! তাহলে এভাবেই তার ভেতরটা সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে? আর সে কি না একজন ডাক্তার! সবাই জানলে কি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই না করবে।—সবাই হয়তো কথাটা জানবে, এটা চিন্তা করাই তার কাছে এক নিদারুণ যন্ত্রণা।

দুশ্চিন্তার এই অদ্ভুত নগ্ন যন্ত্রণার মধ্যে ফের মেবলের দিকে তাকালো ফারগুসন। মেবল তখনও বসেছিলো আনমনা হয়ে। ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখে ফারগুসনের বুকের ভেতরটা তেতে আগুন হয়ে উঠলো। এই প্রথম সে লক্ষ্য করলো মেবলের একটা কাঁধ সম্পূর্ণ খোলা, একটি বাহু অনাবৃত। ওর ছোট্ট একটি স্তনও দেখতে পেলো সে—তবে অস্পষ্টভাবে, কারণ ঘরের ভেতরটা এতোক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

'তুমি কাঁদছো কেন?' অন্য এক স্বরে জিজ্ঞেস করলো ফারগুসন।

চোখ তুলে ফারগুসনের দিকে তাকালো মেবল এবং চোখের জল ছাপিয়ে নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ এই প্রথম ওর দুচোখে লজ্জার ম্লান দৃষ্টি বয়ে আনলো।

'ঠিক কাঁদছি না,' যেন ভয়ে ভয়ে ফারগুসনের দিকে তাকালো ও।

হাত বাড়িয়ে আলতো মুঠিতে ফারগুসন ওর নগ্ন বাহুখানা চেপে ধরলো।

'আমি তোমাকে ভালবাসি! ভালোবাসি তোমাকে!' কোমল, মৃদু কেঁপে কেঁপে ওঠা কণ্ঠস্বর ফারগুসনের। এ কণ্ঠস্বর তার নিজের কণ্ঠস্বরের মতো নয়।

কুঁকড়ে উঠে মাথা নিচু করলো মেবল। নিজের বাহুতে ফারগুসনের হাতের চাপ ওকে বিব্রত করে তুলছিলো। চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকালো ও।

'আমি যাই, তোমার জন্যে কিছু শুকনো পোশাক-আশাক নিয়ে আসিগে।'

'কেন? আমি তো ভালোই আছি।'

'না, আমি যেতে চাই। আমি চাই, তুমি পোশাক পালটাবে।'

ওর হাতখানা ছেড়ে দিলো ফারগুসন। তার দিকে যেন খানিকটা শংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কম্বল দিয়ে নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে নিলো মেবল। অথচ উঠলো না।

'আমাকে চুমু দাও,' মেবলের গলায় আন্তরিকতার স্বর।

ওকে চুমু দিলো ফারগুসন—কিন্তু সংক্ষেপে, খানিকটা রাগে রাগে।

এক মুহূর্ত পরে কম্বল সামলাতে সামলাতে বিচলিত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো মেবল। ফারগুসন লক্ষ্য করলো, কম্বলের আবরণে নিজেকে জড়িয়ে রেখে হাঁটার

চেষ্টা করতে গিয়ে মেবল বিব্রত হয়ে উঠেছে। মেবলও জানে, মানুষটা নির্মমভাবে লক্ষ্য করছে ওকে। পেছন দিকে কম্বল লুটিয়ে মেবল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ফারগুসন এক ঝলকের জন্যে মেবলের পায়ের পাতা আর শুভ্র একখানা পা দেখতে পেলো। ওকে কম্বলে জড়িয়ে বাধার সময় কেমন লেগেছিলো, তা মনে করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু তারপর আর মনে করতে ইচ্ছে হলো না, কারণ তখন মেবলের কোনো মূল্যই ছিলো না তার কাছে। ও যখন তার কাছে কিছুই ছিল না তখন ওকে সেই অবস্থায় মনে পড়ার কথায় ফারগুসনের প্রকৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

অন্ধকার বাড়িটার ভেতর থেকে কিসের যেন আছড়ে পড়ার চাপা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো ফারগুসন। তারপরেই মেবলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে —'এই যে পোশাক।' সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওপর থেকে মেবলের ছুঁড়ে দেওয়া পোশাকগুলো তুলে নিলো সে। তারপর গা মুছে সেগুলো পরে নেবার জন্যে ফিরে এলো আগুনের কাছে। পোশাক বদলে ফেলার পর নিজের চেহারা দেখে নিজেই হেসে ফেললো ফারগুসন।

আগুনটা মরে আসছিলো, তাই ফারগুসন চুল্লিতে কিছু কয়লা ছড়িয়ে দিলো। হলি গাছগুলোর ওধারে একটা রাস্তার-আলো থেকে ছড়িয়ে পড়া সামান্য অস্পষ্ট আভাটুকু ছাড়া বাড়িটা এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। তাপচুল্লির তাক থেকে একটা দেশলাই খুঁজে নিয়ে ফারগুসন গ্যাসের আলোটাও জেলে দিলো। তারপর নিজের পোশাকের পকেটগুলো খালি করে, সমস্ত ভিজে জিনিসগুলো ছুঁড়ে দিলো বাসন ধোয়ার জায়গায়। এবারে মেবলের ভিজে পোশাকগুলোও গুছিয়ে নিয়ে বাসন মাজার টেবিলে সযত্নে সেগুলোকে রেখে এলো সে।

দেয়াল-ঘড়িতে ছটা বাজলো। ফারগুসনের নিজের ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এবারে তার ডাক্তারখানায় যাওয়া উচিত। সে অপেক্ষা করে রইলো, তবু মেবল নিচে নেমে এলো না। তাই ফারগুসন সিঁড়ির নিচে গিয়ে ওকে ডেকে বললো, 'এবারে আমাকে যেতে হবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর নেমে আসার শব্দ শুনতে পেলো ফারগুসন। ওর পরনে কালো ভয়েলের সেরা পোশাকটা, মাথার চুল সুন্দর পরিপাটি—তবে ভেজা। ফারগুসনের দিকে তাকিয়ে মেবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসলো, 'এ পোশাকে তোমাকে দেখতে ভালো লাগছে না।'

'একটা দর্শনীয় জিনিসের মতো লাগছে নাকি?'

ওরা দুজনেই লজ্জা পাচ্ছিলো দুজনকে।

'আমি তোমাকে একটু চা বানিয়ে দিই', মেবল বললো।

'না, আমাকে এখুনি যেতে হবে।'

'যেতেই হবে!' সংশয়ে ভরা বিধুর হয়ে ওঠা সেই আয়ত চোখে ফের ফারগুসনের দিকে তাকালো মেবল। হৃদয়ের সেই যন্ত্রণাবোধ থেকে ফারগুসনও ফের বুঝতে পারলো, ওকে কি ভালোই না সে বেসেছে। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে পরম যত্নে প্রাণের সবটুকু আবেগ আর বেদনা দিয়ে ওকে চুমু দিলো সে।

'আমার চুলে কি বিশ্রী গন্ধ,' মেবল অস্থির হয়ে উঠে অস্ফুটে বললো, 'আমি একটা বিশ্রী, ভীষণ বিশ্রী!' বুক-ভাঙা কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে ও, 'তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারো না! আমি একটা জঘন্য!'

'বোকামো করে না লক্ষ্মীটি!' দু হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে দিতে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ফারগুসন। 'আমি তোমাকে চাই, তোমাকে বিয়ে করতে চাই। শীগগিরি আমরা বিয়ে করবো, শীগগিরি—যদি পারি তো কালকেই।'

তবু মেবল শুধু আকুল হয়ে ফোঁপাতে থাকে, 'নিজেকে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ বিশ্রী লাগছে! মনে হচ্ছে, তোমার কাছে আমি একেবারে কদর্য!'

'না গো, না। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে…' অন্ধের মতো শুধু এটুকুই জবাব দেয় ফারগুসন। তার ভয়ংকর কণ্ঠস্বরে আতংকিত হয়ে ওঠে মেবল। ফারগুসন হয়তো ওকে না-ও চাইতে পারে ভেবে ও যতোটা ভয় পেয়েছিলো, এ আতংক যেন তার চাইতেও বেশি।

* The Horse Dealer's Daughter.

বেশ কয়েক বছর দেখা সাক্ষাৎ না হবার পরে ভেনিসে লুই কোলমেনারেসের সঙ্গে আমার দেখা হলো। উনি একজন নির্বাসিত মেক্সিকান—একদা যা বিশাল ঐশ্বর্য ছিলো এখন তারই স্বল্প অবশিষ্টাংশ দিয়ে উনি জীবন চালান এবং একজন চিত্রকর হিসেবে কোনোক্রমে নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের বাকি অভাবগুলো পূরণ করেন। কিন্তু শিল্পকলা ওঁর কাছে ছিলো শুধুমাত্র অস্থিরতা দূর করার অবলম্বন। দিশেহারা আত্মার মতো উনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান—বেশির ভাগ সময়েই পারী অথবা ইতালিতে, যেখানে সস্তায় জীবন কাটানো যায়। লুই কোলমেনারেসের চেহারা খানিকটা বেঁটেখাটো, মোটাসোটা। গায়ের রং ফ্যাকাশে। কালো চোখ দুটো সর্বদাই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। মনটাও তেমনি, চিরদিনই সব কিছু এড়িয়ে চলার স্বভাব।

'ভেনিসে এখন কে আছে, জানেন ?' উনি আমাকে বললেন, 'কুয়েন্তা ! ওতেল রোমানোতে রয়েছে। গতমাসে আমি তাকে লিডোতে স্নান করতে দেখেছি।'

ওঁর এই শেষ কথাটাতে গোটা পৃথিবীর বিষণ্ণ বিদ্রূপ ঝরে পড়ে।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বুল-ফাইটার কুয়েন্তা ?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ। আপনি জানেন না, সে অবসর নিয়েছে ? মনে পড়ছে ? এক অ্যামেরিকান মহিলা ওর জন্যে প্রচুর টাকাকড়ি রেখে গেছে। আপনি কোনোদিনও ওকে দেখেছেন ?'

'একবার,' আমি জবাব দিলাম।

'সেটা কি বিপ্লবের আগে ? আপনার কি মনে আছে, কুয়েন্তা অবসর নিয়ে মাদেরোর* এক সেনাপতির কাছ থেকে চিহুয়াহুয়ায়** খুব সস্তা দরে একটা জমিদারি কিনে নিয়েছিলো ? আমি অবিশ্যি সেদিনে ইউরোপে চলে এসেছি।'

* ফ্রান্সিসকো ইনদালেসিও মাদেরো (১৮৭৩-১৯১৩)—মেক্সিকান কূটনীতিজ্ঞ, গণতন্ত্র এবং সমাজ সংস্কারের প্রবক্তা। দিয়াজের (১৯১০-১১) বিরুদ্ধে সফল বিপ্লবের নায়ক। প্রেসিডেন্ট হিসেবে (১৯১১-১৩) উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হবার পরে এক বিদ্রোহের পরিণামে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

** চিহুয়াহুয়া—উত্তর মেক্সিকোর শহর, চিহুয়াহুয়া রাজ্যের রাজধানী।

'এখন সে দেখতে কেমন হয়েছে ?'

'প্রচণ্ড মোটা, সমুদ্রের একটা ছোটোখাটো গোলাকার হলদে তিমির মতো। আপনি ওকে কখনও দেখেছেন ? জানেনই তো, লোকটা চিরদিনই খানিকটা বেঁটেখাটো, একটু মোটাসোটা। আমার ধারণা, ওর মা ছিলেন একজন মিক্সটেক-ইণ্ডিয়ান রমণী। আপনার সঙ্গে কি কখনও কুয়েস্তার পরিচয় হয়েছিলো ?'

'না। আপনি ওকে চিনতেন ?'

'হ্যাঁ। অতীতে আমি যখন বড়লোক ছিলাম, যখন ভাবতাম চিরদিন বড়োলোকই থাকবো—তখন ওর সঙ্গে আমার আলাপ ছিলো।'

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমার ভয় হলো, উনি হয়তো একেবারেই মুখ বন্ধ করে দিলেন। এমনিতেই উনি যতো কথাবার্তা বললেন, তা ওঁর পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেলো, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে যার খ্যাতি একদিন সমস্ত স্পেন এবং ল্যাটিন অ্যামেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেই কুয়েস্তাকে দেখে ওঁর মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ওঁর ভেতরটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং নিজেকে উনি ঠিক সামলে রাখতে পারছেন না।

'কিন্তু লোকটা তো আগ্রহ জাগিয়ে তুলবার মতো মানুষ ছিলো না, তাই নয় কি ?' আমি বললাম, 'সে ছিলো নেহাতই একটা বুল-ফাইটার .. একটা জানোয়ার, তাই না ?'

নিজের বিষণ্ণতার ভেতর দিয়ে কোলমেনারেস আমার দিকে তাকালেন। উনি কথা বলতে চাইছিলেন না। তবু কথা ওঁকে বলতেই হলো।

'লোকটা জানোয়ার ছিলো সত্যি' উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে নিলেন, 'কিন্তু নেহাতই একটা জানোয়ার না। ওর চরম দক্ষতার দিনগুলোতে আপনি ওকে দেখেছেন কি ? কোথায় দেখেছেন ? স্পেনে ওকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি, সেখানে ও বড্ডো দাম্ভিক ছিলো। কিন্তু মেক্সিকোতে ও ভীষণ ভালো খেলছে। ওকে আপনি ষাঁড়ের সঙ্গে আর মৃত্যুর সঙ্গে খেলতে দেখেছেন ? চমৎকার খেলতো ও। ওকে দেখতে কেমন ছিলো, আপনার মনে আছে ?'

'খুব একটা ভালো করে মনে নেই।'

'বেঁটে, চওড়া শরীর, খানিকটা মোটাসোটা, একটু হলদেটে গায়ের রং আর চাপা নাক। কিন্তু চোখদুটো চমৎকার—একটু ছোটোছোটো আর হলদে। যখন আপনার দিকে তাকাবে আপনার মনে হবে, আপনার ভেতরটা যেন গলে যাচ্ছে—এমন অদ্ভুত আর হিমেল তার দৃষ্টি। অনুভূতিটা ঠিক কেমন, জানেন ? ও আপনার সেই শেষ ছোট্ট জায়গাটার ভেতরে দৃষ্টি হানবে, যেখানে আপনি

আপনার সাহস আর শৌর্যকে রেখে দিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন? ফলে আপনার মনে হবে, আপনি গলে যাচ্ছেন। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন তো?'

'হয়তো মোটামুটি পেয়েছি।'

কোলমেনারেসের কালো চোখদুটো আমার মুখের দিকে স্থির, বিস্ফারিত আর দীপ্তিময় হয়ে রয়েছে। কিন্তু উনি আদপেই আমাকে দেখছেন না, দেখছেন অতীতকে। তবু এক আশ্চর্য শক্তি ওঁর মুখ থেকে ছুটে বেরুচ্ছে। আবেগ ·· বিপরীত আবেগ দিয়ে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই ওঁকে বুঝে নেওয়া যায়।

'ষাঁড়-লড়াইয়ের অঙ্গনে কুয়েস্তা ছিলো দুর্দান্ত। ষাঁড়টা যখন তাকে আক্রমণ করার জন্যে ছুটে আসতো, তখন সে ষাঁড়টার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতো—এমন ভাব করতো যেন মোজাটাকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে সামান্য একটু সরে দাঁড়াতো আর ষাঁড়টা সবেগে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতো, তাকে ছুঁতে পারতো না। এবারে মৃদু হেসে সে পায়ে পায়ে অনুসরণ করতো ষাঁড়টাকে। মানুষটা যে কয়েক শো বার মরেনি, সেটাই আশ্চর্য। অথচ আজ আমি তাকে একটা মোটাসোটা ছোট্ট তিমির মতো লিডোতে স্নান করতে দেখেছি। এ একেবারে অস্বাভাবিক! কিন্তু তার চোখদুটো আমি দেখিনি···'

কোলমেনারেসের মোটাসোটা, পাংশুল, পরিষ্কার করে গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ এক আশ্চর্য বিমূর্ত আবেগের ছবি। হয়তো ষাঁড়-লড়িয়েটি প্রাচীন ও নতুন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মতো তার ওপরেও সম্মোহন-জাল ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

'তার মতো চোখ আমি কোনোদিনও কোথাও দেখিনি, এটাই আশ্চর্য। আপনাকে আমি বলিনি যে তার চোখদুটো ছিলো হলদে, আদপেই মানুষের চোখের মতো নয়? তার চোখ আপনার দিকে তাকাবে না। আপনার মনে হবে না, তারা কোনোদিনও কারুর দিকে তাকিয়েছে। সে শুধু আপনার শরীরের ভেতরকার সেই ছোট্ট অংশটুকুর দিকে তাকাবে, যেখানে আপনি নিজের তেজ আর সাহসকে রেখে দিয়েছেন। একটা জন্তু মানুষকে যতোটা দেখতে পায়, কুয়েস্তা তার চাইতে বেশি কিছু দেখতে পেতো বলে আমার মনে হয় না—মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখার কথা বলছি, যেমন আমি আপনাকে বা আপনি আমাকে দেখেন। কুয়েস্তা ছিলো একটা জন্তু, একটা আশ্চর্য জন্তু। আমি প্রায়ই ভাবি, মানুষ যদি নিজের মন এবং কথা বলার শক্তিকে গড়ে না তুলতো, তাহলে তারাও

কুয়েস্তার মতো আশ্চর্য জন্তু হয়ে উঠতো—তাদেরও অমনি অদ্ভুত চোখ থাকতো। যা সিংহ বা বাঘের চোখের চাইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর। আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, একটা সিংহ বা বাঘ কক্ষনো ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ছাখে না? ওরা সত্যিই কখনও আপনার দিকে তাকায় না। কিন্তু আপনার ভেতরকার যে অংশটিতে আপনার সাহস বাস করে, আপনার সেই ছোট্ট অংশটির দিকে তাকাতেও ওরা ভয় পায়। অথচ কুয়েস্তা তাতে ভয় পেতো না। সে সরাসরি সেদিকে তাকাতো এবং সেটা গলে যেতো।'

'আচ্ছা, সাধারণ জীবনে মানুষটা কেমন ছিলো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কথা বলতো না, ভীষণ চুপচাপ থাকতো। একেবারেই চালাক-চতুর নয়। এমন কি একটা জেনারেল হবার মতো যথেষ্ট চাতুর্যও ওর ছিলো না। ভীষণ পাশবিক এবং বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারতো। তবে সাধারণত শান্ত হয়েই থাকতো। কিন্তু সর্বদাই সে 'বিশিষ্ট' হয়ে উঠতো। তার সঙ্গে একই ঘরে থাকলে, আপনি যে কোনো মহিলা বা পুরুষের চাইতে তাকেই বেশি করে লক্ষ্য করবেন। লোকটা বোকা ছিলো, কিন্তু অন্যকে নিজের সম্পর্কে শারীরিক ভাবে সচেতন করে তুলতো—ঘরের মধ্যে একটা বেড়াল থাকলে যেমনটি হয়। আমি বলছি, মানুষ নিজের মধ্যে যেখানটাতে সাহস সঞ্চয় করে রাখে, সেখানটাতে সে মায়াজাল ছড়িয়ে রাখতো · মানুষের ওপরে সম্মোহিনী বিছিয়ে দিতো।'

'এটা কি সে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করতো?'

'সেটা বলা শক্ত। তবে সে জানতো যে সে এটা পারে। হয়তো কোনো কোনো মানুষের ওপরে সে এটা প্রয়োগ করতে পারতো না, তবে তেমন লোকের সঙ্গে সে কোনোদিনই দেখা করতো না। যারা তার সম্মোহনের আওতার মধ্যে ছিলো, সে শুধু তাদের সঙ্গেই দেখা করতো। অবিশ্যি ষাঁড়-লড়াইয়ের আঙিনায় সে সবাইকেই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। প্রত্যেকের স্বাভাবিক চেতনাকেই তখন সে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারতো সেখানে সে ছিলো বিস্ময়কর—মৃত্যুকে নিয়ে এমনভাবে খেলতো, যেন মৃত্যু একটা বেড়াল-ছানা। আর কি ক্ষিপ্র ·· নক্ষত্রের মতো ক্ষিপ্র, ফুলের মতো শান্ত—আর সবদাই মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতো। ও যে কোনোদিন খুন হয়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য। তবে খুব অল্প বয়সেই অবসর নিয়েছিলো।···ভীষণ বলিষ্ঠ ছিলো মানুষটা, আচমকা এক হাতের একটি আঘাতে সে ষাঁড়টাকে মেরে ফেলতো। মৃত্যুর বোঝা নিয়ে ষাঁড়টা তখন তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তো আর মানুষ তখন পাগল হয়ে যেতো। হলদে চোখের শীতল আর সুন্দর ঘৃণার দৃষ্টিতে সে তখন পলকের জন্যে

মানুষগুলোর দিকে তাকাতো—যেন সে মৃত্যুর চামড়ায় জড়ানো একটা পশু। আহা, কি অদ্ভুত ছিলো মানুষটা! আর আজ আমি তাকে একটা আমেরিকান সাঁতারের পোশাক পরে এক মহিলার সঙ্গে লিডোতে স্নান করতে দেখলাম। যখন তাকে দলাই-মলাই করা হচ্ছিলো, তখন মাঝেমাঝেই আমার হাতের তোয়ালেটা থেমে যাচ্ছিলো। ওর শরীরটা রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো, ভীষণ মসৃণ, গায়ে লোম প্রায় নেই বললেই চলে, রংটা মাখনের মতো হলদে। ওর শরীরটাকে আমার চিরদিনই ছেলেমানুষদের মতো মনে হতো, এতো নরম। কিন্তু চোখের মতো ওর শরীরটাতেও সেই একই রহস্য, যেন ওকে ছোঁয়া যায় না—যেন ছুঁলেও দেখা যাবে সেটা সে নয়। যখন তার পরনে কোনো পোশাক থাকে না, তখন সে নগ্ন। কিন্তু মনে হয়, তার সত্যিকারের সামনে যাবার আগে তার মধ্যে আরও অনেক—অনেক বেশি নগ্নতা থাকবে। আপনি আমার কথাগুলো আদপেই কিছু বুঝতে পারছেন তো? নাকি সবই আপনার কাছে বোকামো বলে মনে হচ্ছে?'

'শুনে আগ্রহ জাগছে', আমি বললাম। 'মেয়েরা নিশ্চয়ই হাজারে হাজারে ওর প্রেমে পড়তো?'

'লাখে লাখে! মেয়েরা ছিলো তার জন্যে পাগল। একবার তার স্বাদ পেলে মেয়েরা সত্যিই পাগল হয়ে যেতো। এটা রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর* মতো আবেগ-সর্বস্ব ব্যাপার নয়। এটা পাগলামো—ঠিক যেন রাত্রিবেলা চিৎকার করে ওঠে বেড়ালের দল। তখন ওরা বুঝতে পারতো না, ওরা পৃথিবীতে রয়েছে নাকি স্বর্গে রয়েছে। মেয়েরা হচ্ছে এই। সে ইচ্ছে করলে প্রতি রাত্রে চল্লিশটা সুন্দরী মেয়েকে, বছরের প্রথম থেকে শেষ অব্দি প্রতি রাত্রে এক একটি আলাদা মেয়েকে উপভোগ করতে পারতো।'

'কিন্তু ও নিশ্চয়ই তা করতো না?'

'না, না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, সে বহু মেয়েকেই উপভোগ করে। কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় হবার পরে দেখলাম, যে সমস্ত মেয়েরা তাকে ঘিরে থাকে সে তাদের কাউকেই গ্রহণ করে না। যে দুটি মেক্সিকান মহিলার সঙ্গে সে বাস করতো তারা ছিল নম্র, রেড ইণ্ডিয়ান। অন্য সকলের দিকে সে থুথু ছুঁড়তো, তাদের সম্পর্কে ভয়ংকর অশ্লীল ভাষায় মন্তব্য করতো। আমার ধারণা, ওকে পাবার চেষ্টা করতো বলে ও ওই সমস্ত মেয়েদের চাবকাতে চাইতো, যেন

*মার্কিন চলচ্চিত্র অভিনেতা। প্রকৃত নাম রুদোলফো দ্য আন্তনগুয়োলো (১৮৯৫-১৯২৬) বিশের দশকে রোম্যান্টিক চরিত্রে অভিনয় করে সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন।

করে ফেলতে চাইতো।'

'শুধু ষাঁড়-লড়াইয়ের আঙিনায় সে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলতো,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ছিলো তাদের দিকে ওর ছুরি শানানো।'

'তারপর সে যখন অবসর নিলো, হাতে অনেক টাকা—তখন সে কিভাবে নিজেকে আনন্দ দিতো?'

'ও ছিলো বড়োলোক, বিরাট জমিদারির মালিক, বহু লোক ওর হয়ে ক্রীতদাসের মতো খাটতো। আমার ধারণা, অমন রাজার হালে জীবন কাটাবার জন্যে ও গর্ববোধ করতো।· বহু বছর আমি ওর কোনো খবর পাইনি। এখন হঠাৎ ওকে দেখলাম এই ভেনিসে, সঙ্গে এক ফরাসী মহিলা—যে ভুল স্প্যানিশে কথা বলে।'

'কুয়েস্তার বয়েস কতো?'

'কতো বয়েস? প্রায় পঞ্চাশ কিংবা তার সামান্য কিছু কম।'

'এতো কম! তা আপনি কি ওর সঙ্গে আলাপ করবেন?'

'জানি না, এখনও মনস্থির করতে পারিনি। এখন ওর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ও ভাববে, আমার টাকার দরকার।'

কোলমেনারেসের কণ্ঠস্বরে এবারে সুস্পষ্ট ঘৃণার সুর।

বললাম, 'তা আপনাকে সে টাকা দেবে না-ই বা কেন? আমার ধারণা এখনও সে ধনী?'

'হাঁ, ধনী বই কি! চিরদিনই সে ধনী থাকবে। সে অ্যামেরিকান টাকা পেয়েছে। আপনি কি কোনোদিনও শোনেন নি, এক মহিলা ওকে পাঁচ লক্ষ ডলার দিয়ে গেছে।'

'না। কিন্তু তাহলে সে আপনাকে টাকা দেবে না কেন? আমার ধারণা, অতীতে আপনি প্রায়ই ওকে কিছু কিছু দিতেন?'

'সে তো অতীত কাল। ও আমাকে কখনো কিছু দেবে না—কিংবা শত খানেক ফ্রাঁ বা অমনি কিছু দেবে। কারণ ওর মনটা ভীষণ নিচ। যে অ্যামেরিকান মহিলাটি ওর জন্যে পাঁচ লক্ষ ডলার রেখে আত্মহত্যা করলো, আপনি কি তার কথা কিছুই শোনেন নি?'

'না। সেটা কবেকার ঘটনা?'

'বহুকাল আগের· প্রায় ১৯১৪ বা ১৯১৩ সালের। তদ্দিনে আমি নিজের সমস্ত টাকা-পয়সা খুইয়ে ফেলেছি। মহিলার নাম, ইথেল কেন। আপনি কি

কোনোদিনই ওর কথা শোনেন নি?'

'শুনেছি বলে মনে হয় না,' মনে হলো মহিলাটির কথা না শুনে আমি ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি।

'ইস, আপনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে বুঝতেন! অসাধারণ ছিলো মেয়েটি। পারীতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তখনও আমি মেক্সিকোতে ফিরে আসি নি বা কুয়েন্তার সঙ্গেও আমার ভালোভাবে আলাপ হয়নি। ও প্রায় কুয়েন্তার মতোই অসাধারণ ছিলো। যারা জন্মসূত্রেই ধনী, কিন্তু যাদের আমরা গেঁয়ো বলি—ও ছিলো তেমনি এক অ্যামেরিকান মহিলা। ইথেল নিউ-ইয়র্ক বা বোস্টনের মেয়ে নয়—ওমাহা বা অন্য কোথাকার। ওর চুলগুলো ছিলো সোজা, ঘন, সোনালি রঙের। যে সমস্ত মেয়েরা সব চাইতে প্রথমে ফ্লোরেন্সের বালক-ভৃত্যদের মতো ছোটো করে চুল ছাঁটিয়েছিলো, ও ছিলো তাদের মধ্যে একজন। ওর গায়ের চামড়াটা ছিলো ফর্সা, চোখদুটি ভীষণ নীল, চেহারাটা ছিপছিপে নয়। প্রথমটাতে ওকে দেখে কেমন যেন ছেলেমানুষ বলে মনে হতো। ভরাট গাল, স্বচ্ছ দুটি চোখ, মিথ্যে-নিষ্পাপ চাহনি—চেহারাটা বুঝতে পেরেছেন তো? বিশেষ করে ওর চোখদুটি ছিলো উষ্ণ, সরল, মিথ্যে-নিষ্পাপ, কিন্তু আলোয় ভরা। শুধু মাঝে মাঝে তাতে রক্তের ছটা লাগতো। ওহ্, কি অসাধারণই না ছিলো মেয়েটি। ভালোভাবে পরিচয় হবার পরে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর সোনালি ভ্রূ দুটো নাকের ওপরে কিভাবে শয়তানের মতো এক হয়ে জুড়ে গেছে। আর কি সাংঘাতিক উৎসাহ-উদ্দীপনাই না ছিলো মহিলার! ঠিক যেন একটি ডায়নামো। পারীতে ও এক সপ্রতিভ. লালমুখো, খিটখিটে স্বভাবের অ্যামেরিকানকে বিয়ে করে। লোকটা ছবি আঁকতো, আধুনিক হতে চাইতো। মহিলা অসংখ্য লোককে চিনতো, সব ধরনের মানুষই ওর কাছে আসতো—যেন হরেক রকম মানুষের একটা প্রদর্শনী চালাতো ও। তা ছাড়া ও পুরনো আসবাব আর জরির বুটিদার রেশমী কাপড় কিনতো। ওর পছন্দের কোনো ফুল-তোলা-মখমলের কিংখাব অন্য কেউ কিনেছে দেখলে ও ক্ষেপে উঠতো। পোকায় কাটা কোনো প্রাচীন কুর্সি দেখলে ও প্রচণ্ড লালসায় একেবারে মোহাবিষ্ট হয়ে যেতো। এবং ওর বদলে অন্য কেউ সেটা পেলে, ও একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠতো। জিনিস! 'জিনিস'-এর নামে ও ছিলো পাগল। কিন্তু তা শুধু কিছু দিনের জন্যে। চিরদিনই ও ক্লান্ত হয়ে উঠতো। বিশেষ করে নিজের প্রচণ্ড আগ্রহের বস্তুতে।

'পারীতে ওর সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়েছিলো, এসব তখনকার কথা।

সম্ভবত তারপরেই ও স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নেয় এবং বিপ্লব শান্ত হয়ে ওঠার পরে মেক্সিকোতে চলে আসে। মনে হয় কারানজা-র* চিন্তাধারা ওকে মুগ্ধ করেছিলো। কারুর মধ্যে নাটকীয় শক্তি আছে বলে মনে হলে ও যেমন করে হোক তার সঙ্গে আলাপ করতো। এটাও ছিলো ওর জরির বুটিদার রেশম আর পুরনো কুর্সির লালসার মতো তীব্র। ওই সময়ে ও একজন সমাজতন্ত্রীও ছিলো। তখন কিন্তু কুর্সির প্রতি ওর কোনো আকর্ষণ ছিলো না।

'মেক্সিকোতে ইথেল ফের আমাকে খুঁজে বের করলো। ওর সঙ্গে হাজারো মানুষের আলাপ — যখনই কাউকে প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে হতো, তখনই তাকে ওর মনে পড়তো। অতএব আমাকেও স্মরণ করলো। আমি যে তখন গরীব, তাতে ওর কিছুই এসে-যায়নি। আমি জানি, আমার সম্পর্কে ও মনে করতো: 'সেই যে হতভাগা — লুই, না কি যেন নাম!' কিন্তু আমাকে ওর কিছুটা প্রয়োজন ছিলো এবং হয়তো আমার মধ্যে ও খানিকটা পদার্থও খুঁজে পেয়েছিলো। অন্তত আমাকে ও প্রায়ই রাত্রিবেলা খেয়ে যাবার জন্যে বা ওর গাড়িতে করে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতো। ইথেল ছিলো অদ্ভুত, সম্পূর্ণ বেপরোয়া আর ডানপিটে — অথচ নিজের পরিবেশ অনুযায়ী লাজুক আর বে-মানান। একমাত্র ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে এলেই ও হয়ে উঠতো বিবেক-বিহীন আর রক্তমাংসে গড়া শয়তানের মতো অদম্য। সমাজের সম্পর্কে যার খারাপ ধারণা আছে এবং সমাজকে যে ভয় পায়, তেমন মানুষের মতো জনসমক্ষে এবং অপরিচিত জায়গায় যেতে ইথেল ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করতো। এবং ওই কারণেই ওর এবং অন্যদের মাঝখানে দাঁড়াবার মতো কোনো পুরুষ মানুষকে সঙ্গে না নিয়ে ও কোনোদিনও কোথাও বেরুতো না।

'ইথেল মেক্সিকোতে থাকার সময় আমিই ছিলাম সেই পুরুষ-মানুষ। শীঘ্রই ও আবিষ্কার করলো, এ কাজে আমার ভূমিকা দিব্যি সন্তোষজনক। কারণ কোনো অধিকারের দাবী না জানিয়ে স্বামীর সমস্ত কর্তব্যই আমি পালন করবো। আর সেটাই ও চাইতো। মনে হয় ও একটি অসাধারণ এবং নবযুগ-সৃষ্টিকারী স্বামী খুঁজছিলো। কিন্তু স্বামীটিকে এমন হতে হবে যাতে সে ওর অসাধারণ এবং নবযুগ-সৃষ্টিকারী উদ্দীপনা আর চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যায়। ইথেল অসাধারণ, কিন্তু ও শুধু অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে — নিজে কিছুই করতে পারে না। ও সোফায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা আর

---

*ভেনুস্তিয়ানো কারানজা (১৮৫৯-১৯২০) — মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট (১৯১৪-২০)। দেশের খনিজ-সম্পদ জাতীয়করণের চেষ্টা করেছিলেন, সফল হয়নি।

পরিকল্পনা করে আর ওর ভেতরে উৎসাহ-উদ্দীপনাগুলো টগবগ করে ফোটে। অথচ একটা দল বা কয়েকজন মানুষ কিংবা একটি মাত্র মানুষ সঙ্গে থাকলেও, ইথেল কিছু একটা শুরু করে দিতে পারে—পুতুল নাচের মতো তাদের সবাইকে হাসি-কান্নায় ভরা নাটকে নাচাতে পারে।

'কিন্তু যে সমস্ত মেয়েরা পুরুষদের পুতুলের মতো নাচায়, মেক্সিকোর পুরুষরা তেমন মেয়েদের আদৌ কোনো পাত্তা দেয় না। রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো মেক্সিকোতেও মেয়েদের নম্র হয়ে ধুলোর সঙ্গে মাথা লুটিয়ে রাখতে হয়। অ্যামেরিকান মেয়েরা সেখানে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। তাই সেখানে তাদের উৎসাহ এবং অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কোনো কাজেই আসে না। সেখানে পুরুষেরা বরঞ্চ স্বেচ্ছায় শয়তানের কাছে যাবে তবু ছোটো ছোটো ঝুড়িতে করে বাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া মেয়েদের কথায় তা করবে না।

'অতএব ইথেল শুধুমাত্র একটা ঠাণ্ডা কাঁধ নয়, বেশ কয়েকটা চৌকো মোটা পিঠকেই পেছনে ফিরতে দেখলো। তারা ওকে চাইতো না। বিপ্লবীরা ওকে লক্ষ্যই করতো না। কোনো মেয়েমানুষের হস্তক্ষেপ তারা পছন্দ করতো না। জেনারেল ইসিডোর গ্যাবারে ওর সঙ্গে নাচার পরে আশা করেছিলেন, ইথেল অবিলম্বে তাঁর রক্ষিতা হতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু ইথেলের ভাষায়, ও 'ওসবের মধ্যে নেই'। আশিতে হাতুড়ি ঠোকার মতো এক ভয়ংকর ভঙ্গিমায় ও বলতে, 'আমি ওসবের মধ্যে নেই'। এবং কেউই ওকে ওসবের মধ্যে নিতো না।

'অবিশ্যি প্রথম দিকে জেনারেলরা ওর শুভ্র কাঁধ, সোনালি চুল আর নিষ্পাপ মুখখানা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেন, 'এই তো আমাদের মনের মতো জিনিস'। তাঁরা ওর নিষ্পাপ দৃষ্টি দেখে প্রতারিত হতেন না, প্রতারিত হতেন ওর অসহায়ের মতো ভঙ্গিমায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ে আর মুখে রক্ত ছুটে আসতো, চোখদুটি উত্তপ্ত হয়ে উঠতো বিতাড়ক-উদ্দীপনায় ফুলে উঠতো ওর সমস্ত শরীর এবং ফরাসী অথবা অ্যামেরিকান ভাষায়, একেবারে তীব্র অ্যামেরিকান ভঙ্গিমায় ও ধমকে উঠতো, 'থামুন। ওসমস্ত নয়।'

'ইথেলের ক্ষমতাও ছিলো যথেষ্ট। শরীর থেকে এক আশ্চর্য বিতাড়ক-উদ্দীপনা বের করে, ও অন্যকে নিজের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করাতে পারতো। ইয়োরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষরা প্রায় সর্বদাই ওর সামনে এসে মুকড়ে যেতো। কিন্তু ওর মেক্সিকোতে আসাটা ছিলো ভুল দোকানে সওদা করতে যাবার সামিল। ওখানে পুরুষরাই আইন। ইথেলের আলোয় ভরা

নীল চোখ আর উদ্দীপনাময় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শুভ্র ত্বক দেখে তারা আশা করতো, ও অবিলম্বে তাদের প্রেমিকা হয়ে উঠবে। কিন্তু খুব শীগ্রিই তারা যখন দেখলো ইথেল 'ওসবের মধ্যে নেই,' তখন তারা মুখ ঘুরিয়ে ইথেলকে তাদের মোটা পিঠগুলো দেখিয়ে দিলো। যেহেতু ও চতুর এবং অসাধারণ, যেহেতু ও সুতো টেনে মানুষকে নাচাবার মতো এক অদ্ভুত উদ্দীপনা ও আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী- তাই তারা ওকে নিয়ে এতোটুকুও মাথা ঘামাতো না। তারাও 'ওসব' চাইত না। সম্ভবত মার্কিন সরকারের দিক থেকে ঝামেলা হবার ভয় না থাকলে, তারা ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে রক্ষিতা হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতো।

'অতএব শীগ্রিই ইথেলের একঘেয়ে লাগতে শুরু করলো এবং ও নিউইয়র্কে ফিরে যাবার কথা ভাবতে লাগলো। ও বলতো, মেক্সিকো এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো আত্মা বা সংস্কৃতি নেই, এমন কি যান্ত্রিক দিক দিয়ে দক্ষ হবার মতো যথেষ্ট মস্তিষ্কও এখানে নেই। শুধু দুষ্টু ছেলের দল এখানে জঘন্য নোংরা কাজ করে বেড়ায়—একদিন এরা উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। আমি ওকে বলেছি: ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষার কাহিনী, যা কেউ কোনোদিনও শেখে না। আর ও আমাকে বলেছে: পৃথিবীর অবশ্যই অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে ওর ধারণা, শুধু মেক্সিকোরই কিছু হয়নি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, তাহলে ও কেন মেক্সিকোতে এসেছিলো। ও বলেছে, ও ভেবেছিলো এখানে অনেক কিছু করার আছে যার মধ্যে জড়িত হয়ে থাকতে ওর ভালো লাগবে। কিন্তু এখন দেখছে, শুধু বদমাশ আর অধিকাংশ ভীরু ছেলের দল এখানে বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি করে মারামারি ধরনের অসভ্যতা করে বেড়ায়—কাজেই ওরা বরঞ্চ তা-ই করুক। আমি বলেছি, আমার ধারণা এটাই জীবন। ও জবাব দিয়েছে, এ জীবন ওর জন্যে নয়।

'ইথেল বলেছিলো, ওর একমাত্র বাসনা এক কল্পনার জীবনে বাস করা—তাকে সফল করে তোলা। তখন কথাটাকে আমার হাস্যকর বলে মনে হয়েছিলো। ভেবেছিলাম, আসলে ও প্রেমে পড়ার মতো একটি পুরুষ-মানুষকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরে দেখলাম, ও ঠিকই বলেছিলো। নিজেকে ও এক অসাধারণ এবং ক্ষমতাময়ী নারী হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছিলো, যে মানুষের ইতিহাসকে বিস্ময়করভাবে বদলে দেবে—ঠিক রাশিয়ার ক্যাথেরিনের মতো—যিনি শুধুমাত্র রাশিয়ান নন, যিনি বিশ্বজনীন। ইথেল কিন্তু সত্যিই এক অসাধারণ নারী ছিলো—যেমন প্রচণ্ড ওর ইচ্ছাশক্তি তেমনি

বিস্ময়কর ওর উৎসাহ-উদ্দীপনা, যা অ্যামেরিকান মেয়েদের মধ্যেও বিরল। ও ছিলো একটা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো—যার ভেতরকার সঞ্চিত ইন্ধন বাষ্প হয়ে ফুঁসে বেরোয়, অনেকগুলো বগিকে গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যাকে বাষ্প ছেড়ে দিতে হয়। আমি বুঝতে পারিনি, কি করে এ জিনিস নশ্বর জীবনস্রোতে পরিবর্তন আনবে। এ তো যানবাহন সংক্রান্ত কলোরোলেরই অংশ বিশেষ! সংঘর্ষ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রে ঝনৎকার তুলে ও বগিগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটাকে ধাক্কা লাগাতো, মাঝে মাঝে পথ থেকে ছিটকে ফেলে দিতো কোনো হতভাগ্য বগিকে। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম না, এতে কিভাবে মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন আসবে। ও যেন একটু দেরী করে এসে পৌঁছেছিলো—আজও কিছু কিছু নায়ক-নায়িকা যেমনটি করে, চিরদিনই যা করতো।

'আমি সর্বদাই ভাবতাম, ইথেল কেন কাউকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করে না। তখন ওর বয়েস তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি, দারুণ স্বাস্থ্যবতী এবং ওই আশ্চর্য উদ্দীপনায় ভরা। ও অনেক পুরুষের সঙ্গেই দেখা করতো এবং সর্বদাই তাদের কোনো উপর'ই দিয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে দেবার জন্যে টেনে বের করতো। এক সুনিশ্চিত পন্থায় ও পুরুষ-মানুষকে আকর্ষণ করতো, অথচ ওর কোনো প্রেমিক ছিলো না।

'নিজের সম্পর্কেও আমি ভেবেছি। আমরা ছিলাম বন্ধু, অনেকটা সময়ই আমরা একত্রে কাটাতাম। অবশ্যই আমি ওর মায়াজালের আওতার মধ্যে ছিলাম। যখনই মনে হতো ও আমাকে চাইছে, আমি ছুটে যেতাম। ও যা কিছু করতে বলতো, করতাম। যখন দেখতাম আমার নিজের চেনাজানা মানুষরাও আমার দিকে তাকিয়ে উপহাসের হাসি ছড়াচ্ছে, আমি একটা অ্যামেরিকান মহিলার হয়ে খাটছি বলে আমাকে অপছন্দ করছে—তখন আমি ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করতাম, মেমিবানদের ভাষায় ওকে ওর 'যথা স্থানে' তুলতে চাইতাম—যার অর্থ বিনা পোশাকে বিছানায় নিয়ে তোলা। অথচ যে মুহূর্তে আমি ওকে দেখতাম, ও একটি চাহনি আর একটি কথাতেই আমাকে জয় করে নিতো। ভারি চতুর ছিলো ইথেল। অবশ্যই ও আমাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতো। এমন করতো, যাতে আমি নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করি। সেখানেই ছিলো ওর চাতুর্য। আমি ওকে মেমিবোর সব কিছু বলেছি, বলেছি আমার সমস্ত জীবন আর ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণার কথা। নিজের কথা আমার নিজের কাছেই প্রচণ্ড মৌলিক বলে মনে হতো। ইথেল তা এমন একাগ্র হয়ে শুনতো যে আমার মনে হতো, আমি যা বলছি তাতে

ওর গভীর আগ্রহ। কিন্তু আমার সঙ্গে ও তখন অপেক্ষা করতো যাতে একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে পারে, একটা কিছু শুরু করতে পারে। এই 'একটা কিছু শুরু করা' ছিলো ওর অবিরাম কামনা। অথচ আমি ভাবতাম, ও আমার প্রতি আগ্রহী।

'পুরনো রেশমি কাপড়ে ঢাকা বিশাল একখানা সোফায় শুয়ে থাকতো ইথেল। আর ওর শরীরটা ঢাকা থাকতো অপরূপ একখানা কালো শালে, যার সর্বত্র চড়া রঙের সুতোয় আঁকা সুন্দর সুন্দর পাখি আর ফুলের ঝিলিমিলি। সুতোর কাজ তোলা যে সমস্ত শাল গায়ে জড়িয়ে আমাদের মেক্সিকান মহিলারা ষাঁড়ের লড়াই বা মুক্ত-অঙ্গনের উৎসব-অনুষ্ঠান দেখতে যান, এটা ছিলো তারই এক অতি চমৎকার নমুনা। শালের দীর্ঘ ঝালরগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝলসে ওঠা ওর শুভ্র বাহু, প্রাচীন ইতালিয় অলংকারের নিচে ওর শুভ্র অদম্য বুক আর হলদে ধাতুর মতো এগিয়ে থাকা ওর ছোটোছোটো সোনালি রঙের ঘন চুলের গোছা—আমাকে প্রলুব্ধ করে তুলতো, আমার মুখ খুলিয়ে দিতো। এর আগে বা পরে আমি কোনোদিনও অতো কথা বলিনি। সব সময় শুধু কথা আর কথা! আমার বিশ্বাস আমি খুবই সুন্দরভাবে সত্যিই খুব দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু কথা ছাড়া আর কিছু নয়! মাঝে মধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পরেও আমি ওর সঙ্গে থেকেছি। কখনও কখনও ও অধৈর্য হয়ে বা একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে নাক দিয়ে ঘোড়ার মতো শব্দ করেছে, মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঝাঁকুনি তুলেছে ওর সোনালি চুলের গোছায়। আমার ধারণা ওর খানিকটা অংশ তখন চাইতো, আমি ওর সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় লীন হয়ে যাই।

'কিন্তু আমি তা করিনি, করতে পারিনি। আমি ছিলাম ওর প্রভাবের মধ্যে, ওর শক্তির অধীনে। ও সুন্দর ভাবে আমাকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতো। আমি নিশ্চিত সে বিষয়ে আমি সত্যিই সুদক্ষ ছিলাম। কিন্তু আমার অন্যান্য অংশগুলো ছিলো আড়ষ্ট, পাথরের মতো কঠিন। আমি ওকে ছুঁতে পারতাম না, ওর একখানা হাতও নিজের হাতে তুলে নিতে পারতাম না। দৈহিক দিক দিয়ে সেটা ছিলো আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যখন ওর কাছ থেকে দূরে থাকতাম তখন ইন্দ্রিয়সুখের শিহরণ নিয়ে আমি ওর কথা, ওর শুভ্র স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহটার কথা চিন্তা করতে পারতাম। এমন কি চুমু দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ওর বাড়িতেও ছুটে যেতে পারতাম এবং সেই রাতেই ওকে আমার প্রেয়সী করে তুলতে পারতাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ওর কাছে যেতাম, তখুনি ওই বাসনাটা আমাকে ছেড়ে চলে যেতো। আমি ওকে স্পর্শ করতে পারতাম না।

ওকে স্পর্শ করতে গেলে আমার মনটা বিমুখ হয়ে উঠতো। যে কোনো কারণেই হোক, শরীরের দিক দিয়ে ওকে আমি ঘৃণা করতাম।

'ভেতরে ভেতরে আমি অনুভব করতাম, এর কারণ—ও আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কারণ—চিরদিনই ও পুরুষ মানুষকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে মানুষের সমস্ত সক্রিয় পুরুষতাকে। ও শুধু চাইতো নিষ্ক্রিয় পুরুষতা, 'বশ্য' আর ওর ভাষায়, এই কল্পনার জীবনকে। ভেতরে ভেতরে ও উত্তেজিত হয়ে উঠতো আর ভাবতো। ও চাইতো কেউ ওকে ভালোবাসুক...একান্ত নিবিড় করে ভালোবাসুক—তাই এই উত্তেজনা। কিন্তু আসলে তা নয়। সমস্ত পুরুষ জাতির বিরুদ্ধেই ও বিরক্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতো। পুরুষ মানুষের দেহের কাছে ও ছিলো নির্দয়। কিন্তু তাদের মন, তাদের আত্মাকে ও উত্তেজিত করে তুলতো। এতে ও আনন্দ পেতো। একটা পুরুষ ওর চারদিকে চাকরের মতো ঘুরে বেড়াবে, এটা ওর ভালো লাগতো। কোনো পুরুষকে, বিশেষ করে তার মনটাকে প্ররোচিত করে তুলতে ও ভালোবাসতো। মানুষটা যখন ওর কাছে থাকতো না তখন ও-ও ভাবতো, ও তাকে প্রেমিক হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু মানুষটা যখন কাছে থাকতো যখন সে ওর দেহের রহস্যময় ফলটাকে নিজের জন্যে সংগ্রহ করতে চাইতো, তখন এক সুতীব্র ঘৃণায় মানুষটার বিরুদ্ধে ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। পুরুষ মানুষ স্রেফ' ওর চাকর হয়ে থাকবে—আর কিছু নয়। কল্পনার জীবন বলতে ইথেল তা-ই বুঝতো।

'আর আমি ছিলাম ইথেলের চাকর। সবাই আমাকে উপহাস করতো। কিন্তু আমি নিজেকে বলতাম, ওকে আমি আমার প্রেমিকা করে তুলবো। এবং সেজন্যে প্রায় দাঁতে দাঁতে চেপে থাকতাম। কিন্তু এসবই দূরে থাকার সময়। কাছে গেলে ওকে আমি স্পর্শও করতে পারতাম না। ওকে স্পর্শ করার জন্যে নিজেকে রাজী করাবার চেষ্টা করলে আমার ভেতরে কি যেন একটা কেঁপে কেঁপে উঠতে শুরু করতো। কাজটা ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমি জানতাম, ওর ভেতরকার শরীরটা দিয়ে ও আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, প্রতিনিয়ত সত্যিই সরিয়ে দিচ্ছে আমাকে।'

'অথচ ইথেলও আমাকে চাইতো। ও ছিলো নিঃসঙ্গ—ওর ভাষায়, একাকিনী। আমি ওর বাইরের সত্তাটার সঙ্গে প্রেম করলে ওর ভালোই লাগতো। আমার ধারণা, ও আমার প্রেমিকা হতেও রাজী হতো এবং মাঝে মধ্যে সামান্য কয়েকটি মর্মান্তিক অপমানজনক মুহূর্তের জন্যে ওকে গ্রহণ করতেও আমাকে অনুমতি দিতো—তারপর দ্রুত আমাকে ঝেড়ে ফেলতো আবার।

কিন্তু আমি তা পারিনি। কারণ ওর ভেতরের সত্তাটা কোনোদিনও আমাকে চায়নি। আমি স্রেফ ওর পুরুষ-বেশ্যা হতে পারিনি। কারণ তারপরেই ও আমাকে ঘৃণা করতো—ওর কাছ থেকে সামান্য একটু তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করলেও ও অপমান করতো আমাকে। আমি তা জানতাম। ইতিমধ্যেই ওর দুটি স্বামী হয়েছিলো আর ও ছিলো এমন এক মহিলা যে সব কিছু বলবার জন্যে সর্বদা একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকতো। আমাকে ও বড্ডো বেশি বলে ফেলেছিলো। ওর অ্যামেরিকান স্বামীদের মধ্যে একজনকে আমি দেখেছিলাম। নিজেকে ওই একই আলোয় দেখার বা অঙ্গীকারবদ্ধ হবার কোনো বাসনাই আমার ছিলো না।

'না, ইথেল কল্পনা'র জীবন যাপন করতে চেয়েছিলো। ও বলতো, কল্পনা সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রক হতে পারে—অবিশ্যি যতোক্ষণ না মাথায় গুলি বেঁধে বা একটা চোখ উপড়ে ফেলা না হয়। মেক্সিকান বর্বরতা এবং সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের সেই বিখ্যাত মামলাটার কথাপ্রসঙ্গে ও বলেছিলো ধর্ষিতা হয়েছে বলেই একটি মেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে—এটা স্রেফ বোকামো। মেয়েটি ওসব ছাপিয়ে উঠতে পারতো। জৈবিক দিক দিয়ে ওটা সত্যিকারের কোনো ক্ষতিই নয়। কল্পনা সমস্ত কিছুকেই ছাপিয়ে যেতে পারে। কল্পনার জীবনে বাস করলে যে কেউ যে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারে। এমন কি খুন করলেও তার ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া সম্ভব। কল্পনা এবং কৌশল ব্যবহার করে একটি মেয়ে যে কোনো ব্যাপারে—এমন কি সবচাইতে নিচ এবং জঘন্য কাজেও—নিজেকে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারে। একটা মেয়ে নিজের কল্পনাকে স্বপক্ষে ব্যবহার করে বলে, সে তার নিজের কাছে একটা নিষ্পাপ শিশুর চাইতেও বেশি নিষ্পাপ হয়ে ওঠে—তা সে যতো বাজে কাজই করে থাকুক না কেন।'

'পুরুষরাও তা-ই করে,' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এটা হচ্ছে আধুনিক কৌশল। তাই আজকের দিনে প্রত্যেকেই নিষ্পাপ-নির্দোষ। কল্পনায় প্রতিটি জিনিসই পবিত্র—যদি আপনি নিজে তা করে থাকেন।'

আমি বিদ্রূপ করছি কি না দেখার জন্যে কোলমেনারেস কালো চোখদুটো তুলে চকিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বা আমার বাধা দেবার ফলে ওঁর কিছুই এসে-যায়নি। যে মহিলাটি ওঁকে এতো চতুর করে তুলেছেন, যিনি ওঁকে নিজের আজ্ঞাবহ করে তুলেছিলেন এবং যাঁর কাছ থেকে উনি কোনোদিনও এতোটুকু তৃপ্তি পাননি—কোলমেনারেস তখন সেই মহিলাটির অনুস্মরণে সম্পূর্ণ তন্ময়।

'তারপর কি হলো?' জিজ্ঞেস করলাম, 'ইথেল কি কুয়েস্তার দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করেছিলো?'

'অ্যাঁ?' কেলিমে-রেস ফের সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন, 'হ্যাঁ! ও ঠিক তাই করেছিলো। আর আমি তখন ঈর্ষায় কাতর হয়ে উঠেছিলাম। যদিও আমি ওকে স্পর্শ করতে পারতাম না, তবু ও অন্য একজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠায় আমি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরতাম। ইথেল আমি বাদে অন্য একজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো, আর আমার আত্মশ্লাঘা ঈর্ষার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠলো। কেন আমি অমন বোকা ছিলাম? কেন আমি এখনও ওই মোটা, হলদে শুয়োর, কুয়েস্তাকে খুন করে ফেলতে পারি? সত্যি, পুরুষ মানুষ চিরদিনই বোকা।'

'ওর সঙ্গে ষাঁড়-লড়িয়েটার কিভাবে দেখা হলো?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনিই কি ইথেলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন?'

'সবাই কুয়েস্তার কথা বলাবলি করতো দেখে একবার ইথেল ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়েছিলো। ষাঁড়-লড়াইয়ের মতো কোনো স্থূল ব্যাপারে ও মাথা ঘামাতো না। তার চাইতে বরং ওর পছন্দ ছিলো আধুনিক নাট্যাভিনয়, দিউজ* আর রেইনহার্ট** এবং কল্পনার বিস্তার। কিন্তু তখন ও নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে, কোনোদিনও ষাঁড়ের লড়াই দেখেনি — ওই একটা লড়াই অবশ্যই দেখা দরকার। ছাউনির তলায়, অনেক উঁচুতে আমি আসন সংগ্রহ করলাম এবং বুঝতেই পারছেন ওর সঙ্গে সেখানে গেলাম।

'প্রথমটাতে ইথেল ভীষণ বিরক্ত, উদ্ধত আর সামান্য ভয়ার্ত হয়ে রইলো। কারণ জানেনই তো, ষাঁড় লড়াইয়ের অঙ্গনে এসে মেক্সিকান দর্শকরা খুব একটা শান্ত হয়ে থাকে না। অতো লোক দেখে ও ভয় পাচ্ছিলো। তবু একটা বিষণ্ণ শিশুর মতো ও নাছোড়বান্দা হয়ে বিরস মুখে বসে রইলো। আর বলতে লাগলো: রোমাঞ্চ পাবার জন্যে এরা কি এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু করতে পারে না? এটা এতো নিচু স্তরের জিনিস!

'কিন্তু শেষ অব্দি কুয়েস্তা একটা ষাঁড়কে নিয়ে খেলা শুরু করতেই ও উত্তেজিত হতে শুরু করলো। কুয়েস্তার পরনে ছিলো গোলাপি আর রুপো রঙের একটা

* এলিয়োনোরা দিউজ (১৮৫৯—১৯২৪)—ইতালীয় অভিনেত্রী। বিয়োগান্ত ভূমিকায় সুপরিচিতা ছিলেন।

** ম্যাক্স রেইনহার্ট (১৮৭৩—১৯৭৩)—প্রকৃত নাম ম্যাক্স গোল্ডমান। প্রখ্যাত অস্ট্রিয়ান মঞ্চ-নির্দেশক।

প্রচণ্ড জমকালো পোশাক। যথারীতি ভীষণ হাস্যকর দেখাচ্ছিলো ওকে—মানে খেলা শুরু করার আগে পর্যন্ত। তারপর, জানেনই তো ওর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু একটা আছে · এতো ক্ষিপ্র, এতো আলতো আর এমন আমুদে ওর ভঙ্গিমা ---বুঝেছেন তো? লড়াইয়ের অঙ্গনে ও যখন একটা ষাঁড়ের সঙ্গে খেলতো, মৃত্যুকে নিয়ে খেলতো—তখন ও ঘোড়ানছানা বা চিতাবাঘের ছানার চাইতেও বেশি আমুদে খেলোয়াড় হয়ে উঠতো। তারা কিভাবে খেলে জানেন তো? ওহ্ চমৎকার কিন্তু! কুয়েস্তা ছিলো তাদের চাইতেও খুশিয়াল আর হালকা—তাদের সমস্ত শরীরে যদি অজস্র ডানা থাকতো শুধু খেলা-করার ডানা, তাহলেও তারা অমনটি হতে পারতো না। কুয়েস্তা যখন মৃত্যুর সঙ্গে খেলতো তখন ওর শরীরে যেন সমস্ত রকমেরই ছোটোছোট খুশিয়াল ডানা জেগে উঠতো -যার সাহায্যে ও চকিতে ছোট্ট মৃদুল সুন্দর ভঙ্গিমায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যেতো - ঠিক যেন একটা চিতাবাঘের নরম ছানার মতো। তারপর শেষটায় সে যখন ষাঁড়টাকে হত্যা করতো, ফোয়ারার মতো রক্ত ঠিকরে যেতো ওকে পেরিয়ে ওহ্! তখন মনে হতো ওর সমস্ত শরীরটা যেন হাসছে। তখনও সেটা সেই শিশুর মতো কোমল আর বিস্ময়ের হাসিই থাকতো কিন্তু আপনি যতোটা কল্পনা করতে পারবেন, আসলে সে হাসি ছিলো তার চাইতেও নির্মম। কুয়েস্তা আমাকে মুগ্ধ করতো, কিন্তু আমি চিরদিনই তাকে ঘৃণা করতাম। সে যেমন করে ষাঁড়গুলোকে বিদ্ধ করতো, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে ওকে গেঁথে ফেলতে পারলে খুশি হতাম।

'আমি বুঝতে পারছিলাম, ইথেল ওর সম্মোহনে ধরা না পড়ার চেষ্টা করছে। কুয়েস্তার আকর্ষণ-শক্তিটা ছিলো অদ্ভুত—ঠিক ওর খেলার মতোই দ্রুত আর অপ্রত্যাশিত, বুঝেছেন -- ঠিক যেন চিতাবাঘের ছানার মতো · কিংবা কখনও বা একটু ধীর, ঠিক ছোটোছোটো খুদে ভালুকের মতো। অথচ সেটা ছিলো একেবারে নিখুঁত নিষ্ঠুরতা। নিষ্ঠুরতার আনন্দ! রক্ত, নোংরামো আর মরা জন্তুকে ঘৃণা করতো ইথেল। ও সব কিছুতেই প্রবল অনীহা ছিলো ওর—কারণ সেটা ওর কল্পনার জীবন নয়। ও ভীষণ ফ্যাকাশে আর প্রচণ্ড নিশ্চুপ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে ছিলো, নড়াচড়া প্রায় করছিলোই না। ওকে পাণ্ডুর, দুর্দমনীয় আর অবদমিত বলে মনে হচ্ছিলো। কুয়েস্তা তিনটে ষাঁড় মারার আগে ও কিছুই বুঝতে দেয়নি। আমিও ওর সঙ্গে কোনো কথা বলছিলাম না। চতুর্থ ষাঁড়টা ছিলো সত্যি দারুণ সুন্দর, প্রাণময়তায় ভরা, ঠিক জানুয়ারীর নার্সিসাস ফুলের মতো চনমনে। ওটা ছিলো স্পেন থেকে নিয়ে আসা একটা বিশেষ ষাঁড় এবং

অন্যগুলোর মতো সে অতোটা নির্বোধ ছিলো না। ষাঁড়টা মাটিতে থাবা মেরে মাথা নুইয়ে নিচের দিকে নিঃশ্বাস ছাড়ছিলো। কুয়েস্তা তখন স্মিত মুখে ভালোবেসে ডাকার ভঙ্গিমায়, ষাঁড়টার দিকে নিজের দুবাহু এগিয়ে দিলো— যেমন করে মানুষ সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্রীটির দিকে দুহাত বাড়িয়ে দেয় যাতে মেয়েটি তার শরীরের দিকে, তার উষ্ণ-উন্মুক্ত শরীরের দিকে, মৃদুল ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসে। কুয়েস্তার এই ভঙ্গিমাটাই মেয়েদের মুগ্ধ করে তুলতো। তার বাহুবন্ধনে যাবার, তার কোমল সুগোল শরীরটার স্পর্শ পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মেয়েরা চিৎকার করে উঠতো, অচেতন হয়ে যেতো। ষাঁড়টা অবিশ্যি সবেগে কুয়েস্তাকে পেরিয়ে গেলো—শুধু পেলো কাঁধে বর্শার দুটো আঘাত। এই হচ্ছে সেই ভালোবাসা।

'ইথেল তখন চিৎকার করে উঠলো, সাবাস! সাবাস! আমি দেখলাম, ও-ও উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এমন কি কুয়েস্তাও ওর গলা শুনতে পেলো এবং মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালো। কুয়েস্তা দেখলো, ও ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে, ওর ছোটোছোটো ঘন চুলগুলো ঝুলে রয়েছে হলুদ সোনার মতো, মুখটা মৃতের মতো সাদা আর চোখদুটো ঝলসে রয়েছে তার দিকে ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাবার মতো ভঙ্গিমায়। এক মুহূর্তের জন্যে ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কুয়েস্তা অভিবাদন জানাবার মতো মাথাটা সামান্য নুইয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কিন্তু ততোক্ষণে সে বদলে গেছে। তারপর থেকে সে আর অতোটা অচেতনভাবে খেলছিলো না। মনে হচ্ছিলো, সে কিছু ভাবছে আর ভুলে যাচ্ছে নিজেকে। আমার ভয় হচ্ছিলো, মানুষটা মারা পড়বে। মনে হচ্ছিলো ও যেন ভীষণ অন্যমনস্ক, যেন বড্ডো বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে। এমনকি ষাঁড়টা যখন চলাচলের বেস্টনিটা ডিঙিয়ে কুয়েস্তার দিকে তেড়ে এলো তখন পেছন দিকে ডিগবাজি খাবার সময় সে ষাঁড়টার মাথায় একটা হাত পর্যন্ত রাখলো এবং ষাঁড়টার একটা শিঙে লেগে তার জামার হাতাটা সামান্য একটু ছিঁড়েও গেলো। ষাঁড়টা যখন ফের ছুটে এসে কুয়েস্তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন সে যেন অন্যমনস্কভাবে জামার ছেঁড়া অংশটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ষাঁড়টা তখন উন্মত্ত। মনে হলো এবারে কুয়েস্তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তবু সে যেন জেগে উঠলো, যেন ঠিক নাগালের বাইরে থেকে জাগিয়ে তুললো নিজেকে। মনে হচ্ছিলো গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা প্রচণ্ড দুঃস্বপ্ন, যা বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলবে। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই বহুক্ষণ লড়াই চলার পর ষাঁড়টাকে সে খুন করেছিলো। প্রেমিকাকে নিয়ে

খেলতে খেলতে প্রায় অবসন্ন হয়ে অবশেষে একজন পুরুষ যেমন তার প্রেমিকাকে গ্রহণ করে, তেমনি ভাবেই শেষ অব্দি ষাঁড়টাকে খুন করলো কুয়েস্তা। কিন্তু আসলে সে নিজের লক্ষ্যবিন্দুকেই হত্যা করতে চেয়েছিলো।

'ইথেলকে তখন মৃতের মতো দেখাচ্ছিলো। ওর সারা মুখ জুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘামের বিন্দু। কুয়েস্তাকে ও চিৎকার করে বললো, 'যথেষ্ট হয়েছে! খুব হয়েছে! জানোয়ার কোথাকার!' কুয়েস্তা ওর দিকে তাকালো ওর কথাটা সে শুনতে পেয়েছিলো। ওখানে ওরা দুজনেই এক রকম—এক ঝলকের মধ্যে ওরা শুনলো আর দেখলো। চাপা নাক আর হলদে চোখ নিয়ে মুখটা তুলে কুয়েস্তা তাকালো ওর দিকে। অনেকটা দূরে থাকলেও মনে হচ্ছিলো সে যেন বেশ কাছেই রয়েছে। ছোট্ট একটা বালকের মতো হাসছিলো সে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, সে ইথেলের দেহের মধ্যেকার সেই ছোট্ট জায়গাটার দিকে তাকাচ্ছে, যেখানে ইথেল নিজের সাহসটাকে রেখে দেয়। আর ইথেল চেষ্টা করছিলো কুয়েস্তার দৃষ্টিটাকে ওর নিজের কল্পনার দিকে আটকে রাখতে, ওর শরীরের নয় অন্তঃপুরের দিকে নয়। দুজনের কাছেই নিজের কাজটা শক্ত বলে মনে হচ্ছিলো। কুয়েস্তা যখন ইথেলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করছিলো, ইথেল নিজের কল্পনাকে তার সামনে এনে রাখছিলো—ঠিক যেমন করে খ্যাপা কুকুরের সামনে আশি এনে রাখা হয়। আবার ইথেল যখন কুয়েস্তাকে নিজের কল্পনার মধ্যে ধরার চেষ্টা করছিলো, কুয়েস্তা যেন গলে গিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো তখনই। তাই আসলে কেউই কাউকে ধরতে পারেনি।

'কিন্তু কুয়েস্তা আর একবারও ইথেলের দিকে না তাকিয়ে আরও দুটো ষাঁড়ের সঙ্গে খেললো, ষাঁড় দুটোকে হত্যা করলো। সবাই যখন কুয়েস্তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাচ্ছে, ইথেল ওখান থেকে চলে এলো—কুয়েস্তার দিকে তাকালোও না। আমাকেও কুয়েস্তার সম্পর্কে কিছুই বলেনি, আর কোনোদিন ষাঁড়ের লড়াইও দেখতে যায়নি।

'ক্লাভেলের বাড়িতে যখন কুয়েস্তার সঙ্গে আমার দেখা হলো, সেই আমাকে ইথেলের কথা জিজ্ঞেস করলো। নিজস্ব অমার্জিত হিস্পানি ভাষায় বললো: তা তোমার সেই অ্যামেরিকান মেয়েছেলেটার কি খবর?—আমি বললাম, ওর সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। ও নিউ-ইয়র্কে চলে যাচ্ছে। কুয়েস্তা বললো, আমি যেন ইথেলকে জিজ্ঞেস করি, ও যাবার আগে একবার এসে কুয়েস্তাকে বিদায় জানিয়ে যেতে চায় কি না। আমি বললাম: ইথেল কোনদিনও আমার কাছে তোমার নামটা উল্লেখ করেনি। তবে আমিই বা কেন ওর কাছে তোমার নামটা

ভুলবো ? জবাবে কুয়েন্তো আমার সঙ্গে একটা অশ্লীল রসিকতা করলো।

'সম্ভবত আমি কুয়েন্তোর কথা ভাবছিলাম বলেই সেদিন সন্ধ্যায় ইথেল আমাকে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কুয়েন্তোকে চেনো ?—আমি বললাম, চিনি। ও তখন জিজ্ঞেস করলো, তার সম্পর্কে আমার কি ধারণা ? আমি ওকে বললাম, আমার ধারণা আসলে সে মানুষ নয়—সে একটা বিস্ময়কর পশু। 'কিন্তু কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন পশু,' ইথেল বললো। আমি বললাম, 'আমি তা জানি না জানতে চাইওনি, জানার চেষ্টাও করিনি।' 'কেউই কি তার কাছ থেকে সাড়া পায়নি ?' ষাঁড়-লড়াইয়ের বাইরে তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ নেই। আমি কোনোদিনই আমার কল্পনা তার ওপরে চাপিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখবো না চিরদিনই জবাব দিতে প্রস্তুত ইথেল তখন বললো, 'কিন্তু ওর মধ্যে একটা বিস্ময়কর 'জিনিস' রয়েছে, তাই নয় কি ? যেটা একেবারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ?' আমি বললাম, হতে পারে ! কিন্তু বিস্ময়কর জিনিস তো র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের মধ্যেও রয়েছে : দুটো জিনিস—একটা তার মুখে, অন্যটা লেজে। তাই বলে আমি তো র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের কাছ থেকে সাড়া পেতে চেষ্টা করিনি ! ইথেল ঠিক খুশি হলো না। ও কষ্ট পাচ্ছিলো। বললাম, 'সে যাকগে, তুমি তো বেস্প তিবার চলে যাচ্ছো ?' ও বললো, 'না, আমি সেটা মুলতুবি রেখেছি।' 'কবে অব্দি ?' 'ঠিক নেই,' বললো ও।

'আমি বুঝতে পারছিলাম, ইথেল ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ষাঁড়ের-লড়াইতে যাবার পর থেকেই ও কষ্ট পাচ্ছিলো, কারণ কুয়েন্তোকে ও বশ করতে পারেনি। কুয়েন্তো যেন একটা মোটাসোটা হলদে-চোখের দৈত্য, যে ওর দিকে তাকিয়ে স্রেফ মুখ মুচকে হাসছে আর ওর সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। বলতে না চাইলেও শেষ অব্দি ও বললো, 'ওকে এখানে নিয়ে এসো না কেন ?'—'কিন্তু কেন ? ওকে এখানে এনে কি লাভ হবে ? তুমি কি একটা জঘন্য অপরাধী বা একটা হলদে-কাঁকড়া-বিছেকে এখানে আনবে ?'—'যদি আমি তার সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে আনবো।'— কিন্তু কুয়েন্তোর সম্পর্কে জানার আর কি আছে ? সে স্রেফ একটা জন্তু বিশেষ। মানুষের চাইতে ইতর প্রাণী।'— 'হয়তো সে একটা জন্তু, কিন্তু আমিও সোনালি চুলের একটা মেয়ে-জন্তু। সে যাই হোক, তুমি ওকে নিয়ে এসো'।

চিরদিন ও যেমনটি চেয়েছে, আমি তা-ই করেছি—যদিও নিজে কোনোদিনও তা করতে চাইনি। এবারেও তাই হলো। যেখানে কুয়েন্তো থাকবে বলে জানতাম, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, 'সেই সোনালি চুলের

মেয়েমানুষটা'র কি খবর ? সে কি চলে গেছে ?' বললাম, 'না। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'– কুয়েস্তা হলদে চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো। ওর দুচোখে প্রসন্ন দৃষ্টি, যা আসলে শুধু স্বপ্নহীন ঘৃণা। 'ও কি কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে ?'—না' আমি বললাম, 'আমরা তোমার কথা আলোচনা করছিলাম।' তখন ও বললো, 'ওই অদ্ভুত জন্তুটিকে নিয়ে এসো—দেখা যাক আসলে সে কেমন ?'—'সে ওর মাংস খাবার জন্ত—এই শর্মা.' নিজস্ব অমার্জিত ভঙ্গিতে বললো সে। তারপর এমন ভান করলো, যেন আসবে না কিন্তু আমি জানতাম, সে আসবে। তাই বললাম, আমি ওকে ডেকে নিয়ে যাবো।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের পরে আমরা ইথেলের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কুয়েস্তার পরনে একটা হালকা ফরাসী স্যুট। হত্যাকারীর বেশ। কিন্তু সে ফুল বা অন্য কিছু সঙ্গে নেয়নি। ইথেল বিচলিত আর বিমূঢ় হয়ে আমাদের ককটেল আর সিগারেট দিলো। অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলো ও, যদিও কুয়েস্তা একবর্ণও ফরাসী বোঝে না। একটি বৃদ্ধা অ্যামেরিকান মহিলাও ওখানে ছিলেন ইথেলের সহচরী হিসেবে।

'হাঁটু দুটো দুদিকে ছড়িয়ে, হাত দুটো উরুর ওপরে রেখে একজন ইণ্ডিয়ানের মতো কুর্সিতে বসে রইলো কুয়েস্তা। শুধু চুলগুলো কপালের ওপর থেকে টেনে নিয়ে গোড়ায় ফিতে দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে ওকে মেয়েমানুষ অথবা চীনে বলে মনে হচ্ছিলো। চাপা নাক আর খুদে খুদে হলদে চোখের জন্যে ওকে একটা চীনে মূর্তির মতো দেখাচ্ছিলো—মূর্তিটা দেবতা কিংবা দানবের যা ইচ্ছে হয় বলতে পারেন। স্রেফ বসে ছিলো মানুষটা, কিছুই বলছিলো না। ওর মুখের অভিব্যক্তিটা হাসিরও নয়, বিকৃতিরও নয়—কিছুই না। কিন্তু আমার কাছে তার অর্থ : অর্থহীন ঘৃণা।

'ইথেল কুয়েস্তাকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তার পেশাটাকে সে পছন্দ করে কিনা, কতোদিন ধরে সে এ কাজ করছে, এ কাজ করে সে কোনো প্রচণ্ড আনন্দ পায় কিনা—এবং ওই ধরনের নানান প্রশ্ন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে ওর কথাগুলো কুয়েস্তাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম আর বিহ্বলতায় লাল হয়ে উঠছিলো ইথেল। কুয়েস্তাও তেমনি সংক্ষেপে নিজের কর্কশ, নীরস গলায় আমাকে জবাব দিচ্ছিলো—যেন বুঝতে পারছিলো এগুলো সবই মিথ্যে ছলনামাত্র। কিন্তু সেই অদ্ভুত, দুবায়ত অথচ প্রচণ্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে সরাসরি ইথেলের দিকেই তাকিয়েছিলো। ওকে সে লক্ষ্য করছিলো না,

অথচ তাকিয়েছিলো ওর দিকেই। যেন ইথেল যা কিছু তার সামনে এগিয়ে রাখছে, তা সবই ওর নিজেকে জাহির করার কৌশল মাত্র আর কুয়েন্তা সে সব-কিছু ডিঙিয়ে তাকাচ্ছে ইথেলের ভেতরকার জলা আর জঙ্গলের দিকে, যেদিকে ইথেল নিজেও তাকায় না। দেখলে মনে হবে, ইথেলের পেছনে যেন একটা পাহাড় রয়েছে আর সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে কুয়েন্তা··আশা করছে একটা পাহাড়ি সিংহ এক লাফে গাছ থেকে পাহাড়ের উৎরাইয়ে নেমে আসবে, অথবা একটা সাপ বেলে পড়বে কোনো একটা ঝোপের ভেতর থেকে। কিন্তু আসলে ইথেল নিজেই সেই পাহাড়—পাহাড়ি সিংহ অথবা সাপ ওরই নিজস্ব পাশব সত্তা, যার দিকে শিকারীর মতো লক্ষ্য রাখছিলো কুয়েন্তা।

'আমরা বেশিক্ষণ ওখানে ছিলাম না। কিন্তু আসার আগে ইথেল কুয়েন্তাকে বললো, তার যখন ইচ্ছে হবে সে এখানে আসতে পারে। কুয়েন্তা সত্যিই বাড়িতে ডেকে আনার মতো মানুষ নয়—একথা ইথেল যেমন জানতো, কুয়েন্তাও জানতো। কিন্তু তবু সে ওকে ধন্যবাদ জানালো এবং আশা প্রকাশ করলো যে একদিন সে হয়তো ইথেলকে ওর নিজের বাড়িতেই অর্থাৎ কুয়েন্তার গুয়াদালুপ রোডের সামান্য বাড়িতে, যে বাড়ি সব কিছুই আসলে ইথেলের—অভ্যর্থনা জানাতে পারবে। ইথেল বললো, 'যাবো বই কি, একদিন নিশ্চয়ই যাবো। যেতে আমার ভালোই লাগবে।' কুয়েন্তা কথাটা বুঝতে পেরেছিলো। একটা ক্ষিপ্র অথচ ওত পেতে থাকা জন্তুর মতো মাথা নোয়ালো সে—কাঁকড়া বিছের মতো ক্ষিপ্র আর তার বিষের মতো নিশ্চুপ ওর ভঙ্গিমা।

'এরপর কুয়েন্তা প্রায়ই পাঁচটা নাগাদ ইথেলের বাড়িতে যেতো। কিন্তু কক্ষনো একা যেতো না, সর্বদা অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতো এবং কোনোদিনও কিছু বলতো না। সব সময়েই সে তেমনি সংক্ষেপে ইথেলের কথার জবাব দিতো এবং অন্য মানুষটার সঙ্গে কথা বলার সময় সর্বদা ইথেলের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কোনো সময়েই সে ইথেলের সঙ্গে কথা বলতো না—সব সময় নিজের নীরস অমার্জিত স্প্যানিতে তার দোভাষীর সঙ্গেই কথা বলতো। আর অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় সর্বক্ষণ শুধু ইথেলের দিকেই তাকিয়ে থাকতো।

'ইথেল সমস্ত সম্ভাব্য পথেই কুয়েন্তার কল্পনাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আদৌ সফল হয়নি। ও ইণ্ডিয়ান, অ্যাজটেক, মেক্সিকোর ইতিহাস, রাজনীতি দন পোরফিরিয়ো, ষাঁড়-লড়াইয়ের অঙ্গন, প্রেম, নারী, ইউরোপ, অ্যামেরিকা—সমস্ত বিষয় নিয়েই এচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সবই বৃথা। কোনো

বিষয়েই কুয়েন্তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আসলে ওর মানসিক কল্পনাশক্তিই নেই। কথা ওর কাছে শুধু আওয়াজ মাত্র। শুধু টাকা পয়সার প্রসঙ্গেই কুয়েন্তার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তুলেছিলো ইথেল। তখন সেই বিচিত্র আধো-হাসির অভিব্যক্তিটা তার মুখে গভীর হয়ে ফুটে উঠেছিলো এবং দোভাষীকে সে প্রশ্ন করেছিলো, নিগোরা প্রচণ্ড ধনী কিনা। জবাবে ইথেল বলেছিলো, ধনী বলতে কুয়েন্তা কি বোঝাতে চাইছে তা ও জানে না: কুয়েন্তা নিজেও নিশ্চয়ই ধনী। তখন দোভাষী বন্ধুটির কাছে কুয়েন্তা জানতে চেয়েছিলো, ইথেলের দশ লক্ষ অ্যামেরিকান ডলারের বেশি আছে কিনা। ইথেল বলেছিলো, হয়তো আছে তবে সে বিষয়ে ও নিশ্চিত নয়। তখন কুয়েন্তা এমন অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিলো যা অনেকটাই হুল ফোটাতে যাওয়া হলদে কাঁকড়া-বিছের মতো।

'পরে আমি কুয়েন্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন সে অমন একটা অমার্জিত প্রশ্ন তুললো। সে কি ইথেলকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার কথা চিন্তা করছিলো? —'বিয়ে · একটা ইয়েকে ' একটা অশ্লীল কথা ব্যবহার করে জবাব দিয়েছিলো কুয়েন্তা কিন্তু তার সত্যিকারের ইচ্ছেটা কি, তা আমি তখনও জানতাম না।

'ক্রমশ ইথেল চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলো। মনে হতো যেন কোনো কিছুতে ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। মনে হতো, ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কি হয়েছে তোমার?'—'আমি তোমাকে বলবো লুই' ও বলেছিলো, 'কিন্তু মনে রেখো, তুমি কাউকে কিছু বলবে না। কারণটা কুয়েন্তা! আমি জানি না, আমি তাকে চাই কিনা।'—'তুমি জানো না, সে তোমাকে চায় কিনা।'—'আমি যদি নিজেকে বুঝতে পারি, নিজের মনটাকে জানতে পারি, তাহলে আমি সে দিকটাও সামলাতে পারবো। কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে বুঝি না। আমার মনটা বলে: ও একটা ব্যায়াম-যন্ত্র ·· ওর মস্তিষ্ক নেই, কল্পনাশক্তি নেই কিছুই নেই। কিন্তু দেহটা বলে: ও এক পরম বিস্ময়, ওর এমন কিছু আছে যা আমার নেই, ও আমার চাইতে শক্তিমান ··ও মানুষ নয় ও দেবদূত অথবা শয়তান আর আমি ওকে পাবার পক্ষে নেহাতই একটা মানুষ মাত্র। ভাবতে ভাবতে মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাবো। তখন বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাই। আমার দেহটাকে নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারো? বলতে পারো, কি করবো আমি? দেহটাকে আমার বশে আনতে হবে। ওই মানুষটার চাইতে আমাকে বেশি ঐশ্বর্যবান

হতে হবে, ওকে ছাপিয়ে যেতে হবে—হবেই।' আমি বলেছিলাম: 'তাহলে আজ রাতেই নিউইয়র্কে যাবার ট্রেনটা ধরো, ওকে ভুলে যাও।'—'তা আমি পারবো না! সেটা হবে পাশ-কাটিয়ে যাওয়া। আমি আমার দেহের পাশ কাটিয়ে যাবো না। দেহটাকে আমার বশে আনতে হবে-আনতেই হবে।' —'তুমি আমার চাইতে দু-এক ধাপ এগিয়ে রয়েছো। কুয়েস্তাকে পেরিয়ে যাওয়াটাই যদি প্রশ্ন হয়, তবে কেন তুমি ট্রেনটা ধরবে না? তাহলে তো পনেরো দিনের মধ্যেই তুমি ওকে ভুলে যাবে।'—'আমার আশংকা, ও আমার চাইতে বেশি শক্তিমান,' ইথেল চিৎকার করে উঠেছিলো।—'তাতে কি হয়েছে? ও আমার চাইতে শক্তিমান, কিন্তু তাতে আমার ঘুম নোটা বন্ধ হচ্ছে না। একটা জাগুয়ারও আমার চাইতে বেশি শক্তিশালী, একটা অ্যানাকনডা* আমাকে গোটা গিলে ফেলতে পারে। আমি বলছি শোনো, এ সবই একটা দিনের খেলা। এক ধরনের প্রাণী আছে, যার নাম কুয়েস্তা। ব্যাস, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি?

'ইথেল আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝতে পারছিলাম, আমি ওর মনে কোনো ছাপই ফেলতে পারিনি। ও আমাকে অবজ্ঞা করছে। ও কোনো কিছুর একেবারে গভীরে চলে যেতে চাইছে। আমি ওকে বললাম, 'ইথেল, ঈশ্বরের দোহাই, কুয়েস্তাকে নিয়ে তোমার খেয়াল খুশিটা এবারে শেষ করে দাও। অভিনয় হিসেবেও এটা ভালো নয়।' হয়তো আমি মিউ-মিউ করেই কথাটা বলেছিলাম, কারণ ও আমার কথায় ভ্রূক্ষেপই করলো না।

'ইথেলের মধ্যে যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত করতে শুরু করেছিলো! কুয়েস্তাকে ও ভালোবাসতো না। অথচ ও ছিলো একটা অন্ধ ঘোরের মধ্যে, 'শীঘ্রি আমাকে মারো' গোছের অবস্থায়, এধারেও না ওধারেও না, উষ্ণ নয় শীতলও নয়, ইচ্ছুক নয় আবার অনিচ্ছুকও নয়—স্রেফ কাণ্ড-জ্ঞানহীন উন্মাদ। একটা বিশেষ দিক দিয়ে ও যেন কুয়েস্তাকে চাইতো। আবার এক সুনির্দিষ্ট দিক দিয়ে ও যেন তাকে চাইতো না। ও ছিলো এক ধরনের মৃগীরোগগ্রস্ত অবস্থায়, পায়ের ওপরে সমস্ত নিয়ন্ত্রণই ও খুইয়ে ফেলেছিলো। আমি ওকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। একবার সেখানে যেতে পারলে ও যথেষ্ট প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতো। কিন্তু আমি ওর ব্যাপারে মাথা গলাবার চেষ্টা করছি বুঝলে, ও হয়তো আমাকে খুনই করে ফেলতো। হ্যাঁ, ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলো না এটা নিশ্চিত।

* বিশাল সামুদ্রিক সাপ বিশেষ।

'ইথেল বলেছিলো, 'আমার দেহটা যদি আমার কল্পনার চাইতে বেশি শক্তিমান হয়ে ওঠে, তবে আমি নিজেকে খুন করে ফেলবো।' আমি বলেছিলাম, 'ছাখো ইথেল, যারা নিজেরা নিজেদের খুন করে ফেলার কথা বলে, তারা একটা আঙুল কাটলেই ডাক্তারকে ডেকে পাঠায়। তোমার দেহ আর কল্পনার মধ্যে কিসের বিবাদ? ওরা কি একই জিনিস নয়?' 'না!' ও বলেছিলো, 'কল্পনা দেহকে নিয়ন্ত্রণ করলে, তুমি যে কোনো কাজ করতে পারো— দৈহিক দিক দিয়ে তুমি কি করছো না করছো, তখন তাতে আর কিছুই এসে-যায় না। আমার দেহটা আমার কল্পনার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলে, আমি কুয়েন্তোকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারতাম এবং তখন সেটা একটা কল্পনামূলক কাজ হতো। কিন্তু আমার দেহটা যদি আমার কল্পনাকে বাদ দিয়ে কাজ করে, আমি আমি নিজেকে খুন করে ফেলবো।'—কিন্তু তোমার দেহ তোমার কল্পনাকে বাদ দিয়ে কাজ করছে বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? তুমি শিশু নও। তুমি দুবার বিয়ে করেছো। এর অর্থটা কি, তা তুমি জানো। এমন কি তোমার দুটো বাচ্চাও আছে। অন্তত কয়েকটি প্রেমিকও তোমার নিশ্চয়ই আছে। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও আমার ধারণা, এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে অন্যান্য যে সমস্ত মেয়েরা কুয়েন্তোর প্রেমে পড়েছে, তুমি একেবারেই তাদের মতো। তুমি যদি ওর প্রেমে পড়ে থাকো, তা সে বাস্তবকে মেনে নেওয়া এবং ব্যাপারটার মাথায় যথেষ্ট গোলাপ সাজানো ছাড়া তোমার কল্পনার আর কিছুই করার নেই।' ইথেল শান্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। মনে হলো যেন বিষয়টা ও বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর বললো, কিন্তু আমার কল্পনা ওর প্রেমে পড়েনি। কল্পনাপ্রবণভাবে ও আমার সঙ্গে মিলিত হবে না। ও একটা পশু। একবার আমি শুরু করলে, কোথায় এর শেষ হবে? আমার ভয় হচ্ছে, আমার দেহটা এখন পতিত। ওর প্রেমে পড়েনি, কিন্তু ওর জন্যেই পতিত হয়েছে। এটা একটা নিতান্তই শোচনীয় অবস্থা। আমি যদি শরীরটাকে ফের পায়ের ওপরে দাঁড় করাতে না পারি যদি ওকে ভুলতে অথবা আমার সঙ্গে ওকে নিয়ে এটাকে একটা কল্পনামূলক কাজ করে তুলতে না পারি— তবে তবে আমি নিজেকেই শেষ করে ফেলবো।'—'কল্পনা-মূলক আর কল্পনাবিহীন কাজ বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো, আমি জানি না। কাজ তো সব সময় একই থাকে।'—'তা নয়।' আমার ওপরে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলো ইথেল। 'কাজটাকে হয় কল্পনামূলক হতে হবে, নয়তো তা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।' আমি আমার হাত দুটোকে দুধারে ছড়িয়ে

ছিলাম। কি আর বলবো বা করবো ? কোনো মহিলার সঙ্গে মিলে একত্রে একটা কল্পনামূলক কাজ করতে হলে আমার ঘেন্না লাগতো। চুলোয় যাক ওসব— কাজটা হয় বাস্তব, নয়তো থাক সেটা পড়ে। কিন্তু এবারে বুঝতে পারলাম, কেন আমি কোনোদিনও ওকে স্পর্শ করিনি বা একটিবারও চুমু খাইনি। এর কারণ : আমি ওর কল্পনাপ্রবণতার তর্জন-গর্জন সহ্য করতে পারতাম না। পুরুষ-মানুষের কাছে সেটা মৃত্যু।

'কুয়েস্তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন তুমি ইথেলের কাছে যাও ? কেন তুমি ওর কাছ থেকে সরে থাকছো না, ওকে অ্যামেরিকায় ফিরে যেতে দিচ্ছো না ? তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছো ?' যথারীতি অনীস ভাষায় কুয়েস্তা বলেছিলো, 'আমি একটা কাট্‌ল্* মাছের প্রেমে পড়েছি কিনা ? যার সমস্তটাই শুধু হাত আর চোখ—পা বা লেজ বলতে কিছু নেই ; ওই সোনালি চুলের মেয়েমানুষটা একটা কাট্‌ল্ মাছ। ও একটা অক্টোপাস—শুধু হাত আর চোখ আর ঠোঁট আর একদলা জেলি।'—'তাহলে ওকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছো না কেন ?'—'আচার দিয়ে রান্না করলে কাট্‌ল্ মাছও খেতে ভালো লাগে।' আমি বলেছিলাম, 'তুমি বরঞ্চ ওকে ছেড়ে দিলেই অনেক বেশি ভালো করতে।' জবাবে কুয়েস্তা বলেছিলো, 'মান্যবর সিনোর, তুমি নিজেই বরং ওকে ছেড়ে দাও।' আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এ প্রসঙ্গে আমার আর না এগুনোই ভালো।

'একদিন সন্ধ্যায় আমার উপস্থিতিতে ইথেল স্প্যানিশ ভাষায় কুয়েস্তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কক্ষনো একা একা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন না কেন ? সব সময় কেন অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ? আপনি কি ভয় পান ?' কুয়েস্তা ওর দিকে তাকিয়ে যথারীতি নীরস, অর্থহীন স্বরে জবাব দিলো, 'অন্য কাউকে নিয়ে আসি তার কারণ স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আমি কথা বলতে পারি না।'— কিন্তু আমরা তো একজন অন্যজনকে বুঝতে পারি,' প্রচণ্ড রাগে ধৈর্য হারিয়ে গর্জে উঠলো ইথেল। কুয়েস্তা কিন্তু এতোটুকুও উত্তেজিত না হয়ে বললো, 'কে জানে।'

'পরে কুয়েস্তা আমাকে বলেছিলো, 'কি চায় মেয়েটা ? একটা তেতে লাল হয়ে ওঠা লোহার মতোই ও আমাকে ঘেন্না করে। ও একটা সাদা শয়তান, খ্রীষ্টের শেষ সান্ধ্যভোজের মুচমুচে বিস্কুটের মতোই পবিত্র।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাহলে তুমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছো না কেন ?'—'ও যে প্রচণ্ড ধনী,' কুয়েস্তা মৃদু হেসেছিলো, 'গোটা পৃথিবীটা রয়েছে ওর হাজার বাহুর

* এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী, যারা দেহ থেকে কালো রঙের তরল পদার্থ বের করতে পারে।

মধ্যে। ও ঈশ্বরের মতো ধনী। ও এতো ধনী, এতো ফর্সা ওর গায়ের চামড়া আর এতো শুভ্র ওর আত্মা যে শ্রেষ্ঠ দেবদূতেরাও ওর কাছে ম্লান হয়ে যায়।' তা সত্ত্বেও তুমি কেন ওকে ছাড়ছো না?'—কুয়েন্তা আমার এ কথার কোনো জবাব দেয়নি।

'তারপর থেকে সে অবিশ্যি রোজই ইথেলের সঙ্গে দেখা করতে যেতো, কিন্তু সর্বদাই যেতো সন্ধ্যার প্রথম দিকে। আর কোনোদিনই আধ ঘণ্টার বেশি থাকতো না। কুয়েন্তার গাড়িটা সর্বত্রই সুপরিচিত ছিলো। ধূসর রঙের ফরাসী স্যুট, চকচকে বাদামি জুতো আর টুপিটা মাথার একটু পেছন ঘেঁষে পরা অবস্থায় কুয়েন্তা ইথেলের বাড়ি থেকে না বেরুনো অব্দি গাড়িটা বাইরেই অপেক্ষা করতো।

'ওরা কি আলোচনা করতো, জানি না। কিন্তু ইথেল ক্রমশ আরও বিক্ষিপ্ত আর নিবিষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হতো ও সারাক্ষণ শুধু একটা বিষয় নিয়েই ভেবে মরছে। আমি ওকে বলেছি, 'কেন তুমি কুয়েন্তাকে অতো গভীরভাবে নিচ্ছো? ডজন ডজন মেয়ে ওর সঙ্গে শুয়েছে এবং তারা কেউই সেটাকে নিয়ে আর কিছু ভাবেনি। তবে তুমি কেন ওকে গভীরভাবে নেবে?'—'তা নয়,' ও বলেছে, 'আমি নিজেকে গভীরভাবে নিই—সেটাই আসল কথা।'—'তবে সেটাই আসল কথা হোক। তুমি নিজেকেই গভীরভাবে নিতে থাকো আর ওর প্রশ্নটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু আমার জ্ঞানদাতার ভূমিকাটা ওকে ক্লান্ত করে তুলেছিলো। আর আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম ওর নিজেকে গভীরভাবে নেওয়ার ব্যাপারটাতে। নিজেকে ও এতো গভীরভাবে নিয়েছিলো যে আমার মনে হতো, কুয়েন্তাকে নিয়ে খেলতে যাওয়ায় ও উচিত ফলই পাবে। অবিশ্যি কুয়েন্তাকে ও আদৌ ভালোবাসতো না—ও শুধু দেখতে চেয়েছিলো কুয়েন্তার মনে ও কোনো ছাপ ফেলতে পারে কিনা, নিজের ইচ্ছের কাছে কুয়েন্তাকে বশ করাতে পারে কিনা। কিন্তু যেটুকু ছাপ ও ফেলতে পেরেছিলো তাতে কুয়েন্তা ওকে স্কুইড*, অক্টোপাস এবং ওই ধরনের অন্যান্য সুন্দর নামই শুধু দিতো। আর আমি দেখতে পেতাম, ওদের প্রেম আদৌ সামনের দিকে এগুচ্ছে না।

'কুয়েন্তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি কি ওকে নিয়ে শুয়েছো?' কুয়েন্তা জবাব দিয়েছে, 'ওই জেপিলোটটাকে আমি ছুঁয়েও দেখিনি। ওর ফর্সা নগ্ন ঘাড়টাকে দেখে আমার ঘেন্না হয়।'

* শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। বঁড়শিতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

'কিন্তু তবু সে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতো: সর্বদাই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে সূর্যাস্তের আগে। ইথেল আমার সঙ্গে কুয়েন্তাকেও ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কুয়েন্তা বলেছে, সে কোনোদিনও ডিনারে বা ডিনারের পরে যেতে পারবে না—কারণ সে প্রতিদিনই রাত আটটার পর থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। ইথেল তখন এমনভাবে কুয়েন্তার দিকে তাকিয়েছে যেন বলতে চেয়েছে—ও জানে কথাগুলো মিথ্যে এড়িয়ে যাবার একটা কৌশল। কিন্তু কুয়েন্তা তাতে এক চুলও নড়েনি। ইথেলের ভাষায়, কুয়েন্তা একেবারে কল্পনাশক্তিবিহীন একটা অদ্ভুত জন্তু।

"তা আপনি একদিন গুয়াদালুপ রোডে আপনার ছোট্ট বাড়িটাতে আসুন,' কুয়েন্তা নিজের বাড়ির কথা এভাবেই বলেছে। এবং প্রস্তাব দেবার ভঙ্গিতে বেশ কয়েকবার ই কথাটা বলেছে সে।

"কিন্তু আপনি তো সন্ধ্যার পরে রোজই ব্যস্ত থাকেন,' ইথেল বলেছে।

"তাহলে রাত্রিবেলা আসুন—এগারোটার সময় -তখন আমি ফাঁকা থাকি,' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চরম জান্তব ধৃষ্টতায় জবাব দিয়েছে কুয়েন্তা।

"অতো রাতেও আপনি দেখা করেন?' রাগে, অপমানে আর একগুঁয়েমিতে ইথেল রাঙা হয়ে উঠেছে।

"কখনো সখনো, একেবারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।'

'সামান্য কয়েকদিন বাদে ইথেলের সঙ্গে যথারীতি দেখা করতে গিয়ে শুনলাম, ও অসুস্থ, কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। পরের দিনও ওর দেখা পাওয়া গেলো না। ওর স্নায়ুতন্ত্র ভয়ংকর ভাবে ভেঙে পড়েছিলো। তৃতীয় দিনে এক বন্ধু টেলিফোন করে জানালো, ইথেল মারা গেছে।

'ব্যাপারটাকে চেপে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু একটু জানা গিয়েছিলো যে ও নিজেই নিজেকে বিষপ্রয়োগ করেছিলো। আমার জন্যে ও একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলো। তাতে শুধু লেখা ছিলো: তোমাকে যা বলেছিলাম, তা-ই হলো। বিদায়। তবে আমার ইচ্ছাপত্রটা বলবৎ রইলো।'

'ইচ্ছাপত্রে ইথেল ওর সম্পত্তির অর্ধেকটা কুয়েন্তাকে দিয়ে গিয়েছিলো। ওর মৃত্যুর দশদিন আগেই তৈরি হয়েছিলো ইচ্ছাপত্রটা, এবং সেটাকেই বলবৎ রাখায় অনুমতি দেওয়া হয়। কুয়েন্তা টাকাটা নিয়ে যায়—'

বোলমেনাবেসের কণ্ঠস্বর নিঃশব্দে বিলীন হয়ে গেলো।

বললাম, 'তার মানে, শেষ অব্দি দেহ ওর কল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো।'

'ব্যাপারটা তার চাইতেও খারাপ।'

'কি রকম?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কোলমেনারেস বললো, 'সেদিন রাত্রে ভোলাদোর বাজার পেরিয়ে ইথেল সত্যি সত্যিই কুয়েস্তার বাড়িতে গিয়েছিলো। আগে থেকে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্তটা ঠিক করেই গিয়েছিলো ও। এবং সেখানে, শোবার ঘরে, কুয়েস্তা তার ষাঁড়-লড়াইয়ের আধ ডজন ইয়ার-দোস্তের হাতে ইথেলকে তুলে দিয়েছিলো। কুয়েস্তার হুকুম ছিলো যাতে ওর গায়ে কালশিরা না পড়ে। তবু তদন্তের সময় ওর শরীরে কয়েকটা গভীর কালশিরা ধরা পড়েছিলো এবং চিকিৎসকেরা তাঁদের প্রতিবেদনে এর উল্লেখ করেছিলেন। তখনই আপাতভাবে কুয়েস্তার বাড়িতে ওর যাবার ব্যাপারটায় আলোকপাত হয়। কিন্তু তার বিশদ বিবরণ কোনোদিনই জানা যায়নি। তারপর ফের একটা বিপ্লব হলো এবং তার কলোরোলে এ ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলো। তবে ঘটনাটা খুবই আবছা। ইথেল নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে কুয়েস্তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিলো।

'কিন্তু কুয়েস্তা যে ওকে ওভাবে অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলো, তা আপনি কি করে জানলেন?'

'ওদের মধ্যেই একজন আমাকে বলেছিলো। পরে সে গুলি খেয়ে মারা যায়।'

* None of that.

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে এক মাইল পথ বাঁচে। সাইমন যান্ত্রিক ভাবেই কামারশালার পাশ দিয়ে গিয়ে ক্ষেতের বেড়াটা তুলে ধরলো। কর্মকার আর তার সঙ্গীটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনধিকার-প্রবেশকারীটিকে লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু আলাপ-সালাপ করার পক্ষে সাইমনের চেহারাটা বড্ড বেশি ভদ্রজনোচিত। ওরা তাকে নিঃশব্দেই ছোট ক্ষেতটা পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে দিলো।

আজকের এই সকালটার সঙ্গে ছয় বা আট বছর আগেকার বসন্তের সেই উজ্জ্বল সকালগুলোর সামান্যতমও প্রভেদ নেই। সাদা আর বালি-রঙা সোনালি বনমুরগীগুলো এখনও আগের মতো দরজাটার চারদিকে মাটি আঁচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পালক আর আঁচড়ানো মাটি দিয়ে নোংরা করে রাখছে চতুর্দিক। বেতা-ঝোপের মধ্যে, হলিগাছের দুটো ঘন ঝোপের মাঝখানে, একটা গোপন পথ। জঙ্গলের দিকে যেতে হলে ওই বেড়ার আড়ালটা ডিঙিয়ে যেতে হয়। দরজায় আগের মতোই খিল তোলা। সাইমন যেন চিরন্তনীতে ফিরে এসেছে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছিলো তার। একটা অশান্ত আত্মার মতো সে নিজের অতীতের দেশে ফিরে এসে দেখছে, দেশটা অপরিবর্তিত অবস্থায় তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। হ্যাজেল ফুলগুলো এখনও নিচের দিকে নিজেদের ছোটো-ছোটো খুশিয়াল হাতগুলোকে মেলে রেখেছে, সবুজের বৈভব ভার ঝোপের ছায়ায় রু বেলগুলো এখনও সংখ্যায় স্বল্প আর নিস্তেজ।

জঙ্গলের ভেতরকার রাস্তাটা একটা ঢালের ঠিক মুখোমুখি এসে বেশ কিছুটা সময় এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। চতুর্দিকে ডালপালা ছড়ানো ওক গাছগুলো সবেমাত্র নিজেদের সোনারঙ ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছে। পায়ের তলায় ঘাস ফুলের বুটি—মাঝে মাঝে দু-একটা ডগ-মাকারি আর হাইয়াসিনথের গুচ্ছ। দুটো গাছ পথের ওপরে আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে। এক ছুটে একটা শক্ত ঢাল পেরিয়ে, ফের একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালো সাইমন। জায়গাটা যেন জঙ্গলের মাঝখানে উত্তরমুখো একটা বিশাল জানলা। ওখানে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে পাহাড়ের মাথায় সমভূমি অঞ্চলটার দিকে তাকালো সে। ওখানকার গ্রামটা যেন ওই জায়গাটাতে আলগাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—যেন কলকারখানার

কোনো চলমান গাড়ি থেকে ওখানে ছিটকে পড়েছিলো গ্রামটা, এখনও পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত হয়ে। গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা ধূসর-রঙা আধুনিক গির্জা। লাল রঙের বসত বাড়িগুলো গড়ে উঠেছে পরিকল্পনাবিহীন। পেছন দিকে খনি-অঞ্চলের অস্পষ্ট ঝিকমিকে আলো। সব কিছুই একেবারে নগ্ন, খোলামেলা, কোথাও একটা গাছ নেই। সবকিছু যেমনটি ছিলো, ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে।

পাহাড়ের উতরাই বরাবর জঙ্গলের দিকে যাবার রাস্তাটা ধরে এগুবার জন্যে খুশি মনে মুখ ফেরালো সাইমন। এক আশ্চর্য উদ্দীপনা অনুভব করছিলো সে। মনে হচ্ছিলো সে যেন এক চিরস্থায়ী কল্পনার দৃশ্যে ফিরে এসেছে। সহসা সে চমকে উঠলো। একজন বনরক্ষক কয়েক গজ সামনেই তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এ রাস্তা দিয়ে আপনি কোথায় চলেছেন, মশাই?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা। তার প্রশ্নের স্বরে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ। খুঁটিয়ে দেখার ভঙ্গিতে নির্বিকার দৃষ্টি মেলে মানুষটার দিকে তাকালো সাইমন। মানুষটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক যুবক, সুগঠিত আরক্তিম শরীর। গাঢ় নীল চোখ দুটো এখন আগ্রাসী ভঙ্গিমায় অনধিকার প্রবেশকারীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা নরম ঠোঁটের ওপরে কালো গোঁফজোড়া বেশ মোটা, আর ছোটো করে ছাঁটা। অন্য সব দিক দিয়েই মানুষটার চেহারা পুরুষালী আর সুদর্শন। মাথায় মাঝারি উচ্চতার একটু ওপরে। ঝর্ণার তীব্র স্রোত যেমন নিজে থেকেই সুষম, তেমনি মানুষটার সামনের দিকে ঠেলে ওঠা বুকের বলিষ্ঠ প্রকাশ আর আত্মপ্রত্যয়ী ঋজু শরীরটার নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য দেখে মনে হয়, সে জান্তব জীবনের সঙ্গে কষে বাঁধা। বন্দুকের কুঁদোটা মাটিতে রেখে অনিশ্চিত আর জিজ্ঞাসু ভঙ্গিমায় সাইমনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। অনধিকার-প্রবেশকারীর গাঢ় অশান্ত চোখ দুটো তার পদমর্যাদার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকায় বনরক্ষক বিব্রত এবং রক্তিম হয়ে উঠলো।

'নেলোর কোথায়? তুমি কি তার কাজটা পেয়েছো নাকি?' সাইমন প্রশ্ন করলো।

'আপনি তো এ বাড়ির লোক নন, তাই না?' বনরক্ষক জানতে চাইলো। অবশ্যই তা হতে পারে না, কারণ সবাই এখন বাইরে।

'না, আমি বাড়ির লোক নই,' মনে হলো সাইমন যেন মজা পেয়েছে।

'তাহলে জিগেস করতে পারি কি, আপনি কোথায় চলেছেন?' বিরক্ত হয়ে উঠলো মানুষটা।

'কোথায় চলেছি ?' সাইমন বললো, 'উইলি-ওয়াটার খামারে।'

'এটা তার রাস্তা নয়।'

'আমার কিন্তু তাই ধারণা। এই রাস্তা ধরে কুয়োর পাশ দিয়ে, সাদা ফটকটা পেরিয়ে যেতে হয়।'

'কিন্তু সেটা সকলকার ব্যবহারের রাস্তা নয়।'

'তা হয়তো নয়। তবে নেলোবের সময় কতোবার যে এখান দিয়ে গেছি, তা আর মনে নেই। ভালো কথা, সে কোথায় ?'

'বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে রয়েছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলো মানুষটা।

'তাই নাকি ?' সাইমন আর্তনাদ করে উঠলো।

'তা, আপনি কে ?' নতুন সুরে প্রশ্ন করলো বনরক্ষক।

'আমি জন অ্যাডার্লি সাইমন, কডি লেনে থাকতাম।'

'আপনার সঙ্গেই হিলডা মিলারশিপের বিয়ের কথা চলছিলো ?'

বিধুর হাসি নিয়ে চোখ খুললো সাইমন। ঘাড় নেড়ে সায় জানালো। দুজনের মাঝখানে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

'আর তুমি - তুমি কে ?' প্রশ্ন করলো সাইমন।

'আমি আর্থার পিলবিম—নেলোব আমার কাকা।'

'তুমি এখানে, এই নুটালে থাকো ?'

'আমি কাকার বাড়িতে মানে নেলোবের সঙ্গেই থাকি।'

'ও !'

'আপনি উইলি-ওয়াটারে যাচ্ছেন বললেন না ?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে বনরক্ষক হঠাৎ বোকার মতো বলে বসে, 'হিলডা মিলারশিপের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে।'

অনধিকার-প্রবেশকারীর দিকে অদম্য বিরোধিতা নিয়ে তাকায় যুবক। দৃষ্টিটা প্রায় মর্মান্তিক। সাইমন নতুন চোখ মেলে তাকায়।

'তাই বুঝি ?' অবাক হয়ে ওঠে সে।

যুবকের রঙ লজ্জায় আরক্তিম, 'ও আর আমি—দুজন দুজনকে সঙ্গ দিই।'

'আমি জানতাম না !'

অন্য মানুষটা অস্বস্তিভরে অপেক্ষায় থাকে।

'ব্যাপারটা কি তাহলে ঠিকঠাক হয়ে গেছে ?' জিজ্ঞেস করে সাইমন।

'কি ভাবে ঠিকঠাক হবে ?' যুবকের কণ্ঠে বিষাদের সুর।

'মানে, তুমি কি শীগগিরি ওকে বিয়ে করছো ?'

কয়েকটি অক্ষম মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থাকে যুবক। তারপর একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলে, 'বোধ হয়।'

'ও!' যুবকের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি মেলে রাখে সাইমন। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'আমি নিজে বিবাহিত।'

'তাই নাকি?' অবিশ্বাসের স্বরে মুখর হয়ে ওঠে বনরক্ষক।

'গত পনেরো মাস হলো,' সুখহীনতায় নিজস্ব দীপ্ত ভঙ্গিতে হাসলো সাইমন।

বনরক্ষক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে সাইমনের দিকে তাকিয়ে রইলো। আপাতদৃষ্টিতে সে পেছনের কথাগুলো ভেবে নিচ্ছিলো, বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলো সমস্ত বিষয়টাকে।

'কেন, তুমি জানতে না?' সাইমন প্রশ্ন করলো।

'না, জানতাম না,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলো অন্য মানুষটা।

'ঠিক আছে, আমি তাহলে চলি!' মুহূর্তের নীরবতার পর সাইমন বললো, 'আশা করি আমি যেতে পারি?'

নিশ্চুপ বিবোধিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনরক্ষক। পাহাড়ের একেবারে প্রান্তে সতেজ ব্লু বেলের ছোটোছোটো গুচ্ছে ঘেরা ছোট্ট একফালি খোলামেলা ঘাস-জমিতে দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে থাকে দুটি মানুষ। অবশেষে অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় সামান্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সাইমন।

'ইস, কি সুন্দর!' চিৎকার করে ওঠে সে।

নিচের ঢালটার সম্পূর্ণ দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিলো সাইমন। প্রশস্ত পথটা তার পায়ের তলা দিয়ে যেন একটা নদীর মতো ছুটে গেছে। পথের মাঝ বরাবর বনরক্ষকের যাতায়াতের আঁকাবাঁকা সবুজ সুতোটাকে বাদ দিলে, সমস্ত পথটা ব্লু বেলে ভরা। নদীর মতোই পথটার দুধারে হালকা নীল রঙের চড়া, সেখানে ব্লু বেলের দীঘি। নীল দীঘির ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বরফ জলের ক্ষীণ ধারার মতো সবুজ সুতোটা চলে গেছে সেখান দিয়েও।

'কি সুন্দর, না?' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সাইমন। এই তার অতীত। এই তার দেশ, যা সে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। দেশটা এতো সুন্দর দেখে এখন ব্যথা পায় সে। মাথার ওপরে বনকপোতের গুঞ্জন, বাতাস ভরা পাখির গানের উজ্জ্বলতা।

'আপনি তো বিবাহিত তাহলে ওকে চিঠি লেখেন কেন?' বনরক্ষক প্রশ্ন করে,

'কেনই বা ওকে কবিতার বই আর অন্যান্য জিনিস পাঠান?'

সাইসন বিমূঢ় হয়ে মানুষটার দিকে তাকায়। তারপর হাসতে শুরু করে, 'আমি তোমার কথা জানতাম না।'

বনরক্ষক লাল হয়ে ওঠে, 'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন '

'আমি বিবাহিত,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দেয় সাইসন। তারপর সুন্দর নীল পথটার দিকে চোখ নামিয়ে নিজের অবমাননা অনুভব করে। 'হিলডার কাছে এভাবে ঝুলে থাকার কি অধিকার আছে আমার?' নিজের প্রতি এক রাশ ঘৃণা নিয়ে ভাবলো সে। বললো, 'ও-ও জানে, আমি বিবাহিত।'

'কিন্তু তবু আপনি ওকে বই পাঠিয়ে যাচ্ছেন।'

নিশ্চুপ সাইসন খানিকটা করুণাভরে, পরিহাসের দৃষ্টিতে, অন্য মানুষটার দিকে তাকালো। তারপর মুখ ঘুরিয়ে 'চলি', বলে চলতে শুরু করলো।

এখন সমস্ত কিছুই সাইসনের কাছে বিরক্তিকর। দুটো আলো ফুল—একটা সম্পূর্ণ সোনালি, সুগন্ধেভরা অন্যটা রুপোলি-সবুজ, রোমময়—দেখে তার মনে পড়লো, এখানেই সে হিলডাকে পরাগ-সংযোগের বিষয়টা শিখিয়েছিলো। কি বোকা ছিলো সে। সমস্ত ব্যাপারটাই কি সাংঘাতিক বোকামো!

'মনে হচ্ছে হতভাগা আমার ওপরে প্রচণ্ড রাগ পুষে রেখেছে। আমি ওর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো,' ভীষণ খারাপ মেজাজেও নিজের মনে মুখ টিপে হাসলো সাইসন।

অরণ্যের প্রান্ত থেকে খামারটার দূরত্ব শখানেক গজেরও কম। সারি সারি গাছের দেয়াল যেন খোলামেলা চতুর্ভুজ জমিটার চতুর্থ বাহু। আবেগভরা মন নিয়ে সাইসন লক্ষ্য করলো, কুলগাছের ফুলগুলো অজস্রধারায় রঙীন প্রিমরোজগুলোর ওপরে ঝরে ঝরে পড়ছে। সাইসনই প্রিমরোজগুলোকে এখানে এনে লাগিয়েছিলো। এখন কতো বেড়ে উঠেছে ওরা! কুলগাছগুলোর তলায় এখন টুকটুকে লাল গোলাপি আর হালকা গোলাপি প্রিমরোজের পুরু আস্তরণ!

সাইসন লক্ষ্য করলো, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে কে যেন তার দিকে এক ঝলক তাকালো। একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।

আচমকা খুলে গেলো দরজাটা। কতো বড়োসড়ো··· একেবারে মহিলা হয়ে উঠেছে হিলডা। সাইসন অনুভব করলো সে ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে।

'তুমি?··· অ্যাডি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো হিলডা। তারপর দাঁড়িয়ে রইলো স্থাণু হয়ে।

'কে ? কৃষকের কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো। নিচু পুরুষ কণ্ঠে কারা যেন তার জবাব দিলো। ওই অদ্ভুত, প্রায় বিদ্রূপাত্মক নিচু কণ্ঠস্বরগুলো আগন্তুকের পীড়িত সত্তাটাকে জাগিয়ে তুললো। ঝলমলে হাসি নিয়ে হিলডার তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলো সে।

'হ্যাঁ, আমি—কেন, আসতে নেই ?'

হিলডার গাল আর গলা ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলে উঠে গাঢ় লাল হয়ে যায়।

'আমরা সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া শেষ করছিলাম,' বললো ও।

'তাহলে আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।' সাইমন এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন সে দরজার কাছে ড্যাফোডিল ফুলগুলোর মাঝখানে রাখা পানীয় জলের সানমাটির জালাটায় গিয়ে বসবে।

'না না, ভেতরে এসো' হিলডা দ্রুত বললো। ওকে অনুসরণ করলো সাইমন। দোরগোড়ায় এসে সে চট করে পরিবারটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করলো। প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত। কৃষক, তাঁর স্ত্রী আর তাদের চার ছেলে অমার্জিতভাবে সাজানো খাওয়ার টেবিলে বসে রয়েছে। পুরুষদের জামার হাতা কনুই অব্দি গোটানো।

'দুঃখিত, আমি লাঞ্চের সময় এসে পড়েছি,' সাইমন বললো।

'কি খবর, অ্যাডি।' পুরনো ভঙ্গিমায় কৃষক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ওঁর কথার সুর প্রাণহীন শীতল। 'কেমন আছো ?'

সাইমনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন উনি।

'এক গরাস খেয়ে নেবে নাকি ?' প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যাত হবে জেনেও আগন্তুক যুবককে আমন্ত্রণ জানালেন ভদ্রলোক। উনি অনুমান করে নিয়েছিলেন, এমন অমার্জিতভাবে খাওয়ার পক্ষে সাইমন অনেক বেশি সুসংস্কৃত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের আরোপিত অভিযোগে মুখ কোঁচকালো যুবক।

'তুমি ডিনারে কিছু খেয়েছো ?' ভদ্রলোকের মেয়েটি জানতে চাইলো।

'না, ডিনারের পক্ষে সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি।' সাইমন বললো, 'আমি দেড়টার সময় ফিরে যাবো।'

'তোমরা এটাকে লাঞ্চ বলো, তাই না ?' প্রায় ব্যঙ্গের স্বরে বড়ো ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো। এক সময় সে এই যুবকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো।

'আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমরা অ্যাডিকে কিছু খেতে দেবো,' ছেলের দোষ-স্খালনের অক্ষম প্রচেষ্টায় মা বললেন।

'না না, আপনি বিব্রত হবেন না,' সাইমন বললো। 'আমি আপনাদের

কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

'তুমি শুধু তাজা বাতাস আর প্রাকৃতিক দৃশ্য খেয়েই বেঁচে থাকতে পাবো,' উনিশ বছর বয়সী সব চাইতে ছোটো ছেলেটি হেসে উঠলো।

বাড়ির চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পেছন দিকের বেড়া-দেওয়া ফলের বাগানটাতে গিয়ে ঢুকলো সাইসন। পুরো বেড়া-ঝোপটা জুড়ে অসংখ্য ড্যাফোডিল দাঁড়ে বসে ডানা-ঝাপটানো অশান্ত হলুদ পাখির মতো দোল খাচ্ছে। এ জায়গাটাকে ভীষণ ভালোবাসতো সাইসন। দূরে সারি সারি পাহাড়ের মালা—ভালুকের চামড়ার মতো গাঢ় অরণ্য তাদের রাক্ষুসে কাঁধগুলোকে ঢেকে রেখেছে, ছোটোছোটো লালরঙা খামারগুলো যেন তাদের পোশাক আটকে রাখার ব্রোচ। উপত্যকায় নীল জল-রেখা, নগ্ন চারণভূমি আর অসংখ্য পাখির গান—যার বেশির ভাগটা অশ্রুতই থেকে যায়। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সাইসন যখনই নিজের মুখে সূর্যালোকের উপস্থিতি অনুভব করবে অথবা শীতের পরবে দেখতে পাবে ছোটোছোটো মুঠি ভরা তুষার কিংবা ঘ্রাণ পাবে আগত বসন্তের—তখনই স্বপ্ন দেখবে এই জায়গাটাকে।

হিলডা ভারি মেয়েলি। ওর উপস্থিতিতে সাইসন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। সাইসনের মতো ওর বয়েসও উনিশ। কিন্তু সাইসনের মনে হয়, ও যেন তার চাইতে অনেক বেশি বড়ো। ওর পাশে নিজেকে কেমন যেন বোকাটে, প্রায় অস্বাভাবিক বলে মনে হয় তার। আঙুল দিয়ে একটা নিচু ঝোপ থেকে কুল-গাছের খসে পড়া ফুলগুলো টেনে ফেলে দিচ্ছিলো সাইসন, ঠিক তখনই টেবিল-ঢাকাটাকে ঝেড়ে নেবার জন্যে হিলডা সিঁড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। বন-মুরগীগুলো ছুটে পালালো খড়ের গাদা রান্নার উঠোনটা থেকে, গাছগাছালি থেকে ডানার ঝটপটানি তুললো পাখিগুলো। হিলডার কালো চুল মাথার ওপরে মুকুটের মতো খোঁপা করে বাঁধা। প্রচণ্ড ঋজু শরীর, দেখে মনে হয় যেন কতো দূরে রয়েছে। টেবিল-ঢাকাটা ভাঁজ করতে করতে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি মেলে দিলো ও।

তক্ষুণি বাড়ির ভেতরে ফিরে গেলো সাইসন। হিলডা ডিম আর ছানার পনির, গুজবেরি আর ক্রিমের স্টু তৈরি করেছিলো। বললো, 'তুমি আজ রাত্তিরে খাবে বলে এখন হালকা খাবার দিয়েছি।'

'ভারি সুন্দর,' সাইসন বললো। 'তুমি দেখছি সত্যিকারের গ্রামীণ সৌন্দর্য বজায় রাখছো—আমি তোমার আইভির কুঁড়ি বসানো খড়ের কোমর-বন্ধটার কথা বলছি।'

এখনও ওরা একে অন্যকে আঘাত দেয়।

হিলডার কাছে অস্বস্তি অনুভব করে সাইসন। ওর সংক্ষিপ্ত প্রত্যয়ী জবাব, দূরাগত ভঙ্গিমা সবই সাইসনের কাছে অপরিচিত। ফের ওর ধূসর-কালো ভ্রূলেখা আর অক্ষিপক্ষ্মগুলোর প্রশংসা করে সে। ওদের দৃষ্টি মিলিত হয়। সাইসন দেখতে পায়, ওর অপরূপ ঐসব কালো চোখের দৃষ্টিতে অশ্রু আর এক আশ্চর্য আলো— এবং সেসব কিছুর পেছনে রয়েছে নিজের সম্পর্কে শান্ত স্বীকৃতি আর তার বিরুদ্ধে জয়ের দীপ্তি।

সাইসন অনুভব করে, সে আনন্দে উঠছে। সচেষ্ট প্রয়াসে নিজের নিস্পৃহতার ভঙ্গিমাটা বজায় রাখে সে।

সাইসনকে বৈঠকখানা-ঘরে পাঠিয়ে থালাগুলোকে ধুয়ে নেয় হিলডা। মঠের নিলাম থেকে কেনা আসবাবপত্রে নিচু লম্বা ঘরখানাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। বহু বছরের পুরানো কুর্সিগুলোর গদিতে শিরা-জাগানো লাল রেশমি কাপড়ের ছাউনি। পালিশ-করা আখরোট কাঠের একটা ডিম্বাকৃতি টেবিল। আর একটা পিয়ানো—সুন্দর, কিন্তু সুপ্রাচীন কালের। সব কিছু অচেনা হলেও খুশি হয় সাইসন। দেয়ালের কোণে বসানো একটা উঁচু আলমারি খুলে সে দেখতে পায়, আলমারিটা তারই বইতে বোঝা —তার পুরনো পড়ার বই আর হিলডাকে সে যে সমস্ত ইংরেজী আর জার্মান কবিতার বই পাঠিয়েছিলো, সবগুলো। সাদা জানলাগুলোর তলা থেকে ড্যাফোডিলগুলো ঘরের এধারেও দীপ্তি ছড়াচ্ছে। ওদের রঙিন রশ্মি লাগে যেন প্রায় অনুভব করতে পারে সাইসন। দেয়ালে ঝোলানো প্রথম জীবনে আঁকা জলরঙের ছবিটা দেখে এখন আর তার হাসি আসে না। মনে পড়ে বারো বছর আগে কতো না উষ্ণ অনুভূতি নিয়ে সে হিলডাকে আঁকতে চেষ্টা করেছিলো।

একটা গামলা মুছতে মুছতে হিলডা ঘরে এসে ঢোকে। ওর উজ্জ্বল পোশাকের হাতে শুভ্র বাহু দুটির সৌন্দর্য ফের লক্ষ্য করে সাইসন।

'বেশ সুন্দর লাগছে এখানটা,' বললো সে। আবার ওদের দৃষ্টি মিলিত হলো।

'তোমার ভালো লাগছে?' অন্তরঙ্গতার সেই পুরনো ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলো হিলডা। সাইসন অনুভব করলো, তার বক্ষে একটা দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। অনুভূতিটা পুরনো, সুদূর স্বপ্নের দিকে ছুটে চলার, ক্ষীণ হতে হতে নিজেকে বিলীন করে দেবার—যেন মুক্ত করে দিতে হবে আপন সত্তাটাকে।

'হুঁ-উঁ,' ফের একটা বালকের মতো ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো সাইসন।

হিলডা অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নোয়ালো।

'এটা হচ্ছে কাউন্টেসের কুর্সি,' হিলডা নিচু গলায় বললো। 'আমি এটার গদির ফাঁকে একটা কাঁচি পেয়েছি।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

দ্রুত এক চঞ্চল ভঙ্গিমায় হিলডা ওর সেলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে এলে দুজনে মিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো প্রাচীন লম্বা কাঁচিটাকে।

'মৃতা মহিলাদের কি একখানা গাথাসঙ্গীত!' কাঁচির গোলাকার অংশ দুটোতে আঙুল ঢুকিয়ে হেসে উঠলো সাইমন।

আমি জানি তুমি ওগুলোকে ব্যবহার করতে পার,' হিলডা প্রত্যয়ের স্বরে বললো। সাইমন নিজের আঙুল এবং তারপর কাঁচিটার দিকে তাকালো। হিলডা বলতে চেয়েছে কাঁচিটার ছোট ছোট গোলাকার অংশ দুটোতে ঢোকাবার পক্ষে তার আঙুলগুলো যথেষ্ট সরু।

'এটা আমার সম্পর্কে বলার মত একটা কথাই বটে,' হেসে উঠে কাঁচিটাকে এক পাশে নামিয়ে রাখলো সাইমন। হিলডা জানলার দিকে মুখ ফেরালো। ওর গালের সুগোল বিভঙ্গ, ওপরের ঠোট, নেটল্ ফুলের স্তবকের মতো নরম শুভ্র গ্রীবা আর সদ্য খোলস ছাড়ানো শাসের মতো উজ্জ্বল পুরো পা দুটিকে লক্ষ্য করলো সাইমন। এক নতুন দৃষ্টিতে ওকে দেখছিলো সে। তার চোখে হিলডা এখন অন্য এক মানুষ। ওকে সে চেনে না। কিন্তু ওর উদ্দেশ্যটাকে এখন সে দেখতে পাচ্ছে

'আমরা কি একটু বেরুবো?' জিজ্ঞেস করলো হিলডা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো সাইমন। কিন্তু যে প্রখর আবেগ তার মনে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, যে তার অন্তরের বিহ্বলতা এবং উত্তেজনাকে বিড়ম্বিত করে তুলেছে—তার নাম আতংক। যা সে দেখছে, আতংক তাতেই। হিলডার ভাবভঙ্গি আগের মতোই, এখনও ওর কণ্ঠস্বরে মাঝেমধ্যেই সেই আগেকার সুর —অথচ সাইমন হিলডাকে যেমনটি চিনতো, ও আর তেমনটি নেই। তার চেনা হিলডাকে সে ভালোভাবেই জানতো। কিন্তু এখন সে ক্রমশ বুঝতে পারছিলো. হিলডা সম্পূর্ণ আলাদা এবং চিরদিন ও এমনিই ছিলো।

হিলডা মাথায় কোনো আবরণ টানলো না। শুধু সজ্জাবরণীটি খুলে ফেলে বললো, 'আমরা লার্চ্ গাছগুলোর কাছ থেকে ঘুরে আসবো।' ফলের বাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে সাইমনকে ডেকে ও একটা আপেল গাছে ব্লু-টিট পাখির বাসা দেখালো, একটা ঝোপে দেখালো সাইককের নীড়। ওর নিশ্চয়তা আর নম্রতার আড়ালে লুকনো ঔদ্ধত্যের মতো এক ধরনের কঠোরতার

বিস্মিত হলো সাইসন।

'আপেলের কুঁড়িগুলোকে ছাখো,' হিলডার কথা শুনে নুয়ে পড়া গাছগুলোতে লক্ষ-কোটি টুকটুকে লাল ফল লক্ষ্য করলো সাইসন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হিলডার চোখ দুটি কঠোর হয়ে উঠলো। ও দেখতে পাচ্ছিলো, সাইসনের আঁশ খসে পড়ছে। এবারে সত্যিকারের হিলডাকে দেখতে পাবে সে। অতীতে এই জিনিসটাকেই হিলডা সব চাইতে বেশি ভয় পেতো, অথচ নিজের আত্মার জন্যে ওর কাছে এটার প্রয়োজনই ছিলো সব চাইতে বেশি। ও যেমনটি, এবারে ওকে ঠিক তেমনটি করে দেখবে সাইসন। ওকে সে আর ভালোবাসবে না এবং বুঝতে পারবে কোনোদিনই ওকে সে ভালোবাসেনি। পুরনো মোহ-বিভ্রান্তি বিদায় নিয়েছে—এখন ও অপরিচিত, অবিজ্ঞস্ত আর অখণ্ড। কিন্তু সাইসন ওকে ওর প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে—সাইসনের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য বুঝে পাবে ও।

হিলডার এখনো উড-এল-টিক্লগুলোকে সাইসন চেনে না। একটা নিচু ঝোপে ও সাইসনকে জেনি-রেনের বাসা দেখালো।

'এই জিপ্টিটার বাসা ছাখো!' হিলডার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস।

ওর মুখে চলতি নামগুলো শুনে অবাক হলো সাইসন। কাঁটা এড়িয়ে সাবধানে পাখিটার বাসায় হাত গলিয়ে দিলো হিলডা।

'পাঁচটা! কি ছোট্ট!'

সাইসনকে ও রবিন, লিনিট আর বান্টিং পাখি দেখালো। খালের কাছে দেখালো একটা খঞ্জনা পাখি।

'হ্রদটার কাছাকাছি নেমে গেলে আমি তোমাকে মাছরাঙা দেখাবো।' হিলডা বললো, 'ছোট্টো ছোট্টো ফার গাছের মধ্যে থ্রস্‌ল্ পাখির বাসা। আর প্রায় প্রতিটা ঝোপঝাড়, প্রতিটা পাহাড়ী খাঁজেই থাকে ব্ল্যাকিগুলো। প্রথম দিন পাখিগুলোকে দেখে আমার মনে হয়েছিলো, জঙ্গলের ভেতরে যাওয়া উচিত নয়। ওটা যেন পাখিদের শহর। ভোরবেলা ওদের ডাকাডাকি শুনে সকাল বেলাকার গোলমালে ভরা বাজারের কথা মনে হয়। নিজের জঙ্গলে ঢুকতে আমার নিজেরই ভয় করে।'

হিলডা যে ভাষা ব্যবহার করছে, তা ওদের দুজনার আবিষ্কার। কিন্তু এখন এ ভাষা শুধু ওর। সাইসনের নিশ্চুপতায় ও আপত্তি জানায় না, নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে ওর জঙ্গল দেখায়। বিল আর জলায় ভরা একটা পথ, যে পথে অসংখ্য ফরগেট-মি-নট নিজেদের নীল ঐশ্বর্য মেলে ধরেছে, সে পথে এসে

হিলডা বলে, 'আমরা সব পাখিদের চিনি। কিন্তু এমন অনেক ফুল আছে, যা আমরা খুঁজে বের করতে পারি না।' সব জিনিসের নাম শিখে নেওয়া সাইসনের কাছে এ কথার আবেদন অর্ধেক মাত্র।

রোদ্দুরে ঘুমিয়ে থাকা খোলা প্রান্তরের দিকে হিলডা স্বপ্নিল চোখে তাকায়। তারপর আশ্বাসের ভঙ্গিমায়, অথচ যেন প্রায় রূঢ়তার স্বরে নেমে এসে বলে, 'জানো, আমার একটি প্রেমিকও আছে।'

কথাটা সাইসনের মনে ওর বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পৃহাটাকে জাগিয়ে তোলে।

'মনে হয় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সুন্দর দেখতে, একেবারে স্বপ্নজগতের বাসিন্দা।'

কোনো জবাব না দিয়ে অন্ধকার পথটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় হিলডা। পথটা উৎরাই-এর দিকে চলে গেছে, ওখানে গাছ আর আগাছার ঘন জঙ্গল।

'প্রাচীন যুগে ওঁরা বিভিন্ন দেবতার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বেদীর বন্দোবস্ত করে ভালোই করেছিলেন।'

'হ্যাঁ,' একমত হয় সাইসন। 'তা এই নতুন বেদীটা কার জন্যে?'

'পুরনো কোনো বেদী আর নেই। আমি চিরদিন এটাকেই খুঁজেছি।'

'এটি কার?'

'জানি না', সাইসনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় হিলডা।

'তুমি তৃপ্তি পেয়েছো বলে আমি ভীষণ খুশি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মানুষটা কে তাতে কিন্তু খুব একটা কিছু এসে যায় না।'

'যায় না?' বিস্মিত হয়ে ওঠে সাইসন। কিন্তু হিলডার প্রকৃত স্বরূপটাকে সে চিনতে পারে।

'নিজের সত্তাটাই আসল,' হিলডা বলে। 'কেউ তার নিজের সত্তাটার সঙ্গে অভিন্ন কিনা, সে তার নিজের ঈশ্বরকে সেবা করছে কিনা—সেটাই আসল কথা।'

দুজনেই চুপচাপ। নিজের মনে চিন্তা করে সাইসন। এ পথটা প্রায় পুষ্পবিহীন, আবছা অন্ধকারে ভরা। পথের পাশে পা ফেলতেই সাইসনের গোড়ালি দুটো নরম কাদায় ডুবে গেলো।

'আমি', ভীষণ ধীরে ধীরে হিলডা বললো, 'তোমার বিয়ের রাতেই আমার বিয়ে হয়েছে।'

সাইসন ওর দিকে তাকালো।

'অবিশ্যি আইনসম্মত বিয়ে নয়, কিন্তু সত্যিকারের বিয়ে।'

'মালির সঙ্গে ?' আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে সাইসন জিজ্ঞেস করলো।

সাইসনের দিকে ঘুরে তাকালো হিলডা।

'তুমি কি ভেবেছিলে আমি তা পারবো না ?' হিলডার গাল আর গলা গাঢ় লাল হয়ে উঠলো।

সাইসন তবুও কিছু বললো না।

'শোনো, আমারও বুঝে নেবার প্রয়োজন ছিলো।' হিলডা বিষয়টা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো।

'তা এই 'বোঝাবুঝি'র মূল্য কতোটা ?'

'অনেকখানি। তোমার কাছেও কি তা নয় ? সবাই তো স্বাধীন।'

'তুমি কি হতাশ হওনি ?'

'মোটেই না।' গাঢ় আর ঐকান্তিক ওর কণ্ঠস্বর।

'তুমি ওকে ভালোবাসো ?'

'হ্যাঁ, বাসি।'

'ভালো।'

সাইসনের কথাটা কিছুক্ষণের জন্যে নীরব করে রাখলো হিলডাকে। তারপর ও বললো, 'এখানে, ওর জিনিসপত্রের মাঝখানে, আমি ওকে ভালোবাসি।'

'তার মানে ওকে ভালোবাসার জন্যে এই পটভূমিটার প্রয়োজন আছে ?' সাইসন জিজ্ঞেস করলো।

'আছে !' হিলডা চিৎকার করে উঠলো, 'আমি যা নই, তুমি চিরদিনই আমাকে তা-ই করে তুলেছো।'

'কিন্তু এটা কি পারিপার্শ্বিকতার প্রশ্ন ?'

'আমি একটা গাছের মতো', হিলডা জবাব দিলো। 'আমি শুধু নিজের মাটিতেই বেড়ে উঠতে পারি।'

আগাছাবিহীন একটা নগ্ন ধূসর জায়গায় এসে হাজির হলো ওরা। চারদিকে পাইনের মেটে আর লালচে রঙের গুঁড়ি। মাথার ওপরে প্রবীণ গাছগুলোর বিষণ্ণ সবুজ ঝালর, তাদের কুঁড়িতে অপুষ্ট ফুল। নিচে ফার্ণের উজ্জ্বল খোলা পতাকা। নগ্ন জমিটার মাঝখানে বনরক্ষকের লম্বা কুটির। চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়ানো পাখির খাঁচা। কতকগুলো খাঁচা চিৎকৃত মুরগীরা দখল করে রেখেছে, কতকগুলো শূন্য।

পাইনের বাদামি পাতা মাড়িয়ে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলো হিলডা। তারপর ছাদের প্রলম্বিত অংশটা থেকে একটা চাবি খুঁজে নিয়ে দরজা খুললো।

শূন্য একটা কাঠের ঘর। ভেতরে শুধু একটা ছুতোরের বেঞ্চি আর যন্ত্রপাতি। একখানা কুঠার, পাখি ধরার ফাঁদ, জাল, ঝুলিয়ে রাখা কয়েকটা চামড়া—সমস্ত কিছুই গোছানো। দরজাটা বন্ধ করে দিলো হিলডা। সাইসন সাফস্বফো করার জন্যে ঝুলিয়ে রাখা বুনো জন্তুর চামড়াগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। হিলডা পাশের দেয়ালে একটা হাতল ঘুরিয়ে দিতেই দ্বিতীয় একটা ছোট্ট ঘর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'কি রোম্যান্টিক।' সাইসন বললো।

'হ্যাঁ। মানুষটা ভারি অদ্ভুত। ওর মধ্যে খানিকটা বন্য প্রাণীর চতুরতা আছে—মানে, আমি ভালোর দিক থেকে বলছি। ওর উদ্ভাবনী-শক্তি আছে, ও চিন্তাশীল—কিন্তু একটা বিশেষ সীমানার ওধারে ও যেতে পারে না।'

গাঢ় সবুজ রঙের একটা পর্দা টেনে দিলো হিলডা। ঘরটার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বুনো লতা-পাতা দিয়ে তৈরি বিশাল একটা কৌচ, তার ওপরে অসংখ্য খরগোশের চামড়া। মেঝে এবং দেয়ালেও অগুন্তি লোমশ চামড়া। হিলডা একটা চামড়া পেড়ে, চাদরের মতো গায়ে জড়ালো। চামড়াটা সাদা খরগোশের। মাথার টুপিটা বোধহয় বেজির চামড়া দিয়ে তৈরি। বর্বরদের মতো ওই পোশাকে শরীর আড়াল করে হিলডা সাইসনের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'কি মনে হচ্ছে?'

'তোমার মানুষটার জন্যে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,' জবাব দিলো সাইসন।

'ও দিকটাতে দ্যাখো।'

তাকের ওপরে একটা ছোট্ট বয়মে হাসনাহেনার কয়েকটা কচি পল্লব।

'রাত্রিবেলা ওরা এ জায়গাটাকে সৌরভে ভরিয়ে তুলবে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে ফিরে তাকালো সাইসন, 'তাহলে মানুষটা এমন হঠাৎ করে কোত্থেকে এলো?'

কয়েক মুহূর্ত সাইসনের দিকে তাকিয়ে রইলো হিলডা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'আকাশের তারাগুলোকে তুমি ঝলসাতে পারো, কাঁপাতে পারো। ফরগেট-মি-নটগুলো আমার কাছে নীলকান্তমণির মতো দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। আমি দেখেছি, যে কোনো জিনিসকেই তুমি অপরূপ করে তুলতে পারো। হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। কিন্তু এখন এর সমস্ত কিছুকেই আমি আপন করে পেয়েছি।'

'শত হলেও আকাশের তারা আর ফরগেট-মি-নট—শুধু বিলাসিতা মাত্র,' সাইমন হাসলো। 'তোমার কবিতা তৈরি করা উচিত।'

'হ্যাঁ,' হিলডা সায় দিলো। 'কিন্তু এখন আমি সব কিছুকেই নিজের করে পেয়েছি।'

হিলডার দিকে তাকিয়ে ফের তিক্ত হাসি ছড়ালো সাইমন।

হিলডা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। সাইমন ছোট্ট বেঢপ ঘরটার ছোট্ট জানলাটাতে হেলান দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো হিলডাকে লক্ষ্য করছিলো। হিলডার গায়ে তখনও সেই অদ্ভুত চাদর। সাইমন টুপিটা খুলে রেখেছিলো বলে আবছা ঘরের মধ্যেও তার মুখ আর মাথাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো হিলডা। সাইমনের কালো, সোজা চকচকে চুলগুলো ভ্রূর ওপর থেকে পেছন দিকে ঠেলে আঁচড়ানো। তার কালো চোখ দুটো লক্ষ্য করছিলো হিলডাকে। অস্থিরভাবে জ্বলে উঠছিলো তার নিষ্কলঙ্ক ফর্সা নিখুঁত মসৃণ মুখখানা।

'আমরা একেবারে আলাদা,' তিক্ত সুরে হিলডা বললো।

'দেখতে পাচ্ছি আমাকে তোমার পছন্দ নয়', সাইমন ফের হাসলো।

'তুমি যেমনটি হয়েছো, সেটা আমার অপছন্দ।'

'তুমি কি মনে করো, আমরা—আমি আর তুমি—এমনি ভাবে থাকতে পারতাম?' কুটিরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সাইমন।

'তুমি! না, কখনো না!' হিলডা মাথা নাড়লো। তুমি একটা জিনিস তুলে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকো। তারপর সেটার সম্পর্কে যা কিছু জানতে চাও তা জানা হয়ে গেলেই সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

'আমি কি তা করেছি?' সাইমন জানতে চাইলো। 'তোমার পথ কি কোনোদিনও আমার পথ হতে পারতো না? হয়তো না।'

'কেন তা হবে।' হিলডা বললো, 'আমি একটা আলাদা অস্তিত্ব।'

'কিন্তু কখনও কখনও দুটো মানুষ তো নিশ্চয়ই একই পথে চলে!'

'তুমি আমার সত্তা থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে।'

সাইমন বুঝতে পারে, হিলডাকে সে ভুল বুঝেছিলো। হিলডাকে সে যেমনটি ভেবে নিয়েছিলো, হিলডা তা নয়। এটা তারই দোষ, হিলডার নয়।

'তুমি কি চিরদিনই তা জানতে?' প্রশ্ন করলো সাইমন।

'না, তুমি কোনোদিনও আমাকে তা জানতে দাওনি। তুমি আমাকে নির্মমভাবে পীড়ন করেছো। আমি নিজেকে বাঁচাতে পারিনি। তুমি যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তখন আমি সত্যিই খুশি হয়েছিলাম।'

'আমি তা জানি,' সাইসনের মুখ পাংশুল হয়ে ওঠে। 'কিন্তু আমি যে পথে গিয়েছি, সে পথে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো।'

'আমি!' হিলডার কণ্ঠস্বরে অহমিকার উচ্ছ্বাস।

'তোমার জন্যেই আমি গ্রামার স্কুলের জলপানিটা নিয়েছিলাম। আমার প্রতি বেচারা বোটেলের নিবিড় আকর্ষণকে আমি তোমার জন্যেই বেড়ে উঠতে দিয়েছি, যাতে আমাকে ছেড়ে সে বাঁচতে না পারে। এর কারণ হচ্ছে, বোটেল ধনী এবং প্রভাবশালী। মদের ব্যবসায়ীটা আমাকে কেমব্রিজে পাঠাবার প্রস্তাব দিয়েছিলো, যাতে আমি তার নাবালক সন্তানটির বন্ধু হই—সেখানেও তোমার জয়। তুমি চেয়েছিলে, এ দুনিয়ায় আমি বড়ো হয়ে উঠবো। তাই বারবার তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো। আমার প্রতিটা সফলতা আমাদের মাঝখানে একটা করে বিভেদের আড়াল এনে দিয়েছে এবং আমার চাইতে তোমার পক্ষে সে আড়াল আরও বেশি। তুমি কোনোদিনও আমার সঙ্গে আসতে চাওনি। কেমন লাগে দেখার জন্যে তুমি শুধু আমাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছো। আমার বিশ্বাস, তুমি চেয়েছিলে আমি কোনো মহিলাকে বিয়ে করি। আমার মধ্যে দিয়ে তুমি সমাজটাকে জয় করতে চেয়েছিলে।'

'এবং সে জন্যে আমিই দায়ী,' হিলডা ব্যঙ্গের সুরে বলে।

'তোমাকে খুশি করতে আমি নিজেকে একজন বিশিষ্ট মানুষ করে গড়ে তুলেছি।'

'ওহ্!' হিলডা চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি চিরদিনই একটা শিশুর মতো শুধু পরিবর্তন চাইতে—পরিবর্তন আর পরিবর্তন!'

'খুব ভালো কথা! আজ আমি একটা সফল মানুষ এবং আমি তা জানি। কিন্তু···আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্য রকম। একটা পুরুষমানুষের প্রতি কি অধিকার আছে তোমার?'

'কি বলতে চাও তুমি?' হিলডা বিস্ফারিত ভয়ার্ত চোখে সাইসনের দিকে তাকায়।

সাইসনও দু চোখে অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণতা নিয়ে ফিরে তাকায় ওর দিকে।

'কিছু না,' ছোট্ট করে হাসে সাইসন।

বাইরের ছিটকিনিতে শব্দ তুলে বনরক্ষক ঘরে এসে ঢোকে। মেয়েটি ফিরে তাকায়, কিন্তু লোমের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ভেতরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। সাইসনও নড়ে না।

অন্য মানুষটা ঘরে এসে ঢোকে, ছাখে—কিন্তু কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অন্য দুজনও নিশ্চুপ।

পিলবিম ঘরে-ঝোলানো চামড়াগুলোর দেখাশুনো করতে থাকে।

'আমি যাবো,' সাইসন বলে।

'হ্যাঁ,' জবাব দেয় হিলডা।

'তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই : আমাদের অসীম এবং বিরোধী ভাগ্যের উদ্দেশ্যে,' অঙ্গিকারের ভঙ্গিতে একটা হাত ওপরের দিকে তুলে ধরে সাইসন।

'আমাদের অসীম এবং বিরোধী ভাগ্যের উদ্দেশ্যে,' গম্ভীর এবং ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় হিলডা।

বনরক্ষক কিছু না শোনার ভান করে। তাকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকা সাইসন হাসতে শুরু করে। মেয়েটি নিজেকে গুছিয়ে নেয়।

'আর্থার।' হিলডার আশ্চর্য উঁচু কণ্ঠস্বর পুরুষ দুজনকে বুঝিয়ে দেয়, ওর সত্তা এক ভয়ংকর সংকটে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বনরক্ষক আস্তে আস্তে হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে ওর কাছে এগিয়ে যায়।

'বলো।'

'আমি তোমাদের আলাপ করিয়ে দিতে চাইছিলাম,' ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'ওঁর সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছে।'

'হয়েছে বুঝি? উনি অ্যাডি, মিঃ সাইসন—যাঁর কথা তুমি জানো।' হিলডা ঘুরে দাঁড়ায় সাইসনের দিকে, 'এ হচ্ছে আর্থার, মিঃ পিলবিম।' শেষের জন হাত বাড়িয়ে দেয় বনরক্ষকের দিকে, নিঃশব্দে পরস্পরের হাতে ঝাঁকুনি দেয় দুজনে।

'পরিচয় করে খুশি হলাম।' সাইসন প্রশ্ন করে, 'আমরা কি তাহলে চিঠি-পত্র বন্ধ করে দেবো, হিলডা?'

'তার কোনো প্রয়োজন আছে কি?'

দুটি পুরুষ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কোনো প্রয়োজন নেই?'

হিলডা তবুও নিশ্চুপ।

'তোমার যেমন খুশি,' জবাব দেয় ও।

আবছা অন্ধকারে ঘেরা পথ ধরে ওরা তিনজনেই এগিয়ে চলে।

কি বলছে বুঝতে না পেরে একটা ফরাসী কবিতার চরণ আবৃত্তি করে সাইসন।

'কি বলছো তুমি ?' হিলডা বলে, 'আমরা আমাদের যৌবনসুলভ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে পথ চলতে পারি না—কোনাদিনও তা করিনি।'

সাইসন ওর দিকে তাকায়। তার তরুণ প্রেমিকা, তার সন্ন্যাসিনী, বত্তিচেল্লির* আঁকা দেবদূতের এমন প্রকাশ দেখে চমকে ওঠে সে। আসলে সে নিজেই বোকা হয়েছে। যে কোনো দুটি অপরিচিত মানুষের চাইতে তার এবং হিলডার মধ্যে বিভেদ অনেক বেশি। হিলডা শুধু চিঠিপত্রেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। আর সে-ও অবিশ্যি তা চায়, যাতে সে ওকে লিখতে পারে—যেমন দান্তে লিখতেন কোনো এক বিয়েত্রিসকে, দান্তের মস্তিষ্ক ছাড়া যার কোনোদিনও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।

পথের প্রান্তে এসে হিলডা বিদায় নেয়। বনরক্ষকের সঙ্গে জঙ্গলের ফটকের দিকে এগিয়ে যায় সাইসন, এগিয়ে যায় খোলা প্রান্তরের দিকে। যেন দুই বন্ধুর মতোই হেঁটে চলে দুজনে। কেউই নিজের মনের ভাবনা মুখে প্রকাশ করে না।

সরাসরি বড়ো রাস্তার ফটকের দিকে না গিয়ে, সাইসন অরণ্যের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলে। নদীটা এখানে এসে একটা ছোট্ট জলাশয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যালডার গাছগুলোর নিচে বেণুবনের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো হলুদ-গাঁদার ঐশ্বর্য। ফুলগুলোর সোনা রঙের ছোঁয়া নিয়ে সুতোর মতো বয়ে চলেছে বাদামি জলধারা। একটা মাছরাঙা উড়ে যেতেই আচমকা নীলের ঝিলিক লাগে বাতাসে বাতাসে।

এক নিবিড় আবেগে সাইসনের মন ভরে ওঠে। নদীর তীর থেকে গ্যরস গাছের ঝোপগুলোর দিকে উঠে যায় সে। ঝোপের ফুলগুলোতে এখনও আগুনে রঙ ধরেনি। শুকনো হয়ে যাওয়া বাদামি রঙের তৃণশয্যায় শুয়ে সে ছোটো ছোটো রক্তিম মিল্কওয়ার্ট আর লাউজওয়ার্টের গোলাপি বিন্দুর আকুল বসন্ত আবিষ্কার করে। কি আশ্চর্য এই পৃথিবী—অপরূপ, চিরনূতন। সাইসনের মনে হয়, এটা যেন পাতাল—অথচ বৈচিত্র্যহীন নরকের প্রান্তরের মতো। বুকের মধ্যে যেন এক তীব্র আঘাতের যন্ত্রণা। উইলিয়াম মরিসের সেই কবিতাটা মনে পড়ে তার, যেখানে এক নাইট বুকের গভীরে বিঁধে থাকা একটা বর্শা নিয়ে লিয়োনিজের গির্জায় মৃতের মতো পড়ে রয়েছেন, অথচ মরছেন না দিনের পর দিন গির্জার রঙিন কাচের জানলা দিয়ে সূর্যের রঙিন আলো এসে ছুঁইয়ে

* সান্দ্রো বত্তিচেল্লি (১৪৪৫—১৫১০)—ইতালিয় চিত্রকর। বিখ্যাত ছবি 'ভেনাসের জন্ম'।

পড়ছে আবার সরে যাচ্ছে। সাইসন জানে, তার আর হিলডার মধ্যে যা ছিলো তা কোনোদিনও সত্য ছিলো না—মুহূর্তের জন্যেও না। সত্য চিরদিনই দূরে দূরে সরে ছিলো।

সাইসন মুখ ফেরালো। বাতাস ভরা ভরত পাখির গান। যেন অনেক ওপরে সূর্যরশ্মিগুলো জমে উঠে বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। সেই উজ্জ্বল শব্দধারার মধ্যে দুটো দূরায়ত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সাইসন।

'কিন্তু মানুষটা যদি বিবাহিত হয়ে থাকে এবং সে যদি একেবারে স্বেচ্ছায় এ ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে চায়, তাহলে তা না মানার কি যুক্তি থাকতে পারে?' পুরুষ কণ্ঠস্বরটা প্রশ্ন করলো।

'আমি ওই নিয়ে এখন কিছু বলতে চাই না। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'ঝোপের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সাইসন দেখলো, হিলডা অরণ্যের মধ্যে ফটকটার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষটা মাঠের মধ্যে ঝোপগুলোর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সাদা ব্রাম্বল ফুলগুলোর ওপরে মৌমাছিরা এসে বসতেই তাদের উড়িয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ। তার মধ্যেই সাইসন হিলডার বাসনাটা কল্পনা করে নিলো। হঠাৎ বনরক্ষক একটা আর্ত চিৎকার করে মুখখিস্তি করে উঠলো। নিজের কাঁধের কাছে কোটের হাতাটা চেপে ধরলো মানুষটা। তারপর কোটটা টান মেরে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, একমনে জামার কাঁধ অব্দি গুটিয়ে নিলো।

'পেয়েছি!' মানুষটার গলায় প্রতিহিংসার স্বর। একটা মৌমাছিকে হাত থেকে টেনে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেললো সে। তারপর সুন্দর সুগৌর বাহুটা বাঁকিয়ে, কোনো রকমে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো হিলডা।

'একটা মৌমাছি...আমার হাতার ভেতর দিয়ে বেয়ে উঠেছিলো।'

'এখানে, আমার কাছে এসো।'

বিষণ্ন বালকের মতো বনরক্ষক ওর কাছে এগিয়ে গেলো। মানুষটার হাত নিজের হাতে তুলে নিলো হিলডা।

'এই যে—হুলটা ভেতরে ঢুকে রয়েছে। বেচারা মৌমাছি!'

হুলটা টেনে বের করে হিলডা মানুষটার বাহুতে নিজের মুখ রেখে বিষের বিন্দুটাকে চুষে বের করে দিলো। তারপর মানুষটার বাহু এবং সেখানে ফুটে

ওঠা নিজের ঠোঁটের লাল দাগটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এর চাইতে বেশি রক্তিম চুমু তুমি আজ অব্দি কোনোদিনও পাওনি।'

পরের বার সাইসন যখন কণ্ঠস্বর দুটির দিকে তাকালো, আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলো, বনরক্ষকের ঠোঁট তার প্রেয়সীর গলায়। মেয়েটির মাথা পেছন দিকে হেলানো, এলিয়ে পড়েছে ওর চুলগুলো—যেন গাঢ় বাদামি চুলের এক-গাছা দড়ি ছড়িয়ে রয়েছে মানুষটার নগ্ন বাহুতে।

'না,' মেয়েটি জবাব দিলো, 'মানুষটা চলে গেছে বলে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি—তা নয়। তুমি বোঝো না…'

পুরুষ মানুষটা কি বললো, সাইসন তা বুঝতে পারলো না।

হিলডা পরিষ্কার স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলো, 'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। সে চিরদিনের মতো আমার জীবন থেকে একেবারে চলে গেছে—তার কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না…'

মানুষটা ওকে চুমু দিলো, অস্ফুটে কি যেন বললো।

হিলডা ফাঁকা গলায় হাসলো। প্রশ্রয়ের স্বরে বললো, 'হ্যাঁ আমরা বিয়ে করবো। বিয়ে করবো…কিন্তু এখুনি নয়।'

মানুষটা ফের ওকে কিছু বললো। কিছুক্ষণ সাইসন কিছুই শুনতে পেলো না। তারপর হিলডা বললো, 'এবারে তুমি বাড়ি যাও, লক্ষ্মীটি। নইলে তোমার আর ঘুমোনো হবে না।'

ফের বনরক্ষকের আতংক আর বাসনায় বিব্রত হয়ে ওঠা অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'কিন্তু এখুনি কেন আমাদের বিয়ে করতে হবে?' হিলডা বললো, 'বিয়ে করে তুমি এর চাইতে বেশি আর কি পাবে? এই তো বেশ আছো!'

অবশেষে মানুষটা নিজের কোটটা গায়ে চাপিয়ে চলে গেলো। হিলডা দাঁড়িয়ে রইলো ফটকের কাছে। ও কিছু দেখছিলো না, শুধু তাকিয়েছিলো সূর্যস্নাত পৃথিবীর দিকে।

শেষ অব্দি মেয়েটি যখন চলে গেলো, তখন সাইসনও বিদায় নিলো—ফিরে গেলো শহরের দিকে।

* The shades of spring.

হেনরিয়েটা বললো, 'ছাখ ভাই, যে মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, আর মাস খানেকের মধ্যে যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি—তার সঙ্গে সপ্তাহশেষের ছুটিটা কাটাতে যাবার সময় চিন্তায় আমার মুখের যদি অমন দশা হতো ··তাহলে হয় আমি চেষ্টা-চরিত্র করে মুখের অবস্থাটাকে পালটে ফেলতুম, নয়তো আমার মনের চিন্তাগুলোতে লুকিয়ে রাখতুম, আর নয়তো অন্য কিছু করতুম।'

'তুই থাম্‌তো!' হেস্টার ছোট্ট করে বললো, 'দেখতে ভালো না লাগলে, আমার মুখের দিকে তাকাস না।'

'লক্ষ্মীটি হেস্টার, মেজাজ খারাপ করিস নে ভাই! তুই একটু আর্শির দিকে তাকিয়ে ছাখ, তাহলেই বুঝতে পারবি আমি কি বলতে চাইছি।'

'তুই কি বলতে চাইছিস, তাতে কার কি এসে-যায়! আমার মুখের জন্যে তুই তো দায়ী নোস,' মরিয়া হয়ে জবাব দেয় হেস্টার—কিন্তু আর্শির দিকে তাকাবার বা বোনের সদুপদেশ মেনে নেবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করে না।

ছোটো বোন হেনরিয়েটা হালকা চা'ল একটা সুর নিয়ে গুঞ্জন তোলে। ওব বয়েস একুশ, এখনও বিয়ের কথা পাকা হয়নি এবং কোনো সর্বনেশে আংটি গ্রহণ করে মনের শান্তি ক্ষুণ্ন করার সামান্যতম বাসনাও ওর নেই। অবিশ্যি হেস্টার যে 'এগিয়ে চলেছে' তা দেখে ওর ভালোই লাগে—কারণ হেস্টারের বয়েস প্রায় পঁচিশ, যেটা রীতিমতো চিন্তার কথা।

সব চাইতে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, ইদানীং নিষ্ঠাবান জো-র কথা উঠলেই হেস্টারের মুখে ওর সেই বিখ্যাত 'উদ্বিগ্ন' অভিব্যক্তিটা ফুটে উঠছে—ওর দু চোখের কোল জুড়ে কালি, গালে চিন্তার রেখা। আর হেস্টারকে অমন দেখালেই হেনরিয়েটা নিজের মনের গভীরে দুশ্চিন্তা আর আতংকের ভয়াবহ তীব্র প্রতিধ্বনি অনুভব না করে পারে না, যেটা ওর একেবারে বিশ্রী লাগে। আতংকের সেই চকিত অনুভূতিটা ও আদপেই বরদাস্ত করতে পারে না।

'আমি বলতে চাইছিলুম কি যে তুই যদি দিনকে দিন মুখের চেহারাটা এমন খারাপ করতে থাকিস, তাহলে সেটা কিন্তু জো-র ওপরে খুবই অবিচার করা হবে। হয় মুখটা একটু সুন্দর করে তোল্‌, আর নয়তো···' বলতে বলতে নিজেকে

সামলে নেয় হেনরিয়েটা। ও বলতে যাচ্ছিলো, 'যাস না।' কিন্তু আসলে ও আশা করে, হেস্টার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবে। তাহলে হেনরিয়েটার মন থেকেও একটা মস্ত বড়ো বোঝা নেমে যায়।

'নিকুচি করেছে!' চিৎকার করে ওঠে হেস্টার, 'তুই থাম তো!' ওর কালো চোখ দুটিতে রাগ আর সন্দেহের আগুন ঝলসে ওঠে।

হেনরিয়েটা বিছানায় বসে চিবুকটা উঁচু করে নিজের মুখখানিকে ধ্যানমগ্ন দেবদূতের মতো প্রশান্ত করে তোলে। হেস্টারকে ও সত্যিই খুব নিবিড় করে ভালোবাসে। তাই হেস্টারের মুখে অমন উদ্বেগের অভিব্যক্তি ওর কাছে একটা প্রচণ্ড অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে হয়।

'আচ্ছা, হেস্টার!' হেনরিয়েটা বললো, 'তাহলে আমি কি তোর সঙ্গে মার্কবারিতে যাবো? তুই যেতে বললে, আমি আপত্তি করবো না।'

'তাতে কোন্ কর্মটা হবে, শুনি?' প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠলো হেনরিয়েটা।

'না, আমি ভেবেছিলুম যে তাতে তোদের মাথামাথির ধারটা হয়তো একটু কমে যাবে—মানে, সেটাই যদি তোর দুশ্চিন্তার কারণ হযে থাকে।'

হেস্টার বিদ্রূপভরা একটা ফাঁকা হাসির প্রতিধ্বনি ছড়ালো, 'অতো ছেলে-মানুষটি হোস না, হেনরিয়েটা! সত্যি বলছি!'

অতএব হেস্টার একাই উইল্টশায়ারে রওনা হলো। বিয়ে করে স্থিতু হবার জন্যে জো সেখানে ছোট্ট একটা খামারবাড়ি সবেমাত্র চালু করেছে। গোলন্দাজ বাহিনীতে চাকরি করার পর, ব্যবসা-বাণিজ্য তার আদৌ ভালো লাগে না। তাছাড়া হেস্টার কোনোদিনও শহরতলির কোনো ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে উঠতো না। প্রতিটি মেয়েমানুষই বিয়ের আংটির মাধ্যমে নিজের ঘর-সংসার দেখতে পায়। হেস্টার এ পর্যন্ত শুধুমাত্র আড়চোখেই ওর বাগদত্তা হবার আংটিটার দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু হে ঈশ্বর! তাতে গোল্ডার্স গ্রীন নেই, এমন কি হ্যারো পর্যন্ত নেই!

বলতে গেলে নিজের হাতেই জো বাদামি রঙের ছোট্ট একটা কাঠের বাংলো বানিয়ে নিয়েছে। বাংলোর পেছনে ছোট্ট একটা নদী আর দুটো বুড়ো উইলো গাছ। বাড়ির দুপাশে বাদামি রঙের ছাউনি আর মুরগীর খোঁয়াড়। তাছাড়া তারের বেড়া দেওয়া শুয়োরের খোঁয়াড়ে শুয়োর, ক্ষেতে দুটো গরু আর একটা ঘোড়াও রয়েছে। ত্রিশ একর জমি আছে জো-র, কিন্তু সাহায্যকারী বলতে একটি মাত্র যুবক। অবিশ্যি এবারে হেস্টারও থাকবে।

জো-র সমস্ত কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেখে মনে হয় যেন একেবারে নতুন। জো খেটে-খাওয়া মানুষ। তাকে দেখেও বেশ নতুন, ঝকঝকে, দিব্যি স্বাস্থ্যবান আর নিজের ওপরে খুশি বলে মনে হয়। হেস্টারের মুখে সেই 'উদ্বেগের অভিব্যক্তি' সে লক্ষ্যও করেনি, কিংবা করে থাকলেও শুধু বলেছে :

'তোমাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে, হেস্টার। আসলে তুমি যতোটা বুঝতে পারো, শহর তার চাইতে অনেক বেশি তোমার ভেতর থেকে টেনে নেয়। এখানে থাকলে তুমি অন্য এক মেয়ে হয়ে উঠবে।'

'হবো বইকি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো হেস্টার।

জায়গাটা ওরও পছন্দ হয়েছিলো। অসংখ্য সাদা আর হলদে মুরগী, শুয়োরগুলোর অজস্র ছানা। বাড়ির পেছন দিকে হেলে পড়া প্রাচীন গাছ দুটো থেকে হলুদ-রঙা সরু উইলো পাতা মৃদু শব্দ তুলে ঝরে পড়ছে। সবকিছুই ভীষণ ভালো লাগলো হেস্টারের—বিশেষ করে মাটিতে ঝরে পড়া হলদে পাতাগুলোকে।

জো-কে ও বললো, সব কিছুই ওর সুন্দর লাগছে, সবই অপূর্ব। জো-ও তা শুনে ভীষণ খুশি। তাকে দেখে অবশ্যই যথেষ্ট কর্মক্ষম বলে মনে হচ্ছিলো তখন।

সাহায্যকারী যুবকটির মা বেলা সাড়ে বারোটার সময় ওদের খেতে দিলেন। তারপর সারা বেলা শুধু রোদ, হাতের কাজ সামান্যই। খাবার থালাগুলো ধুয়ে মুছে নিয়ে মহিলা বললেন, 'আর বেশি দেরী নেই—তারপর তো আপনিই এই ছোট্ট সুন্দর উনুনটাতে রান্না করবেন।'

'না আর বেশি দেরী নেই।' উনুনের তাপে অত্যধিক তেতে ওঠা কাঠের ছোট্ট রান্নাঘরটাতে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলো হেস্টার।

মহিলা চলে গেলেন। চায়ের পরে কাজের ছেলেটিও চলে গেলো। জো আর হেস্টার মুরগী আর শুয়োরগুলোকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রাখলো। রাত নেমে আসছিলো। হেস্টার রাতের জন্যে রান্নাবান্না করতে গেলো, নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছিলো ওর। জো বৈঠকখানার তাপচুল্লিতে আগুন জ্বাললো, নিজেকে একটা কেউকেটা গোছের বলে মনে করছিলো সে।

আসছে কাল সকালে কাজের ছেলেটি না আসা পর্যন্ত জো আর হেস্টার বাংলোতে একাই থাকবে। ছ মাস আগে হলে হেস্টার এতে মজাই পেতো। তখন ওদের দুজনার মধ্যে সব ব্যাপারেই মিল ছিলো, দুজনে ছিলো দুজনার বন্ধু। দুজনের পরিবারের মধ্যেও সেই বাল্যযুগ থেকে বন্ধুত্ব। জো ছিলো একে-

ধারে নিপাট ভালো ছেলে। তার দিক থেকে কখনও কোনো রকমের গণ্ডোগোল হবার মতো আশঙ্কা ছিলো না। হেস্টারের দিক থেকেও না।

কিন্তু হায়! এখন, হেস্টার জো-কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেবার পর থেকে, জো ওর সঙ্গে 'প্রেমে পড়া'র মতো একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে। জো আগে কক্ষনো এমনটি ছিলো না। জো-র এমন দশা হবে জানলে ও অবশ্যই বলতো: আমরা শুধু বন্ধু হয়েই থাকবো জো—কারণ এ ব্যাপারটা স্রেফ অধঃপতন। জো ওকে আদর-সোহাগ করতে শুরু করলে ও আর জো-কে সহ্য করতে পারে না। অথচ ও অনুভব করে, ওর সেটা সহ্য করা উচিত। এমন কি, সেটা ওর ভালো লাগাও উচিত। যদিও 'ঔচিত্য'টা যে কোত্থেকে এলো, তা ও ভেবে পায় না।

জো ওকে দুঃখ করে বলেছে, 'জানো হেস্টার, আমার কেমন যেন ভয় করে মনে হয় আমি তোমাকে যেমনটি ভালোবাসি, তুমি আমায় ততোটা বাসো না।

'রাখো তো ও সব কথা!' হেস্টার ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, 'আমি তোমাকে তেমন ভালো না বাসলে তোমার বরং রীতিমতো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই।'

জো এই মারাত্মক দো-নলা মন্তব্যটা শুনেছে, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। কোনো জিনিসই সে চোখের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে দেখাটা পছন্দ করে না। তাই ব্যাপারটা সে ছেড়েই দিয়েছে। হেস্টারের সমস্ত অনুভূতি-গুলোকে সে স্বস্তিভরে রেখে দিয়েছে গাঢ় অন্ধকারে। স্বস্তিটা অবশ্যই তার নিজের।

মোটর গাড়ি, ক্ষেত-খামার এবং ওই ধরনের সমস্ত কাজেই জো প্রচণ্ড সুদক্ষ। আর হেস্টার তো মোটর-গাড়ির মতোই জটিল। হেস্টারের মধ্যে অসংখ্য ছোটোখাটো সূক্ষ্ম ভালভ, ম্যাগনেটো, অ্যাক্সিলারেটার এবং মোটর-গাড়ির অন্যান্য যন্ত্রপাতি সবই আছে। গাড়ির ব্যাপারে জো যতোটা সতর্ক, হেস্টারের ব্যাপারে সে যদি শুধু ততোটাই সতর্ক থাকার চেষ্টা করতো! যে কোনো মোটর গাড়ির মতো হেস্টারকেও চালু করার প্রয়োজন হয়। গাড়িকে চালু করার জন্যে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকলেও, সেই যন্ত্রটাকে সঠিক ভাবে মোচড় দিতে হয়। হেস্টার অনুভব করে, জো-র সঙ্গে যদি কোনোদিন ওকে বিবাহিত-জীবনের পথে যাত্রা শুরু করতেও হয়, তাহলে ওকে ভালোমতো ধাক্কা মেরে চালু করার দরকার হবে। অথচ জো, হতভাগা নির্বোধটা, হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ গাড়িতে

বসে রয়েছে আর এমন একটা ভান দেখাচ্ছে যেন সে ঘণ্টায় কে জানে কতো মাইল বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে।

আজকের এই সন্ধ্যায় হেস্টার সত্যিই একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিকেলে ও জো-র সঙ্গে ভালোভাবেই বাড়ির কাজকর্ম করেছে। তখন জো-র সঙ্গে থাকতে ভালোই লাগছিলো ওর। কিন্তু এখন এই সন্ধ্যা, ওদের একাকীত্ব, বোকাটে ছোট্ট তাপচুল্লি, জো, জো-র তামাকের নল আর ভণ্ডামিভরা প্রসন্ন মুখ—সবই ওর কাছে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে।

'এসো, এখানে এসে বসো লক্ষ্মীটি,' সোফায় নিজের পাশের জায়গাটাতে মৃদু চাপড় মারলো জো। আর হেস্টারও—যেহেতু ওর ধারণা, যে কোনো 'ভালো' মেয়েই এতে খুশি হয়ে 'ওখানে' গিয়ে বসবে—তাই ও-ও মানুষটার পাশে গিয়ে বসলো। কিন্তু মনে মনে ও তখন ফুটছে। কি ধৃষ্টতা। সোফাটা রাখাও একটা ধৃষ্টতা। সোফার অশ্লীলতায় ভীষণ বিরক্ত হলো ও।

নিজের কোমরে জড়িয়ে থাকা মানুষটার হাত এবং নিজের বাহুতে এক-ধরনের মৃদু চাপ, যেটা আলিঙ্গনের আমন্ত্রণ বলেই হেস্টারের ধারণা—সবই সহ্য করে রইলো ও। ইতিমধ্যে জো সাবধানে নিজের মুখ থেকে তামাকের নলটা নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু হেস্টারের মনে হলো, ভীষণ কপট আর বোকাটে দেখাচ্ছে মানুষটাকে—যেন মুখটা থেকে সবটুকু স্বাভাবিক সরলতাই উবে গেছে। কি অদ্ভুত হাস্যকরভাবে ওর ঘাড়ের পেছনটাতে আলতো করে হাত ছোঁয়াচ্ছে জো! কি বোকার মতো প্রেমিক-কপোতটি হতে চেষ্টা করছে! হেস্টার ভাবলো, লর্ড বায়রন মৃদুভাবে কতো অর্থহীন মিষ্টি কথাই না তাঁর অসংখ্য প্রেমিকাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু সেসব নিশ্চয়ই এতো অর্থহীন বাচালতা, এতো অপটু ছিলো না। কি ডাকাতের মতো ওকে চুমু খেলো জো।

'এর চাইতে বরং একটু বাজনা শোনালে আমি অনেক বেশি খুশি হবো, জো,' হেস্টার বললো।

'তুমি কি চাও, আজ রাত্তিরেই আমি তোমাকে বাজনা শোনাবো?'

'আজ রাত্তিরেই বা নয় কেন? আমার একটু চাইকোভস্কি শুনতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে এমন কিছু শুনতে যা আমার ভেতরটাকে একটু নাড়িয়ে তুলবে।'

বাধ্য ছেলের মতো উঠে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেলো জো। বেশ ভালোই বাজালো। হেস্টার তা শুনলো। চাইকোভস্কি,* মানে চাইকোভস্কির

---

* পিয়োতর ইলিচ চাইকোভস্কি (১৮৪০-৯৩) রাশিয়ান সুরকার। সুবিখ্যাত ব্যালে 'সোয়ান লেক' এবং 'দ স্লিপিং বিউটি' এঁরই রচনা।

বাজনাটা, ওকে সত্যিই নাড়া দিতে পারতো যদি না ও একেবারে নিদারুণ ভাবে সুনিশ্চিত হতো যে এই সুরধ্বনির পরে জো-র প্রেম-শৃঙ্গার—অবিশ্যি একে যদি শৃঙ্গার বলা যায়—সহ্য করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে।

'সুন্দর হয়েছে।' হেস্টার বললো, 'এবারে একটা রাত্রের সুর বাজাও—আমার ভারি ভালো লাগে।'

জো পিয়ানোর চাবিতে আঙুল টেপায় একাগ্র হতেই হেস্টার টুক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

আঃ! অক্টোবরের হিমেল বাতাসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো হেস্টার। চারদিকে আবছা অন্ধকার। পশ্চিম আকাশে আধখানা চাঁদ সবেমাত্র ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। বাতাস স্তব্ধ। আবছা অন্ধকার কুয়াশার মতো ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

চুলে ঝাঁকুনি তুলে বড়ো বড়ো পা ফেলে বাংলোটা ছেড়ে এগিয়ে চললো হেস্টার। বাংলোটা এখন অবিকল একটা ছোট্ট ঢোলকের মতো হয়ে ওর প্রিয় নৈশসুরের প্রতিধ্বনি তুলছে। স্রেফ শ্রুতির নাগাল এড়াবার জন্যেই দ্রুত পায়ে ছুটে চললো ও।

আহা, কি অপরূপ রাত্রি! নিজের ছোট ছোট চুলগুলোতে ফের ঝাঁকুনি তুললো হেস্টার। নিজেকে অনন্তের দিকে ছুটে চলা মাজেপ্পার ঘোড়ার মতো মনে হচ্ছিলো ওর—যদিও অনন্তটা পাশের খামারেরই একটা প্রান্তর। কিন্তু হেস্টারের মনে হচ্ছিলো, নরম জ্যোৎস্নায় ও যেন একেবারে ফেনিয়ে উঠেছে। আহা, দূরের কিনারায় ছুটে চলা যে কি আনন্দের! তবে কিনা, জো-র রুটি-কাটা-ছুরির মতো দূরের যদি কোনো কিনারা থাকতো। 'আমি জানি, আমি একটা বোকা,' নিজের মনেই বললো হেস্টার। কিন্তু তাতে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে উদ্দাম উত্তেজনাটা বিদায় নিলো না। ইস, জো আর তার গদগদ প্রেম-নিবেদনের যদি বিকল্প কোনো সমাধান থাকতো! হাঁ, গদগদ প্রেম নিবেদন! শব্দটা ওর আত্মমর্যাদার শেষ আবরণটুকু কেড়ে নেওয়া সত্ত্বেও, কথাটা ও জোরেই বললো।

মাঠের মধ্যে একদল অপরিচিত ঘোড়া ছিল বলে হেস্টারকে জো-র বেড়ার ভেতর দিয়ে সাবধানে পেছনে ফিরতে হলো। এটা জো-র উপযুক্ত জায়গাই বটে, যেখানে পিয়ানোর আওয়াজ থেকে পালাতে হলে অন্যের জমির ওপর দিয়ে বিনা অনুমতিতে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

হেস্টার বাংলোর কাছাকাছি যেতেই পিয়ানোর উদ্দাম আওয়াজটা

আচমকা থেমে গেলো। হে ভগবান, এবারে কি হবে! পাগলের মতো চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলো হেস্টার। একটা বুড়ো উইলো গাছ নদীটার ওপরে হেলে রয়েছে। শরীরটাকে লম্বা করে, গুঁড়ি মেরে, বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় ঠাণ্ডা পাতায় ছাওয়া গাছটাতে উঠে পড়লো ও।

হেস্টার মোটামুটি একটু স্থিতু হতে না হতেই জো ওকে খোঁজার জন্যে বাড়ির মোড়টা পেরিয়ে জ্যোৎস্নায় এসে দাঁড়ালো। কি সাহস, ওকে কিনা খোঁজা হচ্ছে! পাতার আড়ালে নিজেকে বাদুড়ের মতো অনড় করে রেখে হেস্টার লক্ষ্য করলো, ঋজু পুরুষালি চেহারার ক্লান্ত মানুষটা এগুতে এগুতে অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছে। শুধু একবারের জন্যে ভীষণ তুচ্ছ, নিষ্ফল আর বিহ্বল বলে মনে হলো মানুষটাকে। কোথায় গেলো মানুষটার তথাকথিত পুরুষালী জাদু? পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন ও এতো ধীর আর অসম?

ওই যে! মৃদু আর আত্মসচেতনভাবে মানুষটা ডাকছে, 'হেস্টার! হেস্টার! কোথায় লুকোলে নিজেকে?'

সত্যি সত্যি রেগে উঠেছে মানুষটা। গাছের ডালে হেস্টার নিজেকে স্থির করে রাখে, চেষ্টা করে নড়াচড়া না করতে। মানুষটার ডাকে সাড়া দেবার বিন্দুমাত্র বাসনাও ওর নেই। ইচ্ছে হলে সে খুঁজতে খুঁজতে অন্য গ্রহেও চলে যেতে পারে। এলোমেলো ভাবে পা ফেলে এবারে সে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

এতোক্ষণে একটু বিবেকের তাড়না অনুভব করলো হেস্টাব। 'সত্যি বাপু, তুমি ওর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করলে সেটা কিন্তু বেশ খারাপ! বেচারা জো!'

তক্ষুনি ওর মনের মধ্যে কে যেন গুঞ্জন তুললো, 'তুমি যেভাবে নরম গলায় ওকে 'বেচারা জো' বললে, তা কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি!'

তবু ও বাড়ির ভেতরে গিয়ে সারাটা সন্ধ্যা জো-র সঙ্গে ব্যাজোর ব্যাজোর করে কাটাতে রাজি নয়।

'আমি অমন করে প্রেমে পড়তে পারি, এটা ভাবাই একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তার চাইতে বরঞ্চ ওর শুয়োরগুলোর একটা খাবারের গামলায় গিয়ে পড়বো। কারণ এভাবে প্রেমে পড়াটা একেবারে ভয়ংকরভাবে সাধারণ। সত্যি বলতে কি মানুষটা যে আমায় ভালোবাসে না, এটা তারই একটা প্রমাণ।'

চিন্তাটা একটা বুলেটের মতো হেস্টারের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। 'ও যে আমার প্রেমে পড়েছে এতেই প্রমাণ হয়, ও আমাকে ভালোবাসে না। কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে কোনো পুরুষ এভাবে মেয়েটির প্রেমে পড়তে পারে না।

মেয়েটির পক্ষে সেটা রীতিমতো অপমানজনক।'

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই হেস্টার কাঁদতে শুরু করলো। হাতার ভেতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে রুমালটা বের করতে গিয়ে আর একটু হলেই ও গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলো প্রায়। এবং তাতেই হুঁশ ফিরলো ওর।

আবছা দূরত্বে ও দেখতে পেলো, মানুষটা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ভীষণ বিরক্ত লাগলো ওর। 'কেন ও এই ঝামেলাটা শুরু করলো? আমি কোনোদিনও কাউকে বিয়ে করতে চাইনি আর অবশ্যই কাউকে আমার প্রেমে ফেলতে চেষ্টা করিনি। এখন আমার একেবারে করুণ অবস্থা, নিজেকে আমার অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ বেশির ভাগ মেয়ে নিশ্চয়ই এই প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে পছন্দ করে, নয়তো পুরুষমানুষরা তা করতো না। আর বেশির ভাগ নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। অতএব আমি অস্বাভাবিক, আমি একটা গাছে চড়ে রয়েছি। নিজেকে আমার ঘেন্না লাগছে। আর জো—আমাদের দুজনার মধ্যে যা কিছু ছিলো, জো তার সবই নষ্ট করে দিয়েছে আর আশা করছে, সেই জোরেই আমি ওকে বিয়ে করবো। কি বিশ্রী ব্যাপার! জীবনটা কি গোলমেলে! গোলমেলে ব্যাপারগুলোকে যে কি জঘন্য লাগে আমার!'

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললো হেস্টার এবং তার মধ্যেই শুনতে পেলো বাংলোর দরজাটা একটু শব্দ করেই বন্ধ হলো। তার মানে জো বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। সঠিক কারণেই এবারে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবে। হেস্টারের মনে এক নতুন আশংকার উদয় হলো।

উইলো গাছটা বড্ডো অস্বস্তিকর। বাতাসটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে ফের ঠাণ্ডা লাগলে হেস্টার সম্ভবত সারাটা শীতকালই সশব্দে নাক টানবে আর নাকি-সুরে কথা কইবে। ও দেখলো, বাংলোর জানলা দিয়ে লম্ফের উষ্ণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। 'ধ্যাৎ!' বললো ও। এ ক্ষেত্রে শব্দটার অর্থ—ওর বিশ্রী লাগছে।

গাছ থেকে নেমে বাহুর কাছটা একটু চুলকে নিলো হেস্টার। ওর সব চাইতে সুন্দর মোজাগুলোর মধ্যে একজোড়া মোজা সম্ভবত ও নষ্টই করে ফেললো। 'চুলোয় যাকগে!' একটু জোর দিয়েই বললো ও। তারপর 'বেচারা জো'র সঙ্গে ব্যাপারটা ফয়সলা করে নেবার জন্যে বাংলোর ভেতরে যাবার জন্যে তৈরি হলো। 'ওকে আমি বেচারা জো বলবো না।'

সেই মুহূর্তেই গলির মুখে একটা গাড়ির গতি শ্লথ করার আওয়াজ পেলো হেস্টার। একটা ভেঁপু বেজে উঠলো নিচু সুরে। হেডলাইটের ঝলমলে আলো

স্থির হয়ে রইলো জো-র নতুন লোহার ফটকটার কাছে।

'কি শয়তানি। কি অসহ্য ধৃষ্টতা। ওটা নির্ঘাত হেনরিয়েটা, ঠিক আমার পেছন পেছন এসে হাজির হয়েছে।'

উত্তেজনায় আত্মহারা মানবীর মতো ছাই-বেছানো গাড়ির রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটে গেলো হেস্টার।

'কি খবর হেস্টার?' গাড়ির অস্পষ্টতা থেকে হেনরিয়েটার শান্ত ছেলেমানুষী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'সব কিছু কেমন চলছে?'

'কি আশ্চর্য ধৃষ্টতা!' জো-র লোহার দরজায় শরীর ঝুঁকিয়ে হাঁফাতে লাগলো হেস্টার।

'সব কিছু কেমন চলছে?' শান্ত নম্র গলায় ফের প্রশ্ন করলো হেনরিয়েটা।

'তার মানে? কি বলতে চাইছিস তুই?' হেস্টার তখনও হাঁফাচ্ছে।

'দিদি, তুই রাগ করিস নে, লক্ষ্মীটি! তুই বাইরে বেরিয়ে না এলে আমরা আর ভেতরে যেতুম না। আমরা তোর নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাতে চাই, তা ভাবিস নে যেন। আমরা বনামির বাড়িতে যাচ্ছি। আবহাওয়াটা একেবারে অপূর্ব, তাই না রে?'

বনামি জো-র বন্ধু। সে-ও গোলন্দাজ বাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য, এদিকেই মাইল খানেক দূরে একটা খামার করেছে। কাজেই জো কোনো অর্থেই নিজের বাংলোয় একজন রবিনসন ক্রুশো হয়ে নেই।

'আমরা বলতে কে?' জিজ্ঞেস করলো হেস্টার।

'সেই পুরনো পাখিরা,' চালকের আসন থেকে ডোনাল্ড জবাব দিলো ডোনাল্ড জো-র ভাই। হেনরিয়েটা সামনের আসনে তার পাশেই বসে রয়েছে।

'চিরদিন যারা একসঙ্গে থাকি,' গাড়ির ভেতর থেকে মাথা বের করে টেডি বললো। টেডি জো-র দূর সম্পর্কের ভাই।

'তা এসেই যখন পড়েছিস, তখন ভেতরে আয়,' হেস্টার একটু নরম হয়ে ওঠে। 'তোদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খেয়েছি।' ডোনাল্ড বললো, 'কিন্তু এ যাত্রায় আমরা আর ভেতরে যাচ্ছি নে। তুমি আর ঝামেলা কোরো না, হেস্টার।'

'কেন আসবে না?' হেস্টার দপ করে জলে ওঠে।

'জো-র ভয়ে,' ডোনাল্ড বললো।

'তাছাড়া, হেস্টার,' হেনরিয়েটার গলায় উদ্বেগের স্বর, 'তুই তো জানিস, তুই নিজেও এখন আমাদের চাস না।'

'বোকামো করিস নে, হেনরিয়েটা,' হেস্টার ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

'শোন্, হেস্টার'—হেনরিয়েটার ব্যথিত কণ্ঠ আপত্তি জানায়।

'ভেতরে আয় বলছি, আর একটাও বাজে কথা নয়!'

'এ যাত্রায় নয়, হেস্টার', ডোনাল্ড বললো।

'আজ্ঞে না!' টেডির জবাব।

'তোরা কি বোকা রে! কেন আসবি না, শুনি?' হেস্টার চিৎকার করে ওঠে।

'আমাদের দাদাটির ভয়ে,' বললো ডোনাল্ড।

'বেশ, তাহলে আমিই তোদের সঙ্গে যাবো।'

'আমি একটু উঁকি মেরে দেখে আসবো নাকি?' গাড়ির দরজা দিয়ে নামার জন্যে হেনরিয়েটা লম্বা করে পা বাড়ালো, 'বাড়িটা না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না।'

চাঁদ ডুবে গেছে, রাত্রিটা এখন অন্ধকার। মুখে কোনো কথা না বলে হেস্টার আর হেনরিয়েটা ছাই বেছানো পথে মচমচ শব্দ তুলে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো।

'যদি বলতেই হয় তো তুই বলিস, আমি ভেতরে আসিনি। কিংবা জো যদি—'হেনরিয়েটার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস। ওর ছেলেমানুষী মনটা ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কোনো একটা সূত্র খুঁজে পাবে বলে আশা করছিলো ও। হেস্টার কোনো জবাব না দিয়ে নীরবে পথ চলছিলো। হেনরিয়েটা ওর বাহুতে নিজের একখানা হাত রাখতেই হেস্টার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিলো, 'একটু স্বাভাবিক হয়ে ওঠ, হেনরিয়েটা!'

এক ছুটে সিঁড়ির তিনটে ধাপ পেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো হেস্টার। দরজাটা সপাটে খোলা। ভেতরে লম্ফের আলোয় ভরা বৈঠকখানা। দরজার দিকে পেছন ফিরে জো তাপচুল্লিটার কাছে একটা আরাম-কুর্সিতে বসে রয়েছে। শব্দ শুনেও সে পেছনে ফিরে তাকালো না।

'হেনরিয়েটা এসেছে!' হেস্টার এমন একটা সুরে কথাটা বললো যার অর্থ দাঁড়ায়, 'কেমন হলো?'

কুর্সি ছেড়ে উঠে জো ঘুরে দাঁড়ালো। কঠিন মুখে ওর বাদামি চোখ দুটো রাগে ভর্তি।

'তুমি এখানে কি করে এলে?' রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলো জো।

'গাড়িতে করে,' অপাপবিদ্ধ শিশুর মতো জবাব দিলো হেনরিয়েটা।

'ও ডোনাল্ড আর টেডির সঙ্গে এসেছে,' হেস্টার জানালো, 'তারা ফটকের

ঠিক বাইরেই রয়েছে।'

'ভেতরে আসছে ?' আরও বেশি রাগত স্বরে প্রশ্ন করে জো।

'তুমি বরং বাইরে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে এসো।'

জো কোনো জবাব না দিয়ে একখণ্ড কাঠের গুঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, আমি এভাবে এসে ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি! আসলে আমরা বনামির বাড়িতে যাচ্ছিলাম।' নিষ্পাপ চোখে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো হেনরিয়েটা, 'ঘরটা কিন্তু বেশ সুন্দর, খুব ভালো রুচি। আমার ভারি ভালো লাগছে। আচ্ছা, আমি আমার হাত দুটোকে একটু গরম করে নিতে পারি ?'

জো তাপচুল্লির কাছ থেকে সরে এলো। তার পায়ে চটি। হেনরিয়েটা রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে লাল হয়ে ওঠা ওর দীর্ঘ হাত দুখানি তাপচুল্লির জালির কাছে মেলে ধরলো।

'আমি এক্ষুনি চলে যাবো,' বললো ও।

'কক্ষনো তা করবে না!' অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে বললো হেস্টার।

'হ্যাঁ, যেতেই হবে। ডোনাল্ড আর টেডি অপেক্ষা করছে।'

'আমি ওদের বলে দেবো তুই আজকের রাতটা আমার সঙ্গেই থাকছিস।' আগের মতোই টেনে টেনে হেস্টার বললো, 'এক-আধজন বেশি থাকলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

'এটা কোন্ ধরনের খেলা ?' ওর দিকে তাকালো জো।

'আদৌ কোনো খেলা নয়। তবে টাট্টি যখন এসেই পড়েছে, তখন থাকতেও পারবে।'

'টাট্টি' আসলে হেনরিয়েটার সংক্ষিপ্ত রূপ, যা খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

'কিন্তু হেস্টার, আমি ডোনাল্ড আর টেডির সঙ্গে বনামির ওখানে যাচ্ছি!'

'আমি যদি তোকে এখানে থাকতে বলি, তাহলে যাবি না।'

হেনরিয়েটাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় আর অসহায় বলে মনে হয়।

'এটা কোন্ ধরনের খেলা ?' ফের প্রশ্ন করে জো। 'তোমরা কি আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রেখেছিলে নাকি, যে আজ রাতে তুমি এখানে আসবে ?'

'না জো, সত্যি বলছি!' আন্তরিক সরলভাবে হেনরিয়েটা বলে, 'আজ বিকেল চারটের সময় ডোনাল্ড প্রস্তাবটা তুললো। তার আগে পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করিনি। আবহাওয়াটা দারুণ ভালো ছিলো, কোথাও যেতেই হবে—তাই আমরা ভাবলাম, বনামির ওখানে চলে যাই। আশা করি

সেও এমনি করে খেপে উঠবে না।'

'আমরা আগে থেকে ঠিকঠাক করে রাখলেও তাতে কোনো অপরাধ হতো না।' হেস্টার তুম করে বলে বসলো, 'যাক গে, তোরা যখন এসেই পড়েছিস তখন সবাই মিলেই এখানে থেকে যেতে পারিস।'

'না হেস্টার, না! আমি জানি ডোনাল্ড কিছুতেই ফটকের ভেতরে ঢুকবে না। আমি জোর-জবরদস্তি করে গাড়ি থামিয়েছিলাম বলে, ও আমার ওপরে ভীষণ রেগে গেছে। গাড়ির ভেঁপুটা আমিই বাজিয়েছিলাম—ও নয়, আমি। একেই বোধহয় মেয়েলী কৌতূহল বলে। আমিও যথারীতি ফাঁদে পা ফেললাম। কাজেই এখন আমার যতোশীঘ্রি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো! আমি চললাম, শুভরাত্রি!'

এক হাত দিয়ে কোটটা গায়ে জড়িয়ে হেনরিয়েটা এলোমেলো পায়ে দরজার দিকে এগুলো।

'তাহলে আমিও তোদের সঙ্গে যাবো,' হেস্টার বললো।

'কিন্তু, হেস্টার!' হেনরিয়েটা চিৎকার করে উঠে প্রশ্নালু দৃষ্টিতে জো-র দিকে তাকালো।

'কি হচ্ছে না হচ্ছে তা তুমি যতোটুকু জানো, আমিও ততোটুকুই জানি,' বললো জো। জো-র মুখটা কাঠের মতো, আর রাগী। হেনরিয়েটা ওর মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না।

'হেস্টার, মাথাটা একটু ঠিক কর!' চিৎকার করে উঠলো হেনরিয়েটা। 'কি এমন হয়েছে? তুই অন্তত ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলে সবাইকে একটা সুযোগ দিচ্ছিস না কেন? তুই তো সব সময় আমাকে 'স্বাভাবিক' হতে বলিস। এবারে নিজে একটু স্বাভাবিক হয়ে ওঠ্ তো।'

তারপর এক নাটকীয় নীরবতা।

'কি হয়েছিলো? হেনরিয়েটা পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ওর চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল আর বেদনার্ত—ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, নিজের মাথাটা ঠিক রাখবে বলে ও একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'কিছুই হয়নি।' হেস্টারের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর।

'জো, তুমি জানো?' নিবিড় সহানুভূতি নিয়ে মানুষটার দিকে ফিরে, যেন পোর্শিয়ার মতো প্রশ্ন করলো হেনরিয়েটা।

মুহূর্তের জন্য জো-র মনে হলো, দিদির চাইতে হেনরিয়েটা কতো ভালো।

'আমি শুধু এইটুকুই জানি যে ও আমাকে পিয়ানো বাজাতে বলে,

আমাকে এড়িয়ে বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলো। সেই থেকে ওর স্টিয়ারিং গিয়ারটা বিকল হয়ে আছে।'

'হা-হা-হা!' নাটকীয় ভঙ্গিতে মিথ্যে করে হাসলো হেস্টার।' 'বাড়ি থেকে কেটে গিয়ে আমার ভালোই লেগেছে! তাজা হাওয়ায় একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। খুব তো আমার বাইরে যাওয়া নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমি জানতে চাই—কার স্টিয়ারিং গিয়ারটা বিকল হয়েছে।'

'তুমিই কায়দা করে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে।'

'গিয়েছিলাম নাকি? কিন্তু কেন যাবো, শুনি?'

'আমার ধারণা সেজন্যে তোমার নিজস্ব যুক্তি আছে।'

'আছে বইকি! যুক্তিগুলো খুবই ভালো।'

বিস্ময়ে বিহ্বল করা একটি মুহূর্ত কেটে যায়। জো আর হেস্টার কতো দীর্ঘ দিন ধরে পরস্পরকে কতো ভালো করে জানে। আর এখন তাদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, কি অবস্থা!

'কিন্তু তুই কেন অমন করলি, হেস্টার?' নিজস্ব নির্দোষ শ্বাস-বন্ধ-করা ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো হেনরয়েটা।

'কি করেছি?'

গলি থেকে মোটর গাড়ির ভেঁপু শোনা যায়।

'ওই, ওরা আমায় ডাকছে! আমি চলি।' কোটটা গায়ে জড়িয়ে দৃঢ় সংকল্পের ভঙ্গিতে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় হেনরিয়েটা।

'তুই গেলে আমিও তোর সঙ্গে যাবো,' হেস্টার জানায়।

'কিন্তু কেন?' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে হেনরিয়েটা। মোটরের ভেঁপু ফের বেজে ওঠে। দরজা খুলে বাইরের দিকে ও চড়া গলায় বলে, 'আধ মিনিট!' তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে ফের একরাশ বিস্ময় নিয়ে হেস্টারের দিকে ঘুরে তাকায়।

'কিন্তু কেন, হেস্টার?'

বিরক্তিতে হেস্টারের দৃষ্টি প্রায় তির্যক হয়ে উঠেছে। কাঠের মতো অভিব্যক্তিহীন অথচ ক্রুদ্ধ জো-র দিকে একটি বারের জন্যেও তাকাতে ইচ্ছে করছিলো না ওর।

'কেন?'

'কেন?' হেস্টারের প্রশ্নটার কোমল পুনরাবৃত্তি শোনা যায়।

সমস্ত আগ্রহ এখন হেস্টারের দিকে কেন্দ্রস্থ, কিন্তু হেস্টার যেন একখানা

পাতা-সেলাই-করে রাখা বই।

'কেন?'

'কেন, তা ও নিজেও জানে না,' ফাঁক দেখে জো বললো।

সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ, অতি নাটকীয় হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো হেস্টার।

'জানে না!' আচমকা প্রচণ্ড রাগে ওর মুখখানা ফেটে পড়লো, 'তাহলে তুমি জানতে চাইলে শোনো, তোমার ওই প্রেম নিবেদনের ঢং আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।'

হেনরিয়েটার হাতটা দরজার হাতল থেকে খসে পড়ে। দুর্বলের মতো একটা কুর্সিতে ঝুপ করে বসে পড়ে ও।

সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপারটা এখন একেবারে চরমতম বিশ্রী পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। জো-র মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠে আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হতে হতে হলদে হয়ে উঠলো।

হেনরিয়েটা কেমন যেন ফাঁকা গলায় বললো, 'তাহলে তুই তো ওকে বিয়ে করতে পারবি না!'

'ও যদি আমার সঙ্গে অমনিভাবে 'প্রেমে পড়ে' থাকে, তাহলে সম্ভবত পারবো না, বিশেষ শব্দ দুটো প্রায় ব্যঙ্গের সুরে একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করলো হেস্টার।

'কিন্তু ও যদি তোর প্রেমে না পড়ে, তাহলেও তো ওকে তুই বিয়ে করতে পারিস না,' শুভাকাঙ্ক্ষী দেবদূতের মতো হেনরিয়েটা বললো।

'কেন পারবো না?' হেস্টার চিৎকার করে উঠলো, 'যদ্দিন ও আমাকে প্রেম নিবেদন করেনি, তদ্দিন অব্দি আমি ওকে দিব্যি সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এখন ও সেসব প্রশ্নের বাইরে।'

'কিন্তু হেস্টার, কোনো পুরুষ মানুষ যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়, তারই প্রেমে পড়বে—এটা ধরে নেওয়া হয়,' খানিকক্ষণ নীরবতার পর হেনরিয়েটার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'আমার বক্তব্য, সে ক্ষেত্রে প্রেমটা সে বরং তার নিজের মধ্যেই পুষে রাখুক।'

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। জো আগের মতোই নিশ্চুপ। তাকে দেখে আগের চাইতেও কাঠকাঠ আর ভেড়ার মতো রাগী বলে মনে হয়।

'কিন্তু হেস্টার, কোনো একটি পুরুষকে তো তোর প্রেমে পড়তেই হবে—তাই নয় কি?'

'আমার সঙ্গে না! তোকে তো আর ওসব সহ্য করতে হয়নি, তাহলে

বুঝতিস।'

'তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করতে পারছো না, এটা স্পষ্ট।' অসহায়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো হেনরিয়েটা। 'ইস, কি প্রচণ্ড দুঃখের কথা।'

ফের নীরবতা।

'একটা পুরুষ মানুষ তোর সঙ্গে প্রেম করছে, এর চাইতে অপমানকর আর কিছু হতে পারে না।' হেস্টার বললো, 'আমি সেটাকে ঘেন্না করি।'

'তার কারণ, হয়তো জো তোর সঠিক মানুষটি নয়,' বেদনার্ত চোখে জো-র দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো হেনরিয়েটা।

'কোনো পুরুষেরই ও সমস্ত কাণ্ড আমি সহ্য করতে পারবো বলে মনে হয় না। কেউ আদর করলে, জাপটে ধরলে কেমন লাগে—তা কি তুই জানিস? জঘন্য, বিশ্রী, বোকা বোকা।'

'হ্যাঁ!' হেনরিয়েটা বিষণ্ণ স্বরে বলে, 'তখন নিজেকে মনে হয় যেন অমূল্য এক টুকরো মাংস, আর কুকুরটা গপ করে গিলে ফেলার আগে যেন সেটাকে আলতো করে চাটছে। স্বীকার করছি, ব্যাপারটা একটু বিরক্তিকর।'

'আরও বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, একটা নিখুঁত ভদ্রলোকও ঘুরে ফিরে ওই একই পথ ধরবে। প্রেমে পড়া পুরুষ মানুষের মতো ভয়ংকর জীব আর কিছু নেই।'

'তুই কি বলতে চাইছিস আমি বুঝেছি, হেস্টার।' হেনরিয়েটা দুঃখিত স্বরে বলে, 'এমন কুকুরের মতো স্বভাব ওদের!'

মোটর গাড়ি থেকে ধৈর্যহীন ভেঁপু শোনা গেলো। ব্যর্থকাম পোর্শিয়ার মতো উঠে দাঁড়ালো হেনরিয়েটা। তারপর দরজাটা খুলে আচমকা বাইরের দিকে চিৎকার করে বললো, 'তোমরা আমাকে ছাড়াই চলে যাও। আমি হেঁটে যাবো। অপেক্ষা কোরো না।'

'তোমার কতোক্ষণ দেরী হবে?' একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

জানি না। যাবার ইচ্ছে হলে, আমি হেঁটে যাবো।'

'তাহলে ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা তোমাকে তুলে নেবার জন্যে ফিরে আসবো।'

'ঠিক আছে,' দূরের মুখগুলোর উদ্দেশ্যে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলো হেনরিয়েটা। তারপর বিষণ্ণ মুখে নিশ্চুপ হয়ে বসলো। নির্বোধ জো একটা গাড়োলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু হেনরিয়েটা হেস্টারের পক্ষ নিয়েই লড়বে।

ওরা শব্দ শুনে বুঝলো, গাড়িটা গলি দিয়ে চলে গেলো।

'পুরুষ মানুষ একেবারে বীভৎস!' বিষণ্ণ স্বরেই বললো হেনরিয়েটা।

'কিন্তু তুমি ভুল করেছো,' আচমকা বিদ্বেষের ভঙ্গিতে হেস্টারকে বললো জো। 'আমি তোমার প্রেমে পড়িনি, মিস ক্লেভার।'

মেয়ে দুটি এমনভাবে জো-র দিকে তাকালো, যেন সে নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়া ল্যাজারাস।

'আমি কোনোদিনই সেভাবে তোমার প্রেমে পড়িনি,' কথা কটি জুড়ে দিলো জো। তার বাদামি চোখ দুটোতে আত্মসচেতনতার লজ্জা, রাগ এবং নগ্ন বাসনার এক আশ্চর্য আগুন।

'তাহলে তুমি একটি প্রচণ্ড মিথ্যুক। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো হেস্টার।

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে তুমি ওসবের অভিনয় করেছো?' তিক্ত স্বরে প্রশ্ন করলো হেনরিয়েটা।

'আমি ভেবেছিলাম, ও আমার কাছে ওসবই আশা করে।' জো-র বিশ্রী হাসিটা মেয়ে দুটিকে যেন পঙ্গু করে তোলে। জো একটা বিশাল অজগর হয়ে উঠলেও ওরা এর চাইতে বেশি অবাক হতো না। কি বিশ্রী অবজ্ঞার হাসি। আর এই কিনা ওদের জো, সেই সুন্দর-স্ব ভাবের জো!

'আমি মনে করেছিলাম, আমার কাছ থেকে ওসবই আশা করা হয়,' বিদ্রূপের হাসি হেসে জো ফের বললো।

হেস্টার আতংকিত হয়ে উঠলো।

'তুমি অমন একটা পশুর মতো কাজ করতে পারলে!' চিৎকার করে জো-কে বললো হেনরিয়েটা।

'কি ভয়ংকর মিথ্যে।' হেস্টার উঁচু গলায় বললো, 'ওর তা ভালোও লাগতো।'

'তোর কি তাই মনে হয়, হেস্টার?' হেনরিয়েটার প্রশ্ন।

'একদিক দিয়ে ভালো লাগতো বইকি!' জো বেহায়ার মতো বললো। 'তবে কিনা যদি বুঝতাম যে ওর ভালো লাগছে না, তাহলে আমিও ভালো লাগাতাম না।'

'হেনরিয়েটা,' হেস্টার দু হাত ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা কেন ওকে খুন করে ফেলতে পারছি না?'

'পারলে ভালোই হতো,' জবাব দিলো হেনরিয়েটা।

'যখন তুমি জানো যে মেয়েটির স্বভাব খানিকটা সংরক্ষণশীল এবং

সেজন্তেই ওকে তোমার ভালো লাগে, যখন জানো যে মাসখানেকের মধ্যে তোমাদের বিয়ে হচ্ছে না এবং মাঝখানকার এই সময়টা যেমন করেই হোক তোমাকে কাটিয়ে দিতে হবে—তখন এ ছাড়া তুমি আর কি করবে বলো? রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনোই বা তোমার জন্তে এ ছাড়া আর কি করতেন? তুমি তাঁকে পছন্দ করো…'

'সে মারা গেছে, সোনা! কিন্তু আমি সত্যিই তাকে ঘৃণা করি,' হেস্টার বললো।

'তোমাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না,' জো বললো।

'সে যাই হোক, তুমি রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনো নও এবং তার ভূমিকায় তোমাকে আমার অপছন্দ।'

'আর কোনো সুযোগ তুমি পাচ্ছো না। তোমাকে আমার পুরোপুরিই অপছন্দ।'

'কথাটা শুনে আমি চরম স্বস্তি পেলাম, বাছা।'

বেশ খানিকক্ষণ স্তব্ধতার পর হেনরিয়েটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন 'বেশ! হেস্টার, তুই কি তাহলে আমার সঙ্গে বনামির ওখানে যাচ্ছিস? নাকি আমিই তোর সঙ্গে এখানে থাকবো?'

'কোনোটাতেই আমার কিছু এসে যায় না', হেস্টার বাহাদুরি দেখালো।

'তুমি কি করো বা না করো, তাতে আমারও কিছু এসে যায় না।' জো বললো, 'তবে তোমার মনের কথাটা প্রথমেই আমায় না জানানোকে, আমি জঘন্য ব্যাপার বলি।'

'আমি তখন ভেবেছিলাম, তুমি সত্যি সত্যিই ওসব করছো, ওগুলো অভিনয় নয়। তাই আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি।' হেস্টার বললো।

'তোমাকে দেখে অবিশ্যি মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই আমাকে আঘাত দিতে চাওনি।'

'যাকগে,' হেস্টার বললো 'সবটাই যখন অভিনয় ছিলো, তখন ওতে কিছু এসে যায়নি।'

'আমিও তা-ই বলি।'

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। ওদের সংসারের জন্তে আনা ঘড়িটা যেন খানিকটা দ্রুত লয়েই টিক টিক করতে থাকে।

'যাই হোক,' জো বললো, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে পথে বসালে।'

'না।' হেস্টার উঁচু গলায় বললো, 'তুমি আমাকে জয় করার জন্তেই ওসব

করেছিলে বলে আমার ভালোই লাগছে।'

জো সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালো। পরস্পরকে কতো ভালো করে চেনে ওরা! কেন সে ওর সঙ্গে অমন বোকার মতো প্রেম-প্রেম খেলতে চেষ্টা করছিলো?' সেটা যে ওদের সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে এখন অনুতপ্ত হলো জো।

আর হেস্টার দেখলো জো-র চোখ দুটিতে ওর প্রতি অকপট, ধৈর্যময় ভালোবাসা আর এক আশ্চর্য, শান্ত, নিবিড় বাসনা। যৌবনে যন্ত্রণা পাওয়া কোনো যুবকের মধ্যে ওই শান্ত, ধৈর্যময়, নিবিড় বাসনা এই প্রথম লক্ষ্য করলো হেস্টার। ওর হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেলো। হেস্টার অনুভব করলো, জো-র আহ্বানে ওর প্রাণে সাড়া জেগেছে।

'কি রে, তুই কি ঠিক করলি—হেস্টার?' হেনরিয়েটা জানতে চাইলো।

যাক গে, যা হবার হয়েছে,' হেস্টার জবাব দিলো, 'আমি জোর সঙ্গেই থাকবো।'

'খুবই ভালো কথা। আর আমিও বনামির ওখানে যাবো।'

হেনরিয়েটা নিঃশব্দে দরজা খুলে চলে গেলো।

পরস্পরের থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জো আর হেস্টার একে অন্যের দিকে তাকালো।

'আমি দুঃখিত, হেস্টার,' জো বললো।

'শোনো জো,' হেস্টার জবাব দিলো, 'তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালোবাসো তাহলে তুমি যা ই করো না কেন, তাতে আমি কিছু মনে করি নে।'

---

* In Love.

গোলাপ বাগিচায় ছায়া

.ছাটখাটো চেহারার একটি তরুণ সমুদ্র সৈকতে সুন্দর একটা কুটিরের জানলার কাছে বসে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো যে সে খবরের কাগজটা পড়ছে। সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। বাইরে সকালের রোদে অপরূপ গোলাপগুলো আগুন উস্কে-দেওয়া ছোটো ছোটো পাত্রের মতো ডালে ডালে ঝুলে রয়েছে। ছেলেটি টেবিল থেকে দেয়াল-ঘড়ি, তারপর নিজের বড়সড় রূপোর ঘড়িটার দিকে তাকালো। কঠোর ধৈর্যের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার মুখখানিতে। তারপর উঠে ঘরের দেয়ালে টাঙানো তেলরঙে-আঁকা ছবিগুলো দেখতে লাগলো, সযত্ন অথচ বিরূপ মানসিকতা নিয়ে দেখলো 'কোণ-ঠাসা হরিণ' কে। পিয়ানোর ডালাটা খোলার চেষ্টা করে দেখলো, সেটা চাবি-বন্ধ। তারপর ছোট্ট একটা আর্শিতে নিজের মুখখানা দেখতে পেয়ে বাদামি রঙের গোঁফজোড়ায় একটু তা দিয়ে নিলো—তৎপর আগ্রহ ফুটে উঠলো তার চোখ দুটিতে। দেখতে সে কুৎসিত নয়। গোঁফজোড়ায় ফের পাক দিলো ছেলেটি। চেহারাটা একটু বেঁটেখাটো বটে, কিন্তু দিব্যি তৎপর আর প্রাণশক্তিতে ভরা। সমবেদনার সঙ্গে পরিতৃপ্তি মেশানো দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকিয়ে আর্শি থেকে মুখ ফেরালো সে।

সচেষ্ট প্রয়াসে নিজেকে সামলে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এলো ছেলেটি। তার কোটটা অবিশ্যি দেখতে মলিন নয়। শরীরটা যেমন মজবুত কোটটাও তেমনি নতুন, ফিটফাট আর মানানসই। উঠোনের ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো পাশের গাছটার দিকে। বাদামি-লাল-রঙা ফলে বোঝাই বেঁকে থাকা আপেল গাছটা আরও প্রতিশ্রুতিময়। ঘুরে ফিরে দেখে, একটা আপেল ছিঁড়ে নিলো ছেলেটি। তারপর বাড়ির দিকে পেছন ফিরে ফলটাতে একটা নিখুঁত তীক্ষ্ণ কামড় বসিয়ে দিলো। অবাক হয়ে সে দেখলো, ফলটা মিষ্টি। ফের একটা কামড় দিলো সে। তারপর বাগানের দিকে খুলে রাখা শোবার ঘরের জানলাগুলো দেখার জন্যে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো সে। কিন্তু মেয়েটি আসলে তারই স্ত্রী, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, স্বামীকে ও লক্ষ্যই করেনি।

দু-এক মুহূর্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে লক্ষ্য করলো ছেলেটি। মেয়েটি সুশ্রী, দেখে মনে হয় ছেলেটির চাইতে বয়সে খানিকটা বড়ো, একটু ফ্যাকাসে, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী, মুখভরা আকুলতা। মাথার ঘন, সোনালি চুলগুলো থাকে-থাকে কপালের ওপরে লুটিয়ে রয়েছে। স্বামী এবং তার জগৎ থেকে ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে দূর-সমুদ্রের দিকে। ওর এই ধারাবাহিক তন্ময়তা এবং স্বামীর উপস্থিতি সম্পর্কে উদাসীনতা ছেলেটিকে বিরক্ত করে তোলে— কয়েকটা পপি ফল ছিঁড়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে দেয় জানলার দিকে। মেয়েটি চমকে ওঠে, খুশিয়াল হাসি নিয়ে তার দিকে তাকায়, তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রায় তক্ষুণি জানলা ছেড়ে চলে যায়। ওর পরনে সাদা নরম মসলিনের পোশাক, চলার ভঙ্গিটিও সুন্দর—ভারি অহংকারী। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছেলেটিও বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

'আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' ছেলেটি বললো।

'আমার জন্যে, না কি সকালবেলার জলখাবারের জন্যে?' হালকা সুরে মেয়েটি বলে. 'তুমি তো জানো, আমরা সকাল নটায় জলখাবারের কথা বলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম পথের ধকলের পর তুমি হয়তো ততোক্ষণ অব্দি ঘুমোতে পারবে।'

'তুমি জানো, আমি চিরদিনই ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি এবং ছটার পর আর বিছানায় থাকতে পারি নে। এমন একটা সুন্দর সকালে বিছানায় পড়ে থাকা আর খনির গহ্বরে পড়ে থাকা— দুই-ই সমান।'

'এখানে এসেও তোমার খনির গহ্বরের কথা মনে হবে, আমি তা ভাবিনি।'

মেয়েটি এবারে ঘুরে ঘুরে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, পর্দায় ঢাকা আর্শির অলঙ্করণের দিকে তাকায়। ছেলেটি চুল্লির কাছে বেছানো কম্বলের ওপরে দাঁড়িয়ে খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে ওকে লক্ষ্য করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে প্রশ্রয় দেয়। ঘরটা পরীক্ষা করে কাঁধ ঝাঁকায় মেয়েটি। তারপর ছেলেটির হাত ধরে বলে, 'চলো, মিসেস কোটস খাবারের ট্রে না আনা অব্দি আমরা বাগানে গিয়ে বেড়াই।'

'আশা করি উনি শীগগিরি আসবেন,' ছেলেটি গোঁফে তা দিয়ে বলে। ছোট্ট করে হেসে ওঠে মেয়েটি, তারপর ছেলেটির হাতে শরীর এলিয়ে এগিয়ে চলে। ছেলেটি ততোক্ষণে তার তামাকের নলটা ধরিয়ে নিয়েছে।

ওরা যখন সিঁড়ি ভেঙে নামছে, মিসেস কোটস তখন ওদের ঘরে গিয়ে

ঢুকলেন। অতিথিদের একটু ভালো করে দেখার জন্যে ঋজু, মিষ্টি চেহারার বৃদ্ধা ত্রস্ত পায়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। নিচের পথ ধরে ওই তরুণ দম্পতির হেঁটে চলার দৃশ্য দেখে ওঁর স্বচ্ছ নীল চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্ত্রীর হাত ধরে স্বচ্ছন্দ, আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গিমায় হাঁটছে ছেলেটি। ইয়র্কশায়ারের টানে বৃদ্ধা নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'দুজনেই মাথায় সমান-সমান। নিজের চাইতে মাথায় খাটো হলে মেয়েটা কক্ষনো ওকে বিয়ে করতো না। অবিশ্যি ছেলেটা অন্য সব দিক দিয়ে মেয়েটার সমান নয় বলেই আমার মনে হয়।' ঠিক এমনি সময় বৃদ্ধার নাতনি ঘরে ঢুকে খাবারের ট্রে টা টেবিলে সাজিয়ে রাখলো।

'জানো আম্মা, ভদ্রলোক আপেল খাচ্ছিলেন,' বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বললো মেয়েটি।

'তাই নাকি, বাছা? তা খেয়ে যদি ও খুশি হয়, তো খাক না।'

বাইরে ছেলেটি তখন অধীর হয়ে পেয়ালার ঠুং-ঠাং শুনছিলো। অবশেষে হাঁফ ছেড়ে ওরা জলখাবার খেতে এলো। খানিকক্ষণ খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে ছেলেটি এক মুহূর্ত একটু বিশ্রাম নিয়ে বললো, 'তোমার কি মনে হয়, এ জায়গাটা ব্রিডলিংটনের চাইতে ভালো?'

'ভালো বইকি, অনেক বেশি ভালো!' মেয়েটি বলে, 'তা ছাড়া এ জায়গাটা আমার ভীষণ চেনা—সমুদ্র-সৈকতের কোনো অপরিচিত জায়গার মতো নয়।'

'এখানে তুমি কতোদিন ছিলে?'

'দু বছর।'

ছেলেটি চিন্তা করতে করতে খেতে থাকে। এবং অবশেষে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বরঞ্চ কোনো নতুন জায়গায় যেতে চাইবে।'

মেয়েটি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। তারপর ছেলেটির মনের কথা বুঝে নেবার উদ্দেশ্যে সন্তর্পণে প্রশ্ন করে, 'কেন? তোমার কি মনে হয় এখানে আমার ভালো লাগবে না?'

ছেলেটি রুটির ওপরে পুরু করে মার্মালেড লাগাতে লাগাতে খোলা গলায় হেসে ওঠে, 'আমি সেই আশাই করছি!'

মেয়েটি ফের ছেলেটিকে উপেক্ষা করে বলে, 'শোনো ফ্র্যাংক, এ গ্রামে কাউকে কিন্তু ও ব্যাপারে কিছু বোলো না। আমি কে, বা আমি যে এখানেই থাকতাম—তা কক্ষনো বলবে না। এখানে বিশেষ করে কারুর সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই নে। ওরা যদি ফের আমাকে চিনে ফেলে, তাহলে আমরা

কিন্তু কিছুতেই সহজ হতে পারবো না।'

'তাহলে এখানে এলে কেন?'

'কেন? কেন তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?'

'যদি কারুর সঙ্গেই দেখা করতে না চাও, তাহলে সত্যিই আমি তা বুঝতে পারছি না।'

'আমি এ জায়গাটাকে দেখতে এসেছি, এখানকার লোকগুলোকে নয়।'

ফ্র্যাংক আর কথা বাড়ায় না।

'মেয়েরা পুরুষ মানুষদের চাইতে আলাদা,' মেয়েটি ফের বলে। 'জানি না কেন আমি এখানে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু তবু এলাম।'

সাগ্রহে ফ্র্যাংককে আর এক পেয়ালা কফি ঢেলে দিয়ে মেয়েটি আবার বলতে শুরু করে, 'শুধু এ গ্রামে আমার সম্পর্কে তুমি কাউকে কিছু বোলো না।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিমায় সামান্য একটু হাসে ও, তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিল-ঢাকার ওপর থেকে রুটির গুঁড়োগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে, আমি চাই না, আমার অতীত আমার বর্তমানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াক।'

কফি খেতে খেতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্র্যাংক। তারপর গোঁফজোড়া একটু চেটে নিয়ে, পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিদ্রূপের স্বরে বলে, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, তোমার অতীত জীবনে অনেক কিছুই ঘটেছে।'

মেয়েটি মাথা নিচু করে খানিকটা অপরাধীর ভঙ্গিমায় টেবিল-ঢাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই দেখে যেন খানিকটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে ফ্র্যাংক।

'এই শোনো,' মেয়েটি আদুরে গলায় বলে, 'তুমি আমার পরিচয়টা কাউকে বলে দেবে না তো?'

'না, বলবো না,' ওকে আশ্বাস জানিয়ে ফ্র্যাংক হেসে ওঠে। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে তার।

মেয়েটি তবু নিশ্চুপ হয়ে থাকে। দু-এক মুহূর্ত পরে মাথা তুলে বলে, 'মিসেস কোটসের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত শেষ করে, আমাকে আরও অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। কাজেই আজকের সকালটা তুমি বরং একা একাই ঘুরে এসো গে। বেলা একটার সময় দুপুরের খাওয়াটা আমরা একসঙ্গে খাবো।'

'কিন্তু মিসেস কোটসের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকা করতে তোমার নিশ্চয়ই সারাটা সকাল লাগবে না?'

'না—মানে, তারপর আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে, আমার স্কার্ট

থেকে ওই দাগটা তুলতে হবে। সকালে আমার ছোটখাটো অসংখ্য কাজ। তুমি বরং একাই বেড়িয়ে এসো।'

ফ্র্যাংক অনুভব করলো, মেয়েটি তাকে এড়াতে চাইছে। তাই ও ওপরে চলে যেতেই সে রাগ চেপে নিজের টুপিটা নিয়ে উঁচু পাহাড়গুলোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

একটু বাদে মেয়েটিও বেরিয়ে এলো। ওর মাথায় গোলাপ-লাগানো টুপি, পরনে সাদা পোশাকের ওপরে লম্বা একটা লেসের স্কার্ফ। যেন খানিকটা ভয়ে ভয়েই ও ছাতাটা খুলে ধরলো, রঙিন ছায়ায় আড়াল হয়ে গেলো ওর মুখের আধখানা। জেলেদের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর বাঁধানো সরু পথটা ধরে এগিয়ে চললো ও। মনে হচ্ছিলো যেন নিজের পারিপার্শিকতাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে মেয়েটি, যেন নিজের ছাতার ছোট্ট আড়ালটুকুতেই ও নিরাপদ বলে মনে করছে নিজেকে।

গির্জা পেরিয়ে গলি ধরে পথের পাশে উঁচু পাঁচিলটা অব্দি এগিয়ে গেলো মেয়েটি। তারপর পায়ে পায়ে অন্ধকার দেয়ালের মাঝে আলোর ছবির মতো ঝলসে ওঠা খোলা দরজাটার অদূরে থমকে দাঁড়ালো। দরজার ওধারে এক আশ্চর্য জাদুর রাজ্য। নীল-সাদা সমুদ্র-উপলে বাঁধানো রোদে ভরা অঙ্গনটুকুতে আলো-ছায়ার বিচিত্র নকশা। তার ওধারে ঝলমলে এক টুকরো সবুজ জমি, সেখানে ঝিকমিক করছে একটা বে-গাছের প্রান্তভাগ। ছায়া-ঢাকা বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে মেয়েটি অঙ্গনটাতে গিয়ে দাড়ালো। পর্দাবিহীন জানলাগুলো যেন বিষণ্ণ আর প্রাণহীন, রান্নাঘরের দরজাটাও সপাটে খোলা। অস্থির সংকল্প নিয়ে এক পা এগিয়ে যায় মেয়েটি, তারপর আর এক পা—নিবিড় আকুলতা নিয়ে ও এগিয়ে চলে দূরের বাগানটার দিকে।

মেয়েটি বাড়িটার প্রায় কোণ বরাবর পৌঁছতেই গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একজোড়া ভারি, মচমচে পায়ের শব্দ শোনা যায়—একজন মালি ওর সামনে এগিয়ে আসে। তার হাতে একটা বেতের ট্রে, তাতে অতিরিক্ত পাকা কতকগুলি বড়ো বড়ো লাল টুকটুকে গুজবেরি গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'আজ বাগান খোলা নেই,' পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললো লোকটা।

মেয়েটি তখন ফিরে যাবার জন্যে প্রায় প্রস্তুত। মুহূর্তের জন্যে ও বিস্ময়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। এ বাগান সাধারণের সম্পত্তি হয় কি করে?

'কখন খোলা থাকে?' দ্রুত প্রশ্ন করে ও।

'পাদ্রী সাহেব শুক্রুর আর মঙ্গলবার দিন এখানে সবাইকে ঢুকতে দেন।'

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে মেয়েটি। ভাবতেই অবাক লাগে, গির্জার পাদ্রী সর্বসাধারণের জন্যে তাঁর বাগানটা খুলে দিচ্ছেন!

'কিন্তু সবাই তো এখন গির্জায়,' মেয়েটি মিষ্টি কথায় মালির মন ভেজাতে চেষ্টা করে। 'এখন কেউ এখানে আসবে না, তাই নয় কি?'

লোকটা একটু এগোয়, বড়ো বড়ো গুজবেরিগুলো ফের গড়াগড়ি খায়। বলে, 'পাদ্রী সাহেব এখন নতুন বাড়িতে থাকেন।'

দুজনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটিকে চলে যাবার কথা বলতে ইচ্ছে করে না মালির। অবশেষে মন-ভোলানো হাসি নিয়ে ফিরে তাকায় মেয়েটি।

'আমি একবারটি গোলাপগুলোকে একটু উঁকি মেরে দেখে আসতে পারি?' ইচ্ছে করেই মিষ্টি করে কথাটা বলে ও।

'তাতে কিছু এসে যাবে বলে মনে হয় না,' লোকটা এক পাশে সরে দাঁড়ায়, 'আপনি তো আর বেশিক্ষণ থাকছেন না—'

মুহূর্তের মধ্যে মালির কথা ভুলে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় মেয়েটি। ওর মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, চলার ভঙ্গিতে নিবিড় ব্যাকুলতা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ও দেখতে পায়, বাগানের দিকে সব কটা জানলাই পর্দাবিহীন আর অন্ধকার। বাড়িটার কেমন যেন একটা বন্ধ্যা চেহারা। মনে হয় যেন এখনও এটা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কেউ এখানে থাকে না। মেয়েটির ওপর দিয়ে যেন একটা ছায়া সরে যায়। টকটকে লাল ফুলের একটা রঙিন খিলানের তলা দিয়ে ঘাস-জমিটা পেরিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে যায় ও। দূরে সকালের কুয়াশায় আবছা হালকা-নীল সমুদ্র। আরও দূরে আকাশ আর সমুদ্রের দুই নীলিমার মাঝখানে কালো-পাহাড়-চূড়ার অস্পষ্ট রেখা। আনন্দ আর বেদনায় রূপান্তরিত হয়ে মেয়েটির মুখখানা ফের ঝলমলে হয়ে উঠতে শুরু করে। ওর পায়ের কাছে বাগানটা অজস্র ফুলের সমারোহ নিয়ে খাড়া ভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। আরও নিচে শুধু কৃষ্ণচূড়ার অন্ধকার।

নিজের চারধারে, উজ্জ্বল ফুলে ভরা বাগানটার দিকে তাকালো মেয়েটি। কোথায় এক কোণে একটা ইউ-গাছের তলায় একটা বসার জায়গা আছে, ও তা জানে। ও জানে, একটা বিশেষ চত্বরে সব চাইতে সেরা ফুলগুলোকে রাখা হয়। এখান থেকেই বাগানের দু ধার দিয়ে দুটো পথ নিচের দিকে নেমে গেছে।

ছাতাটা বন্ধ করে অজস্র ফুলের মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে এগুতে থাকে মেয়েটি। চারদিকে শুধু গোলাপের ঝাড়, গোলাপের আল, থামের গা থেকে উপছে পড়ছে গোলাপ, কিংবা ঝোপের ভুলাদণ্ডে ফুটে রয়েছে সুষম গোলাপ। তা ছাড়া খোলা জমিতে আরও অজস্র ফুল। মেয়েটি মাথা তুলে তাকাতেই চোখে পড়ে দূরের সমুদ্র আর অন্তরীপটা।

ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে, অতীতে ফিরে যাওয়া মানুষের মতো একটা পথ ধরে নামতে থাকে মেয়েটি। মা যেমন করে মাঝে-মধ্যে সন্তানের হাতে সোহাগের হাত বুলিয়ে দেন, মেয়েটি তেমনি করে এক সময় আচমকা নিজের অজান্তে মখমলের মতো নরম কতকগুলো গাঢ় লাল-রঙা গোলাপকে স্পর্শ করে। ওদের সুগন্ধ গ্রহণ করার জন্যে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে চলে অন্যমনে। গন্ধহীন, আগুন-রঙা একটা গোলাপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ—যেন বুঝতে পারে না, কি অর্থ এর। আবার উপছে-ওঠা একরাশ গোলাপি পাপড়ি ওকে ফের ভরিয়ে তোলে কোমল অন্তরঙ্গতায়। ও ঘুরে বেড়ায় বাগানের মাঝখানে বরফের মতো সবুজের আভা-লাগা শ্বেত গোলাপগুলোর কাছে। তারপর সবশেষে একটা করুণ শ্বেত প্রজাপতির মতো পথ ধরে নেমে আস্তে আস্তে নেমে আসে গোলাপ-ভরা একটা ছোট্ট চত্বরে। রাশি রাশি ঝলমলে খুশিয়াল গোলাপ জায়গাটাকে যেন সম্পূর্ণ ভরিয়ে রেখেছে। ওরা এতো অজস্র আর এতো ঝলমলে যে ওদের দেখে লজ্জা লাগে মেয়েটির। ওরা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। মেয়েটির মনে হয়, ও যেন একরাশ অপরিচিত মানুষের মাঝখানে এসে পড়েছে। আনন্দে ও অধীর হয়ে ওঠে, নিজের ভেতর থেকে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। উত্তেজনায় রাঙা হয়ে ওঠে ও। এখানে বাতাসও যেন অকৃত্রিম সুরভীতে ভরা।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে শ্বেত গোলাপগুলোর মাঝখানে ছোট্ট একটা আসনে বসে পড়ে মেয়েটি। ওর টুকটুকে লাল ছাতাটা অনেক রঙ শুষে নিয়েছে। নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে ও। অনুভব করে, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে আসছে। ও নিজেও একটা গোলাপ বই অন্য কিছু নয়— যে গোলাপ ফোটার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উৎসুক হয়েই রইলো, কিন্তু কোনদিনই সম্পূর্ণ হয়ে ফুটতে পারলো না। একটা ছোট্ট মাছি ওর হাঁটুর ওপরে সাদা পোশাকটাতে এসে বসলো। মেয়েটির মনে হলো, মাছিটা যেন একটা গোলাপের ওপরে এসে বসেছে। ও যেন আর ও নেই।

একটা ছায়া গায়ের ওপর দিয়ে সরে যেতেই মেয়েটি নির্মমভাবে চমকে

উঠলো। তারপরেই লোকটাকে দেখতে পেলো ও। লোকটার পায়ে চটি ছিলো বলে মেয়েটি তার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। লোকটার গায়ে লিনেনের কোট। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলো সমস্তটা সকাল, উধাও হয়ে গেলো সবটুকু আচ্ছন্নতাবোধ। মেয়েটির একমাত্র আশংকা, যদি ওকে কোনো জবাবদিহি দিতে হয়। লোকটা এগিয়ে এলো, উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। কিন্তু লোকটাকে দেখেই ওর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে উঠলো, ফের বসে পড়লো ও।

লোকটা বয়সে যুবক, ফৌজি জওয়ানের মতো চেহারা—একটু ভারিক্কি হয়ে উঠছে। কুচকুচে কালো চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, গোঁফে মোম পালিশ। কিন্তু চলন ভঙ্গিমা কেমন যেন এলোমেলো। মেয়েটির ঠোঁট অব্দি ততোক্ষণে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। মুখ তুলে মানুষটার চোখের দিকে তাকায় ও। লোকটার চোখ দুটি কালো, কিন্তু দৃষ্টিতে অসীম শূন্যতা। যেন মানুষের চোখ নয়। মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসে সে।

অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে মাথা নুইয়ে ওকে অভিবাদন জানায় মানুষটা, তারপর ওর পাশে এসে বসে। বেঞ্চিতে একটু নড়ে-চড়ে, পা দুটো এধার-ওধার করে সে প্রশ্ন করে, 'আমি আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?' ভদ্র অথচ সৈনিকদের মতো কণ্ঠস্বর মানুষটার।

মেয়েটি নির্বাক, নিরুপায়। গাঢ় রঙের পোশাক আর লিনেনের কোটে মানুষটার বেশবাস একেবারে নিখুঁত। মেয়েটি নড়াচড়াও করতে পারছিলো না। মানুষটার হাত দুটি দেখে ওর মনে হচ্ছিলো, ও বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওই হাতের কড়ে আঙুলে পরে থাকা আঙটিটা ওর বড্ড বেশি চেনা। সমস্ত পৃথিবীটা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে। অসহায় হয়ে বসে থাকে ও। কারণ সবল উরুর ওপরে রাখা মানুষটার হাত দুখানি ওকে আতংকে ভরিয়ে তুলছিলো—অথচ একদিন ওই হাত দুটিই ওর কাছে ছিলো উদ্দাম প্রেমের প্রতীক।

ধূমপান করতে পারি?' নিজের পকেটে হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে, প্রায় চুপিচুপি প্রশ্ন করে মানুষটা।

মেয়েটি কোন জবাব দিতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছুই এসে-যায় না, কারণ মানুষটা তখন অন্য এক জগতে। মেয়েটি আকুল হয়ে ভাবে, মানুষটা কি ওকে চিনতে পেরেছে—চিনতে কি পারবে? উদ্বেগে পাণ্ডুর হয়ে বসে থাকে ও। কিন্তু এ পরিস্থিতি ওকে সইতেই হবে।

'আমার কাছে আর তামাক নেই,' মানুষটা চিন্তিত সুরে বলে।

মানুষটার কথায় কান দেয় না মেয়েটি, শুধু লক্ষ্য করতে থাকে। লোকটা কি ওকে চিনতে পারবে, না কি সবই হারিয়ে গেছে এতোদিনে? হিমস্তব্ধ উদ্বেগ নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে ও।

'আমি জন কটন তামাক খাই,' লোকটা বললো। 'বড্ড দাম কিনা, তাই আমাকে বুঝেসুঝে খরচ করতে হয়। বুঝতেই পারছো, এই সব মামলা-মকদ্দমাগুলো চলছে বলে এখন আমার অবস্থাটা খুব একটা ভালো চলছে না।'

'না,' মেয়েটির বুকের ভেতরটা হিম, সমস্ত সত্তায় কাঠিন্য।

মানুষটা নড়ে-চড়ে অভিবাদনের মতো একটা ভঙ্গিমা করলো, তারপর উঠে চলে গেলো। স্থাণু হযে বসে রইলো মেয়েটি। তখনও মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছিলো ও—আঁটসাট গড়ন, সৈনিকের মতো মাথা, চেহারার সুন্দর বাঁধন এখন একটু ঢিলেঢালা। একদিন ওই শরীরটাকে প্রাণের সবটুকু আবেগ-উন্মাদনা দিয়ে ভালোবেসেছিলো মেযেটি। কিন্তু এখন মানুষটা আর সেই মানুষ নেই। এখন মানুষটার চেহারা ওকে এক নাম-না জানা দুর্বোধ আতংকে ভরিয়ে তুলছে।

আচমকা কোটের পকেটে হাত দিয়ে আবাব ফিরে আসে মানুযটা।

'আমি একটু ধূমপান করলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?' লোকটা বলে, 'ধূমপান করলে আমি হয়তো সবকিছু আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো।'

ফের মেযেটির পাশে বসে তামাকের নলে তামাক ভরতে থাকে মানুষটা। তার হাত দুটি আর সুন্দর সবল আঙুলগুলোকে লক্ষ্য করে মেয়েটি। আঙুলগুলো বরাবরই সামান্য কাঁপতো। এমন একটা স্বাস্থ্যবান মানুষের এ ধরনের দুর্বলতা দীর্ঘদিন আগেই মেয়েটিকে বিস্মিত করে তুলছিলো। এখন আঙুলগুলো আরও এলোমেলোভাবে কাঁপছে, তামাকগুলো ঝুলে পড়ছে নলটা থেকে।

'আমাকে মামলা-মকদ্দমার ব্যাপারগুলো দেখাশুনো করতে হবে। আইনের ব্যাপারটা সব সময়েই বড়ো অনিশ্চিত। আমি যেমনটি চাই উকিলকে ঠিব তেমনি করেই বুঝিয়ে বলি, কিন্তু কিছুতেই সেভাবে কাজ তোলাতে পারি না।'

মেয়েটি বসে বসে মানুষটার কথা শোনে। কিন্তু এ মানুষ সে মানুষ নয়। একদিন ওই হাত দুটিতে ও চুমু খেয়েছে, ওই আশ্চর্য উজ্জ্বল কালো চোখ দুটিকেই ও ভালোবেসেছে। অথচ এ সে নয়। আতংকে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে ও। মানুষটার হাত থেকে তামাকের থলেটা মাটিতে খসে পড়ে, হাতড়ে হাতড়ে সেটাকে খুঁজতে থাকে মানুষটা। তবু মেয়েটি অপেক্ষা করে থাকে,

দেখতে চায় মানুষটা ওকে চিনতে পারে কি না। কিন্তু কেন ও চলে যেতে পারে না।

'আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে,' মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়ায় মানুষটা, 'প্যাঁচা আসছে।' গোপন কথা জানাবার ভঙ্গিতে বলে, 'আসলে লোকটার নাম কিন্তু প্যাঁচা নয় কিন্তু আমি ওকে ওই নামেই ডাকি। যাই, দেখি ও এলো কি না।'

মেয়েটিও উঠে দাঁড়ায়। অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় ওর মুখোমুখি দাঁড়ায় মানুষটা। সুদর্শন, সৈনিক-পুরুষের মতো চেহারা—কিন্তু উন্মাদ। মেয়েটির চোখ দুটি মানুষটাকে খুঁজে খুঁজে মরে, দেখতে চায় মানুষটা ওকে চিনতে পারে কি ন, মানুষটাকে ও আবিষ্কার করতে পারে কি না।

'তুমি আমাকে চেনো না?' নিঃসঙ্গ মেয়েটি প্রাণের সবটুকু আতংক নিয়ে প্রশ্ন করে।

পরিহাস মাখানো দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকায় মানুষট। উজ্জ্বল, কিন্তু বোধহীন দুটি চোখ। মেয়েটিকে সহ্য করতে হয় তা। মানুষট ওর আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসে।

হ্যাঁ, আমি চিনি তোমাকে,' অপলক দৃষ্টি আর একাগ্র ভঙ্গিমা মানুষটার। কিন্তু উন্মাদ। নিজের মুখটা মেয়েটির আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে সে। মেয়েটির আতঙ্ক আরও বেড়ে ওঠে। শক্তিমান উন্মাদটা ওর বড্ড কাছে এগিয়ে আসছে যে!

ইতিমধ্যে একটা লোক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে বলে, 'আজ সকালে বাগান খোলা নেই।'

উন্মাদ মানুষটা থমকে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকায়। লোকটা দারোয়ান, বেঞ্চির কাছে এগিয়ে গিয়ে সে পড়ে থাকা তামাকের থলেটা কুড়িয়ে নেয়।

'আপনার তামাকটা ফেলে যাবেন না, স্যার,' লিনেনের কোট পরা ভদ্রলোকটির কাছে জিনিসটা নিয়ে যায় সে।

'আমি এইমাত্র এই মহিলাকে দুপুরবেলা খেয়ে যেতে বলছিলাম,' মানুষটা মার্জিত সুরে বলে, 'উনি আমার এক বান্ধবী।'

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে অন্ধের মতো সেই রোদ-ঝলমলে গোলাপগুলোর মাঝখান দিয়ে, বাগান পেরিয়ে, উদাসী আর অন্ধকার জানলাওয়ালা বাড়িটার পাশ দিয়ে, সমুদ্র-উপলে বাঁধানো অঙ্গনের ভেতর দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। কোথায় যাবে তা না জেনেও নির্দ্বিধায় দ্রুত পায়ে অন্ধের মতো সামনের দিকে

এগিয়ে চলে ও। সোজা বাড়িতে পৌঁছে ওপর তলায় উঠে যায়, তারপর টুপিটা খুলে বিছানায় গিয়ে বসে। মনে হচ্ছিলো ওর ভেতরকার কোনো একটা সূক্ষ্ম ঝিল্লি বুঝি দু টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে—তাই কিছু চিন্তা করার মতো, অনুভব করার মতো সম্পূর্ণ সত্তা ওর আর নেই। জানলার বাইরে সমুদ্র-বাতাসে একটু একটু করে ওপরে নিচে দুলে দুলে ওঠা একটা আইভি লতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ও। বাতাসে সূর্যদীপ্ত সমুদ্রের অতিপ্রাকৃত দীপ্তির ছোঁয়া। সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে বসে থাকে মেয়েটি। ওর শুধু মনে হয়, হয়তো ও অসুস্থ—হয়তো ওর কোনো ছিন্ন অন্ত্র দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে অবিরাম। একেবারে অসাড় আর উদাসীন হয়ে বসে থাকে ও।

খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটি নিচের তলায় স্বামীর পায়ের শব্দ শুনতে পায়। নিজের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই মানুষটার গতিবিধির ধারা অনুভব করতে থাকে ও। শুনতে পায়, মানুষটার পায়ের শব্দ আবার বাইরে চলে গেলো। তারপর তার কণ্ঠস্বর, জবাব উৎফুল্ল হয়ে ওঠা। ভারি পায়ের শব্দটা এবারে এগিয়ে আসে।

খুশি খুশি রক্তিম মুখে ঘরে ঢুকলো লোকটা। সুগঠিত তৎপর চেহারায় আত্মপ্রসাদের আভাস। মেয়েটি কঠিন হয়ে মুখ ফেরাতেই সে থমকে দাঁড়ালো।

'কি হয়েছে?' লোকটার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতার সুর, 'শরীর ভালো লাগছে না?'

মেয়েটির কাছে এটাই অসহ্য অত্যাচার।

'ঠিকই আছি।' জবাব দেয় ও।

লোকটার বাদামি চোখ দুটো ক্রোধ আর বিহ্বলতায় ভরে ওঠে।

'হয়েছেটা কি?'

'কিছু না।'

কয়েক পা এগিয়ে যায় মানুষটা, একরোখা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

'তোমার সঙ্গে হঠাৎ কারুর দেখা হয়ে গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করে সে।

'আমাকে চেনে এমন কারুর সঙ্গে নয়,' মেয়েটি জবাব দেয়।

ফ্র্যাংকের হাত দুটো কাঁপতে শুরু করে। স্ত্রী তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার—এটা তার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠছিলো। তবু সে ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো ঘটনা তোমাকে বিচলিত করে তুলেছে, তাই নয় কি?'

'না, কেন ?' মেয়েটির কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত। স্বামী ওর কাছে শুধু একটা যন্ত্রণাদায়ক মানুষ মাত্র, এ ছাড়া তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ও আদৌ সচেতন নয়।

রাগে ফ্র্যাংকের গলার শিরা ফুলে ওঠে।

'দেখে তাই মনে হচ্ছে,' ফ্র্যাংক তার রাগটা প্রকাশ না করতে প্রয়াসী হয়—কারণ এ রাগের কোনো যুক্তি সে খুঁজে পায় না। এক তলায় নেমে যায় সে। স্বামী সম্পর্কে অবশিষ্ট অনুভূতিটুকু নিয়ে তখনও স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে থাকে মেয়েটি—অনুভূতিটা বিরাগের, কারণ সে ওকে উত্যক্ত করে তোলে। সময় বয়ে যায়। নিচে পরিবেশন করা খাবার আর বাগান থেকে ভেসে আসা স্বামীর তামাকের গন্ধ অনুভব করে মেয়েটি। কিন্তু ও নড়তে পারে না। একটা ঘণ্টি বেজে ওঠে। শব্দ শুনে ও বুঝতে পারে, ফ্র্যাংক বাড়িতে এসে ঢুকেছে। তারপর আবার সে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো। তার প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওর হৃদয় আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

লোকটা দরজা খুলে বলে, 'টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।'

মেয়েটির পক্ষে স্বামীর উপস্থিতিও সহ্য করা কঠিন, কারণ ওর ব্যাপারে লোকটা হস্তক্ষেপ করবেই। নিজের জীবনটাকে ও আর ফিরে পাবে না। আড়ষ্টভাবে উঠে, নিচে নেমে গেলো ও। কিন্তু খাওয়ার সময় খেতে বা কোনো কথাবার্তা বলতে পারলো না। বসে রইলো উদাসীন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন আর আপন-হারা অস্তিত্ব নিয়ে। ফ্র্যাংক এমন ভাব দেখাতে চেষ্টা করলো যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ও রাগে চুপ করে রইলো। যত শীঘ্রি সম্ভব ফের ওপর তলায় উঠে শোবার ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে দিলে মেয়েটি। ওকে একটু একা হতেই হবে। ফ্র্যাংক তামাকের নলটা নিয়ে চলে গেলো বাগানে। তার স্ত্রী তার চাইতে নিজেকে বড়ো বলে মনে করে—তাই স্ত্রীর সম্পর্কে চাপা রাগে তার সমস্ত মন কালো হয়ে উঠেছে। সে নিজে অবিশ্যি জানে না, কিন্তু সে কোনোদিনই স্ত্রীকে জয় করতে পারে নি। স্ত্রী কোনোদিনও তাকে ভালোবাসে নি। ফ্র্যাংককে ও শুধু নীরবে সহ্য করে এসেছে এবং এখানেই হেরে গেছে ফ্র্যাংক। ফ্র্যাংক ছিলো খনির একজন সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আর মেয়েটি ছিলো তার চাইতে উঁচু সমাজের মানুষ। কিন্তু মেয়েটি তাকে প্রাণ-মন ঢেলে গ্রহণ করে নি বলে এতোদিন আঘাত আর অমর্যাদাবোধ শুধু তার মনে মনেই কাজ করে এসেছে। আর এখন সমস্ত রাগ ফুঁসে উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

বাগান থেকে ফ্র্যাংক বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। তৃতীয় বার সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো মেয়েটি। হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে রইলো ওর। হাতল

ঘুরিয়ে দরজা ঠেললো ফ্র্যাংক—দরজায় চাবি বন্ধ। ফের আরও জোরে দরজা খোলার চেষ্টা করলো সে। মেয়েটির হৃদয় তখনও নিস্পন্দ।

'তুমি কি দরজায় চাবি লাগিয়েছো না কি?' বাড়িউলির কথা ভেবে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো ফ্র্যাংক।

'হ্যাঁ, এক মিনিট একটু দাঁড়াও।'

ফ্র্যাংক দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারে ভেবে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিলো মেয়েটি। স্বামীর প্রতি চরম ঘৃণা অনুভব করলো ও, কারণ সে ওকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেয় নি। তামাকের নলটা দাঁতে চেপে ফ্র্যাংক ঘরে এসে ঢুকলো, মেয়েটি ফিরে গেলো বিছানায় ওর পুরনো জায়গায়। দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ফ্র্যাংক। তারপর কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপারটা কি?'

স্বামী-সম্পর্কে মেয়েটি একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো। মানুষটার দিকে তাকাতে পারছিলো না ও। তাই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'তুমি কি আমাকে একটু একলা থাকতে দিতে পারো না?'

অপমানে মুখ কুঁচকে চকিতে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো ফ্র্যাংক। তারপর এক মুহূর্ত যেন কি ভেবে স্থির প্রত্যয়ে বললো, 'তোমার কিছু একটা হয়েছে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারো না।'

'আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি না। বলো, কি হয়েছে?'

'তোমাকে তা জানতে হবে কেন?' ঘৃণা আর হতাশায় চিৎকার করে ওঠে মেয়েটি।

কি যেন একটা ভেঙে যায়। তামাকের নলটা মুখ থেকে পড়ে যাবার মুহূর্তে, চমকে উঠে সেটা ধরে নেয় ফ্র্যাংক। দাঁতের চাপে ভেঙে যাওয়া অংশটা জিভ দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে এনে সেটাকে ঠোঁট থেকে তুলে হাতে নিয়ে ছাখে। তারপর তামাকের নলটা নিভিয়ে, ওয়েস্ট কোট থেকে ছাই ঝেড়ে, মাথা তুলে বলে, 'আমি জানতে চাই।'

ফ্র্যাংকের মুখটা ধূসর-পাণ্ডুর, তাতে কুৎসিত কাঠিন্য। দুজনে কেউ কারুর দিকে তাকায় না। মেয়েটি জানে, ফ্র্যাংক এখন রাগে আগুন হয়ে উঠেছে। দ্রুতলয়ে চলছে ফ্র্যাংকের হৃৎস্পন্দন। ফ্র্যাংককে ও ঘৃণা করে, কিন্তু ফ্র্যাংকের বিরোধিতা করতে পারে না। আচমকা ও মাথা তুলে ফ্র্যাংকের দিকে তাকায়, 'তোমার জানার কি অধিকার আছে?'

মানুষটার কঠোর মুখ আর যন্ত্রণা-কাতর চোখের দিকে তাকিয়ে এক বিস্ময়কর বেদনা অনুভব করে মেয়েটি। কিন্তু দ্রুত ওর মনটা আবার কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষটাকে ও কোনোদিনও ভালোবাসেনি, এখনও বাসে না।

মুক্তি-প্রয়াসীর মুক্ত হবার প্রচেষ্টার মতো সহসা মেয়েটি ফের চকিতে মাথা তুলে তাকায়। ও মুক্ত হতে চায়। স্বামীর কাছ থেকে ততোটা নয়, যতোটা ওর নিজের বরণ করে নেওয়া বন্ধন থেকে—যা ওকে এতো ভয়াবহভাবে বেঁধে রেখেছে। নিজেই নিজেকে এ বন্ধনে জড়িয়েছে বলে আজ তা ছিঁড়ে ফেলাও সব চাইতে কঠিন। কিন্তু এখন ও সমস্ত কিছুকেই ঘৃণা করে, ওর ইচ্ছে হয় সব কিছুকে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে। দরজায় পিঠ দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী, যেন অনন্তকাল ধরে—যতোদিন ও নিভে না যাবে ততোদিন অব্দি মানুষটা ওর বাধা হয়ে থাকবে। ফ্র্যাংকের দিকে তাকালো মেয়েটি। ওর চোখ দুটো নিরুত্তাপ আর নির্মম। ফ্র্যাংকের খেটে-খাওয়া হাতদুটো শরীরের পেছন দিকে দরজার পাল্লায় ছড়ানো।

'তুমি তো জানো যে আমি এখানেই থাকতাম?' স্বামীকে আঘাত দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই কঠোর স্বরে বলতে শুরু করে মেয়েটি।

ফ্র্যাংক ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাড় নেড়ে সায় জানায়।

'আমি তখন টরিল হলে মিস বাচের সঙ্গিনী হিসেবে কাজ করতাম। ওঁর সঙ্গে গির্জার পাদ্রীর বন্ধুত্ব ছিলো, আর আর্চি ছিলো পাদ্রীর ছেলে।' মেয়েটি একটু থামলো। ফ্র্যাংক কথাগুলো শুনছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা কি হতে চলেছে তা সে কিছুই বুঝতে পারছিলো না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলো সে। সাদা পোশাকে গুটিসুটি হয়ে বিছানায় বসে মেয়েটি ওর স্কার্টের প্রান্ত ভাগটা সযত্নে ভাঁজ করছিলো আর খুলে ফেলছিলো বারবার। নিষ্ঠুর বিদ্বেষে ভরা ওর কণ্ঠস্বর।

'আর্চি ছিলো একজন অফিসার—সাব লেফটেন্যান্ট। তারপর কর্নেলের সঙ্গে ঝগড়া করে সে ফৌজি চাকরি ছেড়ে দেয়। সে যাই হোক, ও আমাকে সাংঘাতিক ভালোবাসতো—আমিও বাসতাম ওকে।'

মেয়েটি স্কার্টের সেলাই করা অংশটা খুঁটছিলো আর ওর স্বামী দাঁড়িয়ে ছিলো স্থাণু হয়ে। স্ত্রীর হাবভাবে তার শিরায় শিরায় উন্মত্ততা জেগে উঠেছিলো।

'তখন তার বয়েস কতো?' স্বামী প্রশ্ন করলো।

'কখন? যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়? না কি যখন সে চলে যায়?'

'যখন তোমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় ?'

'তখন তার বয়েস ছাব্বিশ আর এখন একত্রিশ—প্রায় বত্রিশই হবে, কারণ এখন আমার বয়েস উনত্রিশ আর সে আমার চাইতে তিন বছরের বড়ো।'

মাথা তুলে বিপরীত প্রান্তের দেয়ালের দিকে তাকালো মেয়েটি

'তারপর কি হলো ?' জিজ্ঞেস করলো ওর স্বামী।

নিজেকে শক্ত করে নিয়ে মেয়েটি নির্লিপ্তভাবে বললো, প্রায় বছরখানেক আমরা বাগদত্তই ছিলাম বলা চলে, যদিও অন্য কেউ তা জানতো না। কানাঘুষো অবিশ্যি হয়েছে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে কেউ কিছু বলে নি। তারপর সে চলে গেলো—'

'তোমাকে খারিজ করে দিয়ে ?' ওকে আঘাত দিয়ে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ফ্র্যাংক নিষ্ঠুরের মতো বললো

রাগে মেয়েটির হৃদয় উন্মাদের মতো ফুঁসে উঠলো। 'হ্যাঁ', স্বামীকে রাগাবার জন্যে জবাব দিলো ও।

এক পা থেকে অন্য পায়ে শরীরের ভর রেখে রাগে 'হুঃ' করে উঠলো মানুষটা। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা।

মেয়েটি ফের বলতে শুরু করলো, 'তারপর হঠাৎ একদিন সে আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে চলে যায়। যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো বলতে গেলে সেদিনই আমি মিস বাসের মুখে শুনলাম ও তার সদিগমন হয়েছে।' নিবিড় যন্ত্রণা মেয়েটির কথাগুলোতে উপহাসের সুর সৃষ্টি করলো, 'আর দুমাস বাদে জানলাম, সে মারা গেছে—'

তারপরই তুমি আমাকে জালে ফেললে, তাই না ?'

মেয়েটি নিরুত্তর। খানিকক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। ফ্র্যাংক কিছুই উপলব্ধি করতে পারে নি। বিশ্রীভাবে তার চোখদুটো কুঁচকে উঠেছে ?

'তার মানে আজ তুমি তোমার পুরনো অভিসারের জায়গাগুলো দেখতে গিয়েছিলে ? তাই আজ সকালে তুমি একা একা বেরুতে চাইছিলে ?'

মেয়েটি তবু তার কথার কোনো জবাব দেয় না। ফ্র্যাংক দরজা থেকে জানলার কাছে গিয়ে পেছন দিকে হাত রেখে, মেয়েটির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। স্বামীর দিকে তাকায় মেয়েটি। মানুষটার হাতদুটোকে ভারি স্থূল আর মাথার পেছন দিকটা ভীষণ তুচ্ছ বলে মনে হয় ওর।

অবশেষে, যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, মানুষটা ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটার সঙ্গে তুমি কতো দিন ওসব চালিয়েছিলে ?'

'তার মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে মেয়েটি।

'আমি জানতে চাই, তুমি কতো দিন লোকটার সঙ্গে ওসব চালিয়েছো।'

স্বামীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা তুললো মেয়েটি। এ প্রশ্নের কোনো জবাব ও দিতে চায় না। তবু বললো, 'চালিয়েছো বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো, আমি জানি না। তবে মিস বার্চের কাছে কাজ করতে যাবার দুমাস পরে—ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার দিনটি থেকেই আমি ওকে ভালোবেসেছি।'

'তোমার কি ধারণা সে-ও তোমাকে ভালোবাসতো ?' ফ্র্যাংকের কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর।

'আমি জানি সে-ও বাসতো।'

'কি করে জানলে ? সে তো তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখে নি ?'

তারপর ঘৃণা আর যন্ত্রণাভরা এক দীর্ঘ নীরবতা।

'তোমাদের মধ্যে ব্যাপারটা কতো দূর এগিয়েছিলো ?' অবশেষে ভীত আর আড়ষ্ট স্বরে প্রশ্ন করে ফ্র্যাংক।

'তোমার এসব বাঁকা বাঁকা প্রশ্নগুলোকে আমি ঘৃণা করি,' ফ্র্যাংকের জালাতনে উত্যক্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠে মেয়েটি। 'আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম, আমরা পরস্পরের প্রেমিক ছিলাম। তুমি কি ভাবো না ভাবো, তাতে আমার কিছুই এসে-যায় না। এর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ? তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম।'

'ভালোবাসতাম !' রাগে ফ্র্যাংকের মুখ সাদা হয়ে যায়, 'তার মানে তুমি একটা ফৌজি লোকের সঙ্গে মজা লুটেছো, তারপর সেসব চুকিয়ে বিয়ের জন্যে আমার কাছে এসেছো—'

মনের তিক্ততাটুকু মনে চেপে বসে থাকে মেয়েটি। এক দীর্ঘ বিরতির পর তখনও অবিশ্বাসী ফ্র্যাংক জানতে চায়, 'তুমি কি বলতে চাও, তোমরা একেবারে শেষ সীমা অব্দি যেতে ?'

'তাছাড়া আর কি মনে করো তুমি ?' নিষ্ঠুরের মতোই চিৎকার করে ওঠে মেয়েটি।

ফ্র্যাংক কুঁকড়ে ওঠে, ফ্যাকাসে আর নির্লিপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ এক অসাড় স্তব্ধতা। ফ্র্যাংক যেন ছোটো হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। অবশেষে তিক্ত-বিদ্রূপের স্বরে সে বলে, 'তোমাকে বিয়ে করার আগে তুমি কোনোদিনও এ সমস্ত ঘটনা আমাকে বলার কথা চিন্তা করোনি।'

'তুমি কোনোদিনও কিছু জিগেস করোনি', জবাব দেয় মেয়েটি।

'তার কোনো প্রয়োজন ছিলো বলে আমি চিন্তা করিনি।'

'তাহলে সেটা তোমার চিন্তা করা উচিত ছিলো।'

প্রায় শিশুর মতো নির্বিকার অভিব্যক্তিহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ফ্র্যাংক—তার মনে হাজারো চিন্তার আবর্ত, যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে সমস্ত হৃদয়।

হঠাৎ মেয়েটি বললো, 'আজ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। সে মারা যায় নি, পাগল হয়ে গেছে।'

'পাগল!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফ্র্যাংকের মুখ থেকে বেরিয়ে যায় কথাটা।

'হ্যা, উন্মাদ,' কথাটা বলতে গিয়ে মেয়েটির সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে আসে।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর স্বামী মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'সে কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?'

'না,' জবাব দেয় মেয়েটি।

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফ্র্যাংক। ওদের দুজনার মধ্যে ব্যবধান যে কতোটা, তা এতোদিনে সে বুঝতে পেরেছে। মেয়েটি তখনও গুটিসুটি হয়ে বিছানায় বসে রয়েছে। ওর কাছে যেতে পারে না ফ্র্যাংক। সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় ওরা দুজনেই বুঝি অপবিত্র হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটা নিজে থেকেই সমাধানের পথ খুঁজে নেবে। দুজনেই এতো আঘাত পেয়েছে যে এখন দুজনেই হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক, অন্যজনের প্রতি কারুর মনেই এখন আর কোনো ঘৃণাবোধ নেই।

কয়েক মিনিট বাদে মেয়েটিকে ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ফ্র্যাংক।

* The Shadow in the Rose Garden.

ইস্ট ক্রয়ডনে এসে নামার সময়েই বার্নার্ড কুটস বুঝতে পেরেছিলো, ঈশ্বরকে সে পরীক্ষায় ফেলেছে।

'এখানে থাকতে আমি অভ্যস্ত—তাই রাত্তিরটা আমি এখানেও থাকতে পারি, আবার লণ্ডনেও চলে যেতে পারি,' নিজেকে বললো সে। 'আজ রাতে কনির কাছে সেই অতো দূরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লান্তিতে আমি মরে যাচ্ছি। কাজেই যেটা করা সব চাইতে সহজ, সেটা আমি করবো না-ই বা কেন?'

নিজের মালপত্রগুলো একটা কুলিকে দিলো সে।

এগিয়ে আসা ট্রামটার মুখোমুখি হয়ে কুটস ফের নিজের মনে বললো, "পিয়োরলিতে না যাবার কোনো কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক চায়ের সময়টাতেই আমি ওখানে পৌঁছে যাবো।'

নিজের বাসনার স্বপক্ষে দাঁড় করানো এই প্রতিটি যুক্তিই বার্নার্ডের বিবেক-বিরুদ্ধ। কিন্তু লজ্জার অনুভূতিটার তলে তলে এতে তার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলো।

মার্চের সন্ধ্যা। ক্রাউন হিলের তলায় শূন্যগর্ভ অন্ধকারের মধ্যে স্তূপীকৃত ঘর-বাড়ি। তাদের মধ্যে থেকে গির্জার কালো ছায়াটা তরঙ্গময় ধোঁয়াটে সূর্যাস্তে মাথা তুলে রেখেছে।

'এসব কিছুই আমার বড়ো চেনা, বড়ো প্রিয়,' সংগোপনে নিজের মনের কাছে স্বীকার করলো বার্নার্ড কুটস।

ট্রামটা পরিচিত পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিলো। চলার বেগে জেগে ওঠা শোঁ শোঁ শব্দটা কান পেতে শুনছিলো যুবক, লক্ষ্য করছিলো মাথার ওপরে ট্রামের প্রলম্বিত অংশের সঙ্গে তারের ঘষায় ফুটে ওঠা আচমকা নীল আলোর ঝলকানিগুলোকে। শুধু তারের ভেতর থেকে জেগে ওঠা স্ফুলিঙ্গগুলোর ওই চকিত দীপ্তি খুশি করে তুলছিলো তাকে।

'কোত্থেকে আসে ওরা?' কথাটা সে নিজেকে জিজ্ঞেস করতেই ফের একটা স্ফুলিঙ্গ দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। উদ্দীপ্ত হয়ে মৃদু হাসে বার্নার্ড কুটস।

দিনটা মরে আসছিলো। বৈদ্যুতিক আলোগুলো একে একে জলে উঠছিলো

টুপটাপ করে। গাঢ় আকাশের পটভূমিতে বাতিগুলোর তামার ঢাকনা এতোক্ষণ চকচক করছিলো। এবারে সেগুলো ঝোপঝাড়ের মতো কালচে হয়ে উঠলো। ট্রামটা যেন মনের উল্লাসে নিচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ছুটে চলেছে। ঘর বাড়িগুলো পেরিয়ে আসতেই যুবক পশ্চিম দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা তারার উদয় দেখতে পেলো। দেখতে পেলো একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এগিয়ে আসছে অনেক দূরের পথ পেরিয়ে—এতোক্ষণ সে যেন দিনের আলোর ফেনায় স্নান করছিলো, এবারে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে সৈকত রাত্রির দিকে। মাথা নুইয়ে নব নক্ষত্রটিকে অভিবাদন জানালো বার্নার্ড। গাড়িটা লাফিয়ে উঠতেই বুকটা দুলে উঠলো তার।

'মনে হচ্ছে তারাটা যেন আকাশের ওপার থেকে আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে,' নিজের কল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হলো যুবক।

সন্ধ্যারাণীর দীপ্তির ওপারে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ফালিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছিলো। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন মনে পড়লো যুবকের। 'ঠিক যেন বলি-দানের ছুরি,' নিজেকে বললো সে। 'কার জন্যে, কে জানে?'

প্রশ্নটার কোনো জবাব দিলো না যুবক। কিন্তু উত্তর দিকের পল্লীযাজকের এলাকায় তার প্রতীক্ষায় থাকা, তার বাগদত্তা, কন্সটান্সের কথাটা কেমন যেন মনে পড়ে গেলো তার। নিজের চোখ দুটো বন্ধ করলো যুবক।

শীঘ্রিই গাড়িটা ছায়া থেকে গুমটির হলুদ আলোগুলোর দিকে পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করলো। সেখানে দোকানের পর দোকান আর আলোর পরে আলো নীল গাঢ়ির কোলে সোনালি আগুন জ্বেলে রেখেছে। মনের আনন্দে আলোর-বাষ্পের গন্ধ শুঁকে শুঁকে অগ্রহী কুকুরের মতো বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে গাড়িটা।

কুটস ভুল করেছিলো সে রাস্তায়। দ্রুত পায়ে চত্বরটা পেরিয়ে এলো সে। বাগানের দোলনায় ঝুলে থাকা আলিসাম ফুলের চওড়া সাদা কাপড়গুলো দেখে দূর থেকেই সে বাড়িটাকে আলাদা করে চিনে নিতে পেরেছিলো। অন্ধকারে হাইআসিনথের সুগন্ধ অনুভব করলো কুটস। তারপর বিকে রঙের অপরূপ ড্যাফোডিল আর ঘাসের পাড়ে বসানো সাদা ক্রোক্যাস ফুলের নিয়মিত সারি খুঁজতে খুঁজতে খাড়াই পথটা ধরে সে এক ছুটে দরজার কাছে পৌঁছে গেলো।

মিসেস ব্রেইথওয়েট নিজেই দরজাটা খুলে দিলেন।

'এসে গেছেন!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মহিলা। 'আমি আপনাকে আশা করছিলাম। আপনার চিঠিতেই জেনেছিলাম, আপনি আজ ডিগ্রি পেয়েছেন।

তা শেষ মুহূর্তের আগে আপনি এখানে আসার জন্যে মনস্থির করবেন না, তাই না? আমি সেটাই আশা করেছিলাম। আপনার জিনিসপত্রগুলো কোথায় রাখবেন, তা তো আপনি জানেনই। গত বছরে আমরা কিছু পরিবর্তন করেছি বলে মনে হয় না।'

মিসেস ব্রেইথওয়েট পুরো সময়টা হাসতে হাসতেই বকবক করে গেলেন। উনি অল্প বয়সী বিধবা, দু বছর আগে স্বামী মারা গেছেন। ভদ্রমহিলার উচ্চতা মাঝারি, দেহের রঙ আর মেজাজ দুই-ই চড়া। গায়ের চামড়া আর মাথার কালো চুলে চমৎকার একটা তেল চিকচিকে আভা, যা বাদামের মাংসল অংশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় ওঁর পরনে ধূসর বাদামি রঙা নরম সাটিনের লম্বা ঘাঘরা।

'অবিশ্যি আপনি এসেছেন বলে আমি খুশিই হয়েছি,' অবশেষে মহিলা রীতিমাফিক ভদ্রতা প্রকাশে প্রয়াসী হলেন এবং তারপরেই কুটসের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের আদব কায়দা প্রকাশের প্রচেষ্টায় হাসতে শুরু করলেন।

কুটসকে উনি একখানা ছোট্ট এবং ভীষণ গরম ঘরে নিয়ে গেলেন। ভারতীয় সূচীকাজ করা কালো রঙের পর্দা আর মসৃণ কিছু ভারতীয় জিনিসপত্র থাকার দরুন ঘরটাতে একটা অপরিচিত অন্ধকার আভা। অসামান্য ধবধবে চুল আর জুলপিওয়ালা এক গোলাপী চেহারার বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে উঠে কুটসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বার্ধক্যের হতচকিত বিহ্বল দৃষ্টির সঙ্গে মিশে তাঁর অভ্যর্থনা জানাবার আন্তরিক অভিব্যক্তিটা কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হলো। ওঁর মুখভঙ্গি খানিকটা আড়ষ্ট, যা এখন অতি সামান্য কয়েকটি অভিব্যক্তিই প্রকাশ করতে পারে। গভীর অন্তরঙ্গতায় নবাগতের হাতখানা চেপে ধরলেন উনি। নুয়ে পড়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীরের সঙ্গে ওঁর ভাবভঙ্গির বৈপরীত্য বড়োই করুণ।

'কে, ও হ্যাঁ- মিস্টার কুটসই তো বটে! তা কেমন আছো হে তুমি, অ্যাঁ? বোসো, বোসো!' বৃদ্ধ ফের উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিমায় একটু নত হয়ে, হাতের ইঙ্গিতে যুবককে একটা কুর্সিতে বসতে বললেন। 'বেশ, বেশ! তা তুমি আছো কেমন?... এসো, এসো—নাও, একটু চা খাও। এই যে ট্রে-টা। সরা, তুই ঘন্টিটা বাজিয়ে, মিঃ কুটসের জন্যে একটু নতুন করে চা বানিয়ে আনতে বল তো! ...থাক্‌. আমিই ঘন্টি বাজাচ্ছি।' আচমকা পুরনো দিনের তৎপরতার কথা মনে পড়ে গেলো বৃদ্ধের। নিজের বয়েস এবং অনিশ্চিত অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে ঘন্টি টেপার জন্যে হাতড়ে হাতড়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

'চায়ের কথা বলা হয়ে গেছে, বাবা,' মেয়ে চড়া, পরিষ্কার গলায় জবাব দিলেন। 'চা এক্ষুনি এসে যাবে।' মিঃ ক্লিভল্যাণ্ড স্বস্তি পেয়ে কুর্সিতে বসে পড়লেন।

'জানো তো, ইদানীং আমি আবার বাতের ঝামেলায় ভুগতে শুরু করেছি,' গোপন কথা বলার মতো করে বৃদ্ধ বুঝিয়ে বললেন। মিসেস ব্রেইথওয়েট যুবকের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বৃদ্ধ অনবরত বকে যেতে লাগলেন। অতিথিটির উপস্থিতিটুকু ছাড়া তার সম্পর্কে অন্য কোনো ধারণাই বৃদ্ধের নেই। কুটস না হয়ে স অন্য যে কোনো যুবকও হতে পারে—বৃদ্ধের সচেতনতা শুধু ওই পর্যন্তই।

আপনি যে চলে যাবেন, তা কিন্তু আমাদের বলেন নি। কেন বলেন নি ?' পরিষ্কার গলায়, হাসি আর ভর্ৎসনার মাঝামাঝি স্বরে, লরা জিজ্ঞেস করলেন। কুটস ওঁর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাতেই উনি টেবিল-ঢাকাটায় পড়ে থাক রুটির গুঁড়োগুলোকে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন।

'জানি না,' কুটস জবাব দিলো। 'কেন আমরা এমন কাজ করি ?

তা আমিও জানি না। কেন করি ? হয়তো করতে ইচ্ছে হয় বলে করি।' ছোট্ট করে খিলখিলিয়ে হাসলেন মহিলা। ব্যাপারটাই ভারি মজার, মহিলাও দারুণ স্বাস্থ্যবতী।

কেন আমরা এ সব করি, বাবা ?' হাসির সঙ্গে কুটসের দিকে এক ঝলক তা করে আচমকা উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন মহিলা।

কেন করি ? কি করি ?' বৃদ্ধও মেয়ের সঙ্গে হাসতে শুরু করলেন।

যে কোনো কাজ, যা আমরা করে থাকি।'

'খুবই কঠিন প্রশ্ন,' বৃদ্ধ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। 'মনে আছে আমার বয়েস যখন আরও একটু কম, তখন আমরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' নিয়ে আলোচনা করতাম—ওই নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠতাম '

ভদ্রলোক হাসলেন। সেই সঙ্গে লরাও। তারপর উঁচু গলায় বললেন, 'সর্বনাশ। স্বাধীন ইচ্ছা! আলোচনাটা যদি তুমি ফের জাগিয়ে তোলো, বাবা—তাহলে আমরা কিন্তু সত্যিই মনে করবো, তোমার যৌবন চলে গেছে।'

মুহূর্তের জন্যে মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডকে বিহ্বল দেখালো। তারপর একটা জটিল ধাঁধার জবাব দেবার মতো ভঙ্গিমায় উনি প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কেন আমরা এসব করি ? কেন করি ?'

'আমার মনে হয়,' পূর্ণ আস্থা নিয়ে উনি বললেন, 'না করে আমরা থাকতে

পারি না, তাই করি! না কি? কি বলো হে তোমরা?'

লরা হাসলেন। কুটসও দাঁত বের করে হাসলো।

'আমার কিন্তু তাই মনে হয়, বাবা।' লরা উঁচু গলায়ব ললেন।

'আপনি কি এখনও আপনার সেই কন্সটান্সের কাছেই বাগদত্ত হয়ে আছেন নাকি?' এবারে লরার কণ্ঠস্বরে একটু ব্যঙ্গের রেশ।

কুটস ঘাড় নেড়ে সায় জানালো।

'কেমন আছে ও?'

'আমার বিশ্বাস, খুবই ভালো আছে। অবিশ্যি আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে ও যদি ইতিমধ্যেই বিচলিত হয়ে ওঠে, তাহলে আলাদা কথা।' দাঁতে জিভ চেপে জবাব দিলো কুটস। প্রেয়সীকে আঘাত দিতে তার খারাপ লাগছিলো। তবু ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললো সে।

'জানেন, কন্সটান্স আমাকে বরাবরই বানবারির কথা মনে করিয়ে দেয়। ওকে আমি আপনার মিস বানবারি বলি,' লরা হেসে ওঠেন।

কুটস কোনো জবাব দেয় না।

'আপনি চলে যাবার পর প্রথম প্রথম আমাদের খুব খারাপ লাগতো,' নতুন করে আলোচনার ধারাবাহিকতা গড়ে তুললেন মহিলা।

'ধন্যবাদ,' কুটস বললো। মহিলা দুষ্টুমির হাসি ছড়ালেন।

'আজ তো শুক্রবার,' মহিলা পরক্ষণেই বলে উঠলেন, 'শুক্রবারের সন্ধ্যায় উইনিফ্রেড এখনও এখানে আসে—আগে যেমনটি আসতো। কতো দিন আগে, বলুন তো? দশ মাস?'

'হ্যাঁ দশ মাস,' কুটস সায় জানায়।

'আপনি কি উইনিফ্রেডের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন নাকি?' আচমকা প্রশ্ন করলেন মহিলা।

'উইনিফ্রেড কক্ষনো ঝগড়া করে না।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু তাহলে আপনি চলে গেলেন কেন? আপনি আমার কাছে একটি প্রহেলিকা, বুঝেছেন? আপনার কাছ থেকে কারণটা বের করতে না পারা অব্দি আমি শান্তি পাবো না। আপনার তাতে আপত্তি আছে?'

'ভালোই তো,' কুটস নিঃশব্দে এক টুকরো চকিত হাসি ছড়ালো।

মহিলাও হাসলেন। তারপর নিজেকে সংযত আর গম্ভীর করে নিয়ে বললেন, 'নাঃ, আমি আপনাকে একটুও বুঝতে পারি না—উইনিফ্রেডকেও পারি না। আপনারা দুজনে মিলে একটি জোড়া। কিন্তু আসলে আপনিই হচ্ছেন

সত্যিকারের অদ্ভুত। তা বিয়ে করছেন কবে?'

'জানি না—যেদিন যথেষ্ট স্বচ্ছল হয়ে উঠবো।'

'আমি আজ রাতে উইনিফ্রেডকে আসতে বলেছি,' লরা স্বীকার করলেন। ওদের দৃষ্টি মিলিত হলো।

কেন ও আমার সঙ্গে এমন ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে কথা বলে? ও কি সত্যিই আমাকে পছন্দ করে? নিজেকে প্রশ্ন করে কুটস। কিন্তু লরা যেমন উজ্জ্বল উচ্ছল, তাতে দেখে মনে হয় না ও প্রেমের জালায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

'উইনিফ্রেড আমাকে কিছুই বলে নি।'

'বলার মতো কিছু নেই,' জবাব দিলো কুটস।

লরা কয়েক মুহূর্ত নিবিড় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ বাদে এক জার্মান মহিলা এসে হাজির হলেন। কুটস ওঁর সঙ্গে স্বল্প পরিচিত। সাড়ে সাতটা নাগাদ এলো উইনিফ্রেড। কুটস শুনতে পেলো শিষ্টাচারী বৃদ্ধ ওকে হলঘরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, নিচু গলার ওর কথার জবাব দিচ্ছে উইনিফ্রেড। কুটস বুঝতে পারলো, যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভেতরে ঢুকে ওকে দেখেই একটা আঘাত পেয়েছে উইনিফ্রেড। সে নিজেও বেদনা অনুভব করছিলো। দোরগোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করলো উইনিফ্রেড। তারপর এগিয়ে এসে কুটসের হাতে হাত মেলালো—কোনো কথা বললো না, শুধু যেন ভয়ার্ত দুটি নীল চোখ তুলে তাকালো কুটসের দিকে। উইনিফ্রেডের উচ্চতা মাঝারি, শক্তসমর্থ গড়ন, মুখটা পাংশুল আর ভাবলেশ-হীন—তাতে হাসির চিহ্নমাত্র নেই। ওর বয়েস আঠাশ, মাথায় সোনালি চুল, পরনের শুভ্র গাউনটা একটুর জন্যে ভূমিস্পর্শ করছে না। পরিপূর্ণ আর সুগঠিত ওর গ্রীবা, শুভ্র আর সুন্দর ওর বাহু, নীল চোখ দুটি এক অজানা আবেগে মেদুর। কুটসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ও স্পষ্টতই রক্তিম হয়ে উঠলো। ওর বাহু আর গ্রীবায় রক্তের ছটা দেখতে পাচ্ছিলো কুটস। জবাবে সে-ও লাল হয়ে উঠলো।

'এই রাঙা হয়ে ওঠায় ও আঘাত পাবে,' বেদনায় কুঁকড়ে উঠে নিজেকে বললো কুটস।

'আমি তোমাকে দেখবো বলে আশা করিনি,' যেন অর্ধেক-বুজে ওঠা গলায় উইনিফ্রেড বললো। তা শুনে শিউরে উঠলো কুটসের স্নায়ুগুলো।

'না...আমিও তোমাকে আশা করিনি। অন্তত...' অনিশ্চিত ভাবে কথাটা শেষ করলো সে।

'তুমি কি ইয়র্কশায়ার থেকে আসছো?' আপাতদৃষ্টিতে উইনিফ্রেডকে শীতল আর প্রশান্ত বলে মনে হলো। ইয়র্কশায়ার মানে সেই যাজক পল্লী, যেখানে কুটসের প্রেমিকা থাকে। উইনিফ্রেডের প্রশ্নে বিদ্রূপের বিষ জ্বালা অনুভব করলো কুটস।

'না, সেখানে যাচ্ছি', জবাব দিলো সে।

তারপর মুহূর্তের নীরবতা। পরিস্থিতিটা কি ভাবে সামলানো যাবে বুঝতে না পেরে আচমকা গৃহকর্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো উইনিফ্রেড।

'আমরা কি তাহলে বাজাবো?'

ওরা বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরটা বিশাল, জানলা-দরজায় ম্যাটমেটে হলদে রঙের পর্দা। তাপচুল্লির তাকটা কুটসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এটা তার ভালো করেই চেনা, কিন্তু আজকের এই সন্ধ্যায় এটা এক নতুন সৌন্দর্য পেয়েছে। মর্মরের তাকটার ওপরে গভীর ধূসর জলের মতো আলোকভেদ্য অথচ অস্বচ্ছ প্রকাণ্ড একখানা আয়না। আর আয়নার সামনে কোমল ধূসর আকাশে ঝিলমিলিয়ে ওঠা শুভ্র চাঁদের মতো দু ফুট উঁচু দুটি স্ফটিকের মূর্তি। দুটি মূর্তিই নগ্ন, পাশ থেকে আসা আলোর আভায় বেদীর ওপরে ঝলমল করছে। ভেনাসের মূর্তিটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ানো, যেন আশা করছে কেউ আসবে বলে। ওই আশা-আশংকায় দোলায়িত ভঙ্গিমাটুকু যুবককে আড়ষ্ট করে তুললো। আয়নার গভীরে ফুটে ওঠা ভেনাসের কাঁধের সুস্পষ্ট নমনীয়তা আর কোমরটুকু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো সে। সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানোয় ভারি আকর্ষণ লাগছিলো ভেনাসকে, আলোর আভায় আভাসিত হয়ে উঠেছে ওর মর্মরের ঐশ্বর্যময় কটিতট।

লরা ব্রামসের* সুর বাজালেন। হাসিখুশি জার্মান মহিলাটি বাজালেন চপিন।** আর উইনিফ্রেড লরার সঙ্গে বেহালায় বাজালো গ্রেগ-এর˙ সোনাটা। কুটস কোনো সমালোচনা করতে পারছিলো না, সুরে সুরে সে মাতাল হয়ে উঠলো। বাজাতে বাজাতে উইনিফ্রেড সামান্য দুলছিলো। ওর ঘাড়ের বলিষ্ঠ ঝাঁকুনি আর হাতের ক্রুদ্ধ দাপটে লক্ষ্য করছিলো কুটস। ওর দেহরেখাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো সে। উইনিফ্রেডের পরনে কোনো কাঁচুলি নেই, তবু দৃঢ় আর উন্নত ওর বাঁধন। ফের ভেনাসের নুয়ে থাকা মূর্তিটার দিকে তাকালো

---

* জোহানস ব্রামস (১৮৩৩-৯৭) জার্মান সুরকার ও পিয়ানো বাদক।

** ফ্রেডেরিক ফ্রাঁসোয়া চপিন (১৮১০-৪৯) পোলিশ সুরকার ও পিয়ানো বাদক।

˙ এডওয়ার্ড হ্যাগেরাপ গ্রেগ (১৮৪৩-১৯০৭) নরওয়েজিয়ান সুরকার।

কুটস। তার মনে হলো, উইনিফ্রেড সোনালি চুল আর নিরেট শুভ্রতার এক নিঃসঙ্গ রমণী।

সারাটা সন্ধ্যে কথাবার্তা হলো সামান্যই। শুধু মিস সাইফুর্টই অনবরত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেলেন, 'ওহ্., চমৎকার। মিস ভার্লি তুমি যে কি দারুণ বাজাও তা তুমি জানো না। ইস্, আমি যদি বেহালা বাজাতে পারতুম!'

দশটা বাজতে না বাজতেই উইনিফ্রেড আর মিস সাইফুর্ট যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম জন যাবে ক্রয়ডন, দ্বিতীয় জন এওয়েল।

আমরা গাড়িতে চেপে এক সঙ্গেই ওয়েস্ট ক্রয়ডনে যেতে পারি,' একটা শিশুর মতো খুশিয়াল সুরে জার্মান মহিলা বললেন। ওঁর বয়েস চল্লিশ, সহজেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, রোগা-পাতলা, নিষ্পাপ চেহারা। প্রশংসায় ভরা ঝলমলে বাদামি চোখ-দুটো তুলে উনি কুটসের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ আমি তাতে খুশিই হবো,' জবাব দিলো কুটস। উইনিফ্রেডের বেহালাটা সে নিজের হাতে তুলে নিলো। তারপর তিন জনে মিলে ট্রাম-গুমটির দিকে নামতে লাগলো। একটা গাড়ি তক্ষুণি ছাড়ছিলো। মিস সাইফুর্ট পাদানিতে উঠে দাঁড়ালেন। কুটস অপেক্ষা করে রইলো উইনিফ্রেড উঠবে বলে।

'আপনারা যাবেন তো আসুন,' গাড়ির পরিচালক ওদের ডেকে বললো।

উইনিফ্রেড বললো, 'এখন আমার হেঁটে যেতেই ভালো লাগবে।'

'ওয়েস্ট ক্রয়ডন থেকেও আমরা হাঁটতে পারি,' কুটস বললো।

গাড়ির পরিচালক ঘন্টি বাজিয়ে দিলো।

'একি! আপনারা আসছেন না?' ছিপছিপে জার্মান মহিলা গাড়ির পাদানি থেকে চিৎকার করে উঠলেন।

'ওয়েস্ট ক্রয়ডন থেকে আমি প্রতিদিনই হেঁটে যাই।' উইনিফ্রেড বললো, 'এখন এই নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়াটাই আমার পছন্দ।'

'আরে।' আপনারা আসছেন না আমার সঙ্গে?' জার্মান মহিলার কণ্ঠস্বর রীতিমতো ভয়ার্ত। ফের পাদানিতে নেমে এলেন উনি। গাড়ির পরিচালক অধীর হয়ে ঘন্টি বাজিয়ে দিলো। গাড়িটা সামনের দিকে চলতে শুরু করতেই মিস সাইফুর্ট টালমাটাল হয়ে উঠলেন, পরিচালক চট করে ধরে সামলে রাখল ওঁকে।

'যাঃ!' মিস সাইফুর্টের হাত দুটো রাস্তার দিকে এগুনো, হতাশায় ওঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে প্রায়। ট্রামটা সামনের দিকে চলতে শুরু করতেই উনি নিজের টুপিটাকে চেপে ধরলেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে।

শিশুর মতো নিষ্পাপ ওই জার্মান রমণীর বেদনায় ব্যথিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কুটস।

'পাহাড়টা পেরিয়ে আমরা 'দ্য সোয়ান'-এও যেতে পারি', বললো উইনিফ্রেড। ওর কণ্ঠস্বরে এক নিবিড় ধাতব ঝংকার, যা চিরদিনই পুরুষমানুষকে উত্তেজিত করে তোলে। সুরটা ক্রোধের অথবা বিরোধিতার যন্ত্রণাকাতর অনুভূতির। ফের পাহাড়ে ওঠার জন্যে ওরা মুখ ফেরালো। কুটসের হাতে উইনিফ্রেডের বেহালা। বেশ কিছুক্ষণ ওরা কেউই কোনো কথা বললো না।

'ওকে আমি ঘৃণা করি, ভীষণ ঘৃণা করি।' বারবার নিজেকে বলছিলো কুটস। মিস সাইফুর্টের মিনতিভরা করুণ আর্তনাদের কথা মনে হতেই বারবার কুঁকড়ে উঠছিলো সে। যে পরিস্থিতিতে সে পড়েছিলো, সেখানে সে নিজে থেকে যায়নি—সেখানে তাকে নিয়ে ফেলার জন্যে উইনিফ্রেডকে ঘৃণা করছিলো সে। অথচ সে ভুলে যাচ্ছিলো, পতঙ্গের মতো সে-ই ছুটে এসেছিলো মোমবাতির কাছে। আড়ষ্ট শরীর, কঠিন মুখ আর বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে আধ মাইল পথ পেরিয়ে এলো কুটস। আর এই পুরো সময়টা তার পাশাপাশি মাথা নিচু করে এগিয়ে চলা উইনিফ্রেডের প্রতি ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার নিখাদ সুর বাজতে লাগলো কুটসের রক্তের স্পন্দনে।

অবশেষে পাহাড় চূড়ায় উঠে ওরা সেই অ্যাহান পাশপথগুলোর মুখোমুখি হলো, যেগুলি ঘাসের ওপর দিয়ে প্রতীক্ষায় জেগে থাকা বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে। উপত্যকার আলোর ফুলগুলোর ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা দুজনে। সামনে লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোর আভা আকাশের নক্ষত্রগুলোর চাঁদতও ম্লান। উপত্যকার ওধারে, বিপরীত দিকের পাহাড়টার গাঢ় কালিমায় একরাশ টিপটিপে আলো যেন ডাশ-মশার মতো অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে। কালপুরুষটা হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। নিচে, বাড়ির ফাটলের মাঝে ব্রাইটন রোডকে ঘিরে আলোর উজ্জ্বল মালা। সেখানে সোনালি ট্রামগাড়িগুলো একে অন্যকে পেরিয়ে যাবার সময় একটা অস্পষ্ট ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে ছুটে চলেছে নির্দিষ্ট পথ ধরে।

'আমরা এখানে এসেছিলাম—গত সোমবার এক বছর হলো', উইনিফ্রেড বললো।

'মনে আছে, তবে সেদিন মনে পড়েনি।' কুটসের কণ্ঠস্বরে কাঠিন্যের আভাস। 'আমরা কবে কবে একত্রে বেরিয়েছিলাম, তা আমার মনে নেই।'

'রাতটা ভারি সুন্দর,' একটু অপেক্ষা করে ভীষণ নিচু আর আবেগভরা

স্বরে বললো উইনিফ্রেড।

'চাঁদ ডুবে গেছে, সন্ধ্যাতারাও। কিন্তু আমি যখন এলাম, তখন দুটোই আকাশে ছিলো।'

কথাটা প্রতীকবাহী কি না দেখার জন্যে চকিতে কুটসের দিকে তাকালো উইনিফ্রেড। কঠিন মুখে উপত্যকাটার ওধারে তাকিয়ে রয়েছে কুটস। অতি ধীরে, দু-এক ইঞ্চি করে, তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে গেলো উইনিফ্রেড।

'হ্যাঁ,' অর্ধেক জেদ আর অর্ধেক মিনতিভরা কণ্ঠস্বর উইনিফ্রেডের। 'কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতটা ভারি সুন্দর।'

'হুঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দেয় কুটস।

এবং এইভাবে, মাসের পর মাস বিচ্ছেদের পরেও, ওরা সেই একই প্রেম আর ঘৃণাকে জোড়তালি দিয়ে চলে।

'তুমি কি এখানেই থাকছো?' সচেষ্ট প্রয়াসে প্রশ্ন করে উইনিফ্রেড। সব চাইতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত বিষয়েও ও কোনোদিন কৌতূহল প্রকাশ করে নি। এ ব্যাপারে ও লবার একেবারে বিপরীত। কাজেই এ প্রশ্নটা ওর কাছে অনধিকার প্রবেশের মতোই ধৃষ্টতা। কুটস অনুভব করে ও একেবারে কুঁকড়ে উঠেছে।

'সকাল অব্দি আছি—তারপর ইয়র্কশায়ার,' নিষ্ঠুরের মতো জবাব দেয় কুটস। উইনিফ্রেড স্পষ্টভাষিতা সহ্য করতে পারে না বলে বিশ্রী লাগে তার।

সেই মুহূর্তে দুধারের অন্ধকারকে নিজের সোনালি সুতোয় গেঁথে একটা ট্রেন উপত্যকা দিয়ে ছুটে যায়। একটা অস্পষ্ট শাসানিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে সারাটা উপত্যকা। ওরা দুজনে লক্ষ্য করে, দ্রুতগামী ট্রেনগাড়িটা একটা সোনালি-কালো সাপের মতো এঁকেবেঁকে রাতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিলো। কুটস মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, উইনিফ্রেডের পরিপূর্ণ সুন্দর মুখখানা তার দিকেই ফেরানো। মুখখানা ফ্যাকাসে, বৈশিষ্ট্যময় আর কঠোর—তার মুখের বড্ড কাছাকাছি। দুচোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠে কুটস।

'ট্রেন আমার বিশ্রী লাগে,' কুটসের গলায় আবেগের রেশ।

'কেন?' প্রশ্ন করে উইনিফ্রেড। ওর মুখের আশ্চর্য নরম হাসিটা যেন ওর প্রতি কুটসের আবেগ-অনুভূতিকে সোহাগে ভরিয়ে তোলে।

'জানি না। ট্রেনগুলো একবার এধারে নেমে আসে আবার ওধারে ··'

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি পরিবর্তন পছন্দ করো,' উইনিফ্রেডের কণ্ঠস্বরে মৃদু বিদ্রূপের আভাস।

'আমি জীবনকে ভালোবাসি। কিন্তু এখন ইচ্ছে হয়, যদি আমাকে একটা

ক্রুশেও লটকে দেওয়া হতো।'

তীক্ষ্ণ সুরে হেসে ওঠে উইনিফ্রেড। তারপর তীব্র বিদ্রূপের সুরে বলে, 'তাহলে তোমার পক্ষে কি নিজেকে ক্রুশ বিদ্ধ হতে দেওয়াটাই সব চাইতে কঠিন? আমি তো ভেবেছিলাম, মুক্ত হওয়াটাই কঠিন।'

বাগদত্ত হবার ব্যাপারে উইনিফ্রেডের বিদ্রূপটুকু উপেক্ষা করে কুটস। তারপর ওর উদ্দেশ্যটাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে দ্রুত বলে ওঠে, 'এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অবিশ্যি রাত্রিবেলা খেতে দেরি হলে বা ওই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপারে এখনও আমি উন্মাদ হয়ে উঠি। কিন্তু সে সমস্ত ব্যাপার বাদে ··এখন কিছুতেই কিছু এসে-যায় বলে মনে হয় না।'

উইনিফ্রেড নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

'মানুষ দিন কাটায়, কাজ করে—দিব্যি চলে যায় জীবনটা। তবে কিনা তাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় বলে মনে হয় না।'

'এটা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না, তুমি অসুবিধে নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছো।' উইনিফ্রেড হেসে ওঠে, 'কারণ তোমার অসুবিধে বলতে কিছুই নেই।'

'অসুবিধে···' শব্দটা পুনরাবৃত্তি করে কুটস, 'না, আমার কোনো অসুবিধে আছে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ মানুষ ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাকেই অসুবিধে বলে থাকে। কিন্তু যে ব্যাপারটাতে আমি সত্যিই মনে মনে খুব কষ্ট পাই···না, কিছু না। তেমন কিছু থাকলেই বরং ভালো হতো।'

ফের তীক্ষ্ণ সুরে হেসে ওঠে উইনিফ্রেড। কিন্তু ওর হাসিতে সামান্য হতাশার সুর অনুভব করে কুটস।

'আমি একটা সৌভাগ্যের নুড়ি খুঁজে পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নুড়িটাকে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে কিছু কামনা করবো। তাই সাদা নুড়িটাকে পেছন দিকে ছুঁড়েও দিলাম। কিন্তু চাইতে গিয়ে দেখি, কিছুই মনে আসছে না। নিজেই নিজেকে বললাম, 'কিছু চাও'। নিজেই জবাব দিলাম, 'আমি কিছু চাই নে'। ফের বললাম, 'কিছু চেয়ে নাও, বোকা কোথাকার'। কিন্তু আমি যেন বাসনা-বিহীন-মূক একটা গোসাপ। তারপর যেন খানিকটা ভয় পেয়েই তাড়াহুড়ো করে বলে ফেললাম, 'দশ লক্ষ টাকা'।···অমাবস্যার চাঁদ দেখলে কি চাইতে হয়, জানো?'

'তা হয়তো জানি।' উইনিফ্রেড হেসে ওঠে, 'তবে আমার ইচ্ছেগুলো বড়ো বদলে যায়।'

'আমারটাও যদি তেমনি হতো!' খেয়ালীর মতো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কুটস।

প্রেমের আবেগে কুটসের একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নেয় উইনিফ্রেড। হাতে-হাত রেখে পাহাড়ের বুকে এগিয়ে চলে ওরা। নিচের দিকে গুচ্ছ গুচ্ছ আলোর দীপ্তি। লণ্ডনের বিশাল রোশনাই একটা বিস্ময়ের মতো এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

'জানো...' শুরু করেও থেমে যায় কুটস।

'না...' ব্যঙ্গ ভরা কণ্ঠস্বর উইনিফ্রেডের।

'জানতে চাও?' কুটস হেসে ওঠে।

'হ্যাঁ। না বোঝা অব্দি কেউ স্বস্তি পায় না।'

'কি বুঝবে?' নিষ্ঠুরের মতো প্রশ্ন করে কুটস। সে জানে, উইনিফ্রেড জানতে চায় ওরা দুজনে এখন কি পরিস্থিতিতে রয়েছে।

'কি করে মতের অমিলকে ঘুচিয়ে দেওয়া যায়,' আলোচনার আসল বিষয়টাকে এড়িয়ে যায় উইনিফ্রেড। এর চাইতে ও যদি জিজ্ঞেস করতো, 'আমার কাছ থেকে তুমি কি চাও?' তাহলে খুশি হতো কুটস।

'তুমি যথারীতি আবার সেই প্রতীকতার কুয়াশা নিয়ে এলে।'

'কুয়াশাটা প্রতীকের নয়,' উইনিফ্রেডের কণ্ঠস্বরে অখুশির ধাতব ঝংকার, বরং কুয়াশার মধ্যে মোমবাতিটা প্রতীক হতে পারে।'

'মোমবাতিহীন কুয়াশাই আমার বেশি পছন্দ। আমি যদি কুয়াশা হই, তা হলে আমি তোমার মোমবাতিটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবো—তুমি আরও ভালো করে দেখতে পাবে আমায়। তোমার কথাবার্তার মোমবাতি, তোমার প্রতীক—এসব কিছুই তোমাকে আরও ভুল পথে নিয়ে চলেছে। আমি অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াবো, ঘুরে বেড়াবো নিজের ইচ্ছে মতো, একটা পতঙ্গের মতো—যে পতঙ্গটা উড়ে উড়ে সেই কাঠের বাক্সটার গায়ে গিয়ে বসে, যার মধ্যে তার সঙ্গিনীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

'কিন্তু সেটা কি আলেয়ার পেছনে উড়ে বেড়ানো নয়?'

'হতে পারে। কারণ আমি যদি নিঃশ্বাস ফেলে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে এগোই, তুমি তাহলে দূরে সরে যাও। আর আমি যদি ভাবময়তার শূন্য দীর্ঘশ্বাসে নিজেকে গুটিয়ে নিই, তুমি তখন আমার ঠোঁটের কাছে উড়ে আসো।'

'এই প্রতীকটা কিন্তু দারুণ।' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে মুখর হয়ে ওঠে উইনিফ্রেড।

কুটস সত্যিই ওকে ঘৃণা করে। ও-ও ঘৃণা করে কুটসকে। তবু ওরা শক্ত করে হাতে হাত ধরে পথ চলতে থাকে।

'এক বছর আগে আমরা যেমনটি ছিলাম, এখনও ঠিক তেমনিই আছি',

কুটস হাসে। কিন্তু নিজের হাসি সত্ত্বেও উইনিফ্রেডকে সে ঘৃণা করে।

'সোয়ান অ্যাণ্ড সুগার-লোফ'-এ পৌঁছে ওরা গাড়িতে চাপলো। পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে ঘন হয়ে বসলো দুজনে। এবং যতোক্ষণ ওরা গোলাকার আলোগুলোর নিচ দিয়ে ছুটে চললো, ততোক্ষণ কেউই কোনো কথা বললো না।

গাছের সারিতে ভরা অন্ধকার রাস্তাটায় একটা ছোট্ট বাড়ির ফটকের সামনে দুজনেই থমকে রইলো মুহূর্তের জন্যে। উইনিফ্রেডের বাগান থেকে হেলে পড়া একটা কাগজি-বাদামের গাছে বছরের এই প্রথম দিকেও অজস্র কুঁড়ি। রাস্তার আলোয় চিকমিকিয়ে ওঠা কুঁড়িগুলো সমস্ত পরিবেশটাতে একটা নাটকীয় মাত্রা এনে দিয়েছে।

'এই গাছটাকে আমার সব সময় মনে পড়ে,' একটা ছোটো ডাল ভেঙে নিয়ে কুটস বললো। 'মাঝ রাতে লম্ফের আলোয় গাছটা যখন একেবারে ভরাট আর প্রাণময় হয়ে উঠতো, তখন গাছটার জন্যে যে কি ভীষণ কষ্ট হতো আমার! মনে হতো, গাছটা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।'

'ভেতরে আসবে?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো উইনিফ্রেড।

'শহরে আমি একটা ঘর পেয়েছি,' ওকে অনুসরণ করতে করতে জবাব দিলো কুটস।

দরজার চাবি খুলে উইনিফ্রেড কুটসকে যথারীতি বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এলো। ঘরের সমস্ত কিছুই সেই আগের মতো রয়ে গেছে। সেই স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা রং আর উষ্ণ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার। দেয়ালগুলোতে হাতির দাঁতের রং, পালিশ করা মেঝে, তাতে দেয়ালেব রঙের মতো একই রঙের গালচে বেছানো। ফিকে হলদে রঙের তিনটে আবাম কুর্সি, তাতে বড়ো বড়ো গদি। কালো রঙের একটা বিশাল পিয়ানো। তাব পাশে বেহালা রাখার জায়গা। টুকটুকে লাল আগুনে ঘরটা ভারি উষ্ণ। পুরনো অভ্যেস মতো কুটস পিয়ানোর ওপরে রাখা মোমবাতিগুলোকে জ্বেলে ঘরের পর্দাগুলোকে নামিয়ে দিলো।

'এটা কিন্তু তোমার রুচি অনুযায়ী নয়!' পিয়ানোর ওপরে রাখা গাঢ লাল-রঙা অপরূপ অ্যানেমানি ফুলগুলোকে দেখিয়ে কুটস বললো।

ছোট্ট একখানা আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলোকে পরিপাটি করে নিচ্ছিলো উইনিফ্রেড। একটু থেমে বললো, 'কেন?'

'পিয়ানোর ওপরে!' কুটসের গলায় মৃদু ভর্ৎসনা।

'টেবিলে যখন কাজ হয়, শুধু তখনই ওখানে রাখি,' টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের ছোট্ট স্তূপটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে উইনিফ্রেড মৃদু হাসলো।

'তারপরে আবার লাল ফুল!'

'মনে হয়েছিলো রঙটা ভারি সুন্দর।'

'আমি হলে তোমাকে ক্রিসিয়া কিনতে বলতাম।'

'কেন?' উইনিফ্রেড মৃদু হাসে। এভাবেই কুট্স ওকে খুশি করে তোলে।

'তা ধরো—ওদের ঘিয়ে, সোনালি আবরচাপা নীল-বেগনি রং আর সুগন্ধের জন্যে। তুমি গন্ধহীন ফুল কিনেছো বলে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।'

'কি বলছো তুমি!' উইনিফ্রেড এগিয়ে গিয়ে ফুলগুলোর কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

'আমি খেয়ালই করি নি, ফুলগুলোতে গন্ধ নেই।' উইনিফ্রেডের মুখে এক আশ্চর্য স্মিত হাসি। ফুলগুলোর মখমল-কালো কেন্দ্রগুলোকে স্পর্শ করে ও।

'খেয়াল করলে কি কিনতে?' কুটস প্রশ্ন করে।

উইনিফ্রেড মুহূর্তের জন্যে একটু চিন্তা করে নেয়।

'জানি না সম্ভবত কিনতাম না।'

গন্ধহীন ফুল তুমি কিছুতেই কিনতে না।' কুটস নিশ্চিত হয়ে বলে, 'তেমনি, কোনো পুরুষমানুষ দেখতে সুন্দর বলেই তুমি তাকে ভালবাসবে না।'

'জানি না,' উইনিফ্রেড মৃদু হাসে। ও খুশি হয়ে উঠেছে।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা একটা বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাতিদানে সেটা রেখে গেলেন উনি।

'তুমি কি আমাকে আলোয় ভরিয়ে তুলবে?' কুটস প্রশ্ন করে। মোমবাতির আলোতেই তার সঙ্গে কথা বলা উইনিফ্রেডের অভ্যেস।

'এতোদিন আমি তোমার কথা ভেবেছি, এবারে তোমাকে দেখবো।' উইনিফ্রেডের কণ্ঠস্বর শান্ত, মুখে মৃদু হাসি।

'তোমার সিদ্ধান্তটা যে সঠিক, তা যাচাই করে নেবে বলে?'

কুটসের অনুমানটা যথার্থ বলে স্বীকার করে নেবার জন্যেই উইনিফ্রেড দ্রুত চোখ তুলে তাকায়, 'ঠিক তাই।'

'তাহলে আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।'

কুটস একছুটে ওপর তলায় উঠে যায়। স্বাধীনতা আর অন্তরঙ্গতার অনুভূতি বড়ো মনোরম। হাত ধোবার সময় প্রতিদিনকার অভ্যেস মতো সাবানের ফেনায় হাত দুটোকে রগড়াতে রগড়াতে আচমকা অন্য প্রেমিকাটির কথা মনে পড়ে তার। ওর বাড়িতে কুটস সর্বদাই মার্জিত আর রীতিসর্বস্ব—সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেখানে তার আচরণ ভদ্রজনোচিত। কনির কাছে গেলে সে তার আদিম পুরুষালি শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। সেখানে সে কঠোরে-কোমলে

মেশা এক বীরপুরুষ আর কনি এক সুন্দরী কুমারী। ওকে সে চুমু দেয়, ও কি বলবে না বলবে তা স্থির করে দেয়। ও তার বাকদত্ত, তার স্ত্রী, তার রানী। ওর জন্যে কুটস নিজেকে সযত্নে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। পরবর্তী জীবনে ও-ই কুটসকে শাসন করবে—শাসন করবে কুটসের সেই অংশটাকে যেটা শুধু ওরই। কিন্তু কুটসও ওকে ভালোবাসে, ভালোবাসে করুণা আর কোমলতা দিয়ে। উত্তরের সেই যাজক-পল্লীতে বালিশে ওর অশ্রুপাতের কথা মনে হতেই কুটস দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে—নিঃশ্বাস চেপে রাখে পরিস্থিতি সামলাবার শ্রান্তিতে। অস্পষ্টভাবে সে জানে, কনি তাকে ক্লান্ত করে তুলবে। অথচ উইনিফ্রেড তাকে মুগ্ধ করে। সে আর উইনিফ্রেড সত্যিই আগুন নিয়ে খেলছে। উইনিফ্রেডের বাড়িতে এলে সে উদ্দীপ্ত আর ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু উইনিফ্রেড সরল নয়, কোনোদিনও তা হতে পারবে না। তাই কুটসও সরল হতে পারে না, এমন কি নিজের কাছেও না। কোনো কথা না বলে, এতোটুকুও ছলনা না করে, একসঙ্গে হলেই ওরা দুজনে সেই একই খেলা খেলতে শুরু করে। দুজনেই তখন কেঁপে ওঠে, দুজনেই তখন প্রতিরোধহীন আর উন্মুক্ত, দুজনেই তখন ঘৃণা করে একে অন্যকে। তবু এখন ফের ওরা একত্র হয়েছে। উইনিফ্রেডকে কেমন যেন ভয় হয় কুটসের। উইনিফ্রেড বড্ড আবেগময় আর অস্বাভাবিক—ওর কাছে এসে কুটসও অস্বাভাবিক আর আবেগময় হয়ে উঠেছে।

কুটস যখন নিচে নেমে এলো তখন উইনিফ্রেড পিয়ানোতে সুর তুলছে। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে কুটস বললো 'ইংলণ্ডে এসে এই প্রথম হাত মুখ ধুলাম।' উইনিফ্রেড মৃদু হাসলো। নিজে সামান্য নোংরাতে অধীর হয়ে উঠলেও সাময়িক নোংরাতে কুটসের নির্বিকার মনোভাব ওকে ভারি মজা দেয়।

কুটস লম্বা-রোগা মানুষ, ছোটোছোটো হাত পা। চোখ মুখ কর্কশ, খানিকটা কুৎসিত। কিন্তু হাসিটা মনোরম। মানুষটার রূপান্তর উইনিফ্রেডকে বরাবরই মুগ্ধ করে তোলে। বিশেষ করে কুটসের চোখ দুটোকে মাঝে-মাঝে সম্পূর্ণ অন্যরকম বলে মনে হয়। চোখ দুটো কখনও কঠিন, উদ্ধত আর নীল। কখনও গাঢ়, উষ্ণতা আর কোমলতায় ভরা। আবার কখনও তা পশুর চোখের মতো জ্বলে ওঠে।

ক্লান্ত ভঙ্গিমায় কুর্সিতে বসে পড়ে কুটস।

'আমার কুর্সি,' যেন নিজেকেই কথাটা বললো সে।

উইনিফ্রেড মাথাটা নিচু করলো। কাঁচুলির বন্ধন বিহীন ওর দৃঢ় অঙ্গ অঢেল ঐশ্বর্য নিয়ে ঢলে পড়লো পিয়ানোর দিকে। ওর দুকাঁধের মাঝখানে

সংকীর্ণ অবতল অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো কুটস—কি নিটোল পূর্ণতা। একখানা হাত ঝুলিয়ে দিলো উইনিফ্রেড। ওর কনুইয়ের টোলটার গাঢ় ছায়ার দিকে তাকালো কুটস। আস্তে আস্তে যেন এক বিস্মরণের মুহূর্তে তাকে চিনতে পেরে এক গভীর স্নেহের স্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো উইনিফ্রেড।

'ইদানীং কি করছো?'

'কিছু না।' কুটস বললো, 'গত কয়েকটা মাস এতো বৈচিত্র্যে ভরা ছিলো যে আমার মনে হয় তার সমস্ত কিছুই আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে, উঠে যাবে, কোনো চিহ্নও রেখে যাবে না। আমি ভুলে যাবো সেসব কিছুকে।'

উইনিফ্রেডের নীল চোখ দুটো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কুটসের দিকে। কোনো জবাব দেয় না ও। কুটস মৃদু হাসে।

'আর তুমি?' অবশেষে প্রশ্ন করে কুটস।

'আমার কথা আলাদা,' শান্ত গলায় জবাব দেয় উইনিফ্রেড।

'তুমি তোমার স্ফটিক গেলাস নিয়ে বসে থাকো,' কুটস হাসে।

'আর তুমি তখন ঝুঁকে থাকো ··' কথাটা শেষ করে না উইনিফ্রেড।

কুটস হাসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর দুজনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

'জানো, স্বপ্নের মধ্যে একটা বিশ্রী ছবি দেখে আমি ঘেমে উঠি।'

'কার লেখা পড়লে?' উইনিফ্রেড মৃদু হাসে।

'মেরিডিথ।* ভারি স্বাস্থ্যকর,' কুটস হাসলো।

উইনিফ্রেডও হেসে ফেললো ধরা পড়ে।

'তুমি যা চাও, তা সবই কি খুঁজে পেয়েছো?' কুটস জিজ্ঞেস করলো।

'না,' উঁচু গলায় চিৎকার করে উঠলো উইনিফ্রেড।

'ঠিক আছে, খোঁজা শেষ করে নাও। আমি অসুস্থ নই। তুমি?'

'কিন্তু কিন্তু···' উইনিফ্রেড হন্যে হয়ে কথা খুঁজতে থাকে। 'কি করতে চাও তুমি?'

শুধুমাত্র একটু আগে প্রকাশ করে ফেলা চপলতার শোধ নেবার জন্যেই কুটস মুখের রেখা আর চোখ দুটোকে কঠিন করে তোলে।

'স্রেফ চালিয়ে যেতে।'

এই ওদের যুদ্ধক্ষেত্র। উইনিফ্রেড বুঝতে পারে না, কুটস কি করে বিয়ে করতে পারে। ব্যাপারটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কুটসের বিয়ের বিরুদ্ধে ও সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বাঁকানো ভুরুর তলা দিয়ে জাদুকরীর মতো

* জর্জ মেরিডিথ (১৮২৮-১৯০৯)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি।

কুটসের দিকে চোখ তুলে তাকায় ও। গাঢ় নীল আর স্থির দুটি চোখ। কুটস শিউরে ওঠে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। তার অন্য অংশটা—প্রতিদিনকার সাধারণ অংশটার কাছে উইনিফ্রেড বড়ো অকরুণ।

'তুমি কি করে এভাবে চালিয়ে যেতে সাহস পাও, জানি না।'

'সাহসের কথা আসছে কেন? বাধাটা কিসের?'

'জানি না,' অখুশির তিক্ত সুরে জবাব দেয় উইনিফ্রেড।

'আমিও পরোয়া করি না।'

'কিন্তু...' একটানা, আস্তে আস্তে, আসল বক্তব্যে যা দেয় উইনিফ্রেড, 'তুমি তো জানো, তুমি কি করতে চাও।'

'আমি বিয়ে করতে, স্থিতু হতে, উপযুক্ত স্বামী আর যোগ্য পিতা হতে চাই। আমি চাই ব্যবসার অংশীদার হতে, মোটা হতে, একজন সৌজন্যবান ভদ্রলোক হতে—মোট কথা, যা কিছু হওয়া দরকার।'

'চমৎকার!'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাইনি।'

'ওহ্!' বিষাদ আর আত্ম-অবিশ্বাসে কুটসের কণ্ঠস্বর লুপ্ত হয়ে যায়। উইনিফ্রেড গাঢ় চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কুটসের তাতে খারাপ লাগে না, বরং সে খুশি হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা খুবই ভালো—কিংবা হয়তো বা খুব ভালো।' উইনিফ্রেড বলে, 'কিন্তু এ সমস্ত কেন, কুটস? কেন?'

'কেন? কারণ আমি ওসবই চাই।' কুটস বিষয়টা এভাবে ফাজলামোর পর্যায়ে রেখে দিতে পারে না। তাই বলে, 'জানো উইনিফ্রেড—তুমি আর আমি—আমরা দুজন দুজনকে স্রেফ পাগল করে তুলবো। আমরা অস্বাভাবিক হয়ে উঠবো।'

'বেশ। কিন্তু তা হলেও, ও সব কেন?'

'আমার বিয়েটা? কি জানি। হয়তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।'

'মানুষের কতো রকম প্রবৃত্তিই না থাকে,' উইনিফ্রেডের মুখে তিক্ত হাসি।

কথাটা কুটসের মনে একটা নতুন ভাবনা বয়ে আনে।

ক্লান্ত ভঙ্গিমায় নিজের হাত দুটিকে মাথার ওপরে তুলে ধরে উইনিফ্রেড। সুন্দর, সবল দুটি বাহু। ইউরিপিডিসের ব্যাকাইর কথা মনে পড়ে কুটসের: শুভ্র, নিটোল, দীর্ঘ দুটি বাহু। হাত দুটি ওপরের দিকে তোলায় ওর স্তনদুটিও

এখন ওপরের দিকে উঠে এসেছে। আচমকা, যেন জড় পদার্থের মতো, হাত দুটোকে গদির ওপরে নামিয়ে রাখে ও।

'আমি সত্যিই বুঝে পাই না কেন তুমি...কেন আমরা সব সময় অমন মারামারি করবো।' ক্লান্ত স্বরে বললো উইনিফ্রেড—যদিও তাতে ব্যঙ্গের স্পর্শ-টুকু রয়েই গেলো।

'হ্যাঁ, সেটা তুমি করো।' কুটস এই অচল অবস্থাটা আর সহ্য করতে পারছিলো না। তাই একটু হেসে বললো, 'তাছাড়া, দোষটাও তোমার।'

'আমি ভী-ষণ খারাপ,' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললো উইনিফ্রেড।

'তার চাইতেও বেশি খারাপ।'

'কিন্তু সেটাই কি আসল কথা?' উইনিফ্রেড বিরক্তির ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে।

'কোনটা?' কুটস মৃদু হাসে, 'তুমি তো জানো, তুমি শুধু বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করে যাওয়াটাই পছন্দ করো।'

'তা ঠিক,' বিষাদের স্বরে উইনিফ্রেড জবাব দেয়। 'আমি তোমার জন্যে ভীষণ অভাব অনুভব করি। তুমি প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে আমার জন্যে ঐশ্বর্য ছিনিয়ে আনো।'

'ঠিক তাই,' কুটসের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'একদম ঠিক! সে জন্যেই তুমি আমাকে চাও। আমাকে তোমার স্ফটিক গেলাস, তোমার রক্ষাকারী আত্মা হতে হবে। আমার রক্তমাংসের শরীরটার জন্যে তোমার এতোটুকুও মাথা-ব্যথা নেই। হ্যাঁ, তুমি চাও আমি তোমার স্ফটিক গেলাস হবো—যাতে তুমি ভেতরকার জিনিসগুলোকে দেখতে পাবে, আলোর কাছে তুলে ধরতে পারবে। আমি তোমার কাছে লেডি অফ শ্যালটের* পবিত্র আর্শি।'

'তুমি আমার প্রতীকের কুয়াশায় কথা বলছো।'

'বলে থাকলে, তুমি চেয়েছো বলেই বলেছি।'

'আমি তা জানতাম না,' হিম-চোখে কুটসের দিকে তাকায় উইনিফ্রেড। ও রেগে উঠেছে।

'না।'

ফের ওরা একজন অন্যজনকে ঘৃণা করতে থাকে।

'আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে বৃক্কের চর্বি আর নাড়িভুঁড়িগুলো উৎসর্গ করতেন—অন্তত আমার তা-ই বিশ্বাস।' কুটস হাসলো 'বাকি জিনিসগুলো

---

* লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা, যাতে নায়িকা শুধুমাত্র আর্শি'র মাধ্যমেই বাস্তবের ছবি দেখতো।

তাঁরা নিজেরা খেতেন।…তুমি ঈশ্বরী হয়ো না, উইনিফ্রেড।'

'যাজক পত্নীর সঙ্গে এতো পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তুমি যে কেন একটু ভদ্র আচার আচরণ শিখলে না, তা আমি ভেবে পাই না।' হিমভরা বিতৃষ্ণায় জবাব দিলো উইনিফ্রেড।

কুটস চোখ দুটো বন্ধ করে কুসিতে শরীর হেলিয়ে দিলো, পা দুটোকে ছড়িয়ে দিলো উইনিফ্রেডের দিকে।

'আমার ধারণা আমরা সভ্য-বর্বর,' কুটস বিষণ্ণ স্বরে বললো।

তারপর সবাই নিশ্চুপ।

অবশেষে ফের চোখ খুললো কুটস। 'আমাকে এখান থেকে সোজা চলে যেতে হবে, উইনিফ্রেড। এগারোটা বেজে গেছে…' কুটসের মিনতিভরা কণ্ঠস্বর হাসিতে ভরে ওঠে, 'যদিও আমি জানি, তুমি আমাকে রওনা করিয়ে দেবার আগে আমাকে অজস্র গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে মরতে হবে।' বুকের মধ্যে একটা গভীর অথচ অস্পষ্ট যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে ফের দুচোখ বন্ধ করে কুটস। উইনিফ্রেড আগুনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুসিতে বসে রয়েছে। আগুনের আভায় ওর মুখখানি গোলাপি। ওর দিকে না তাকিয়েও ওর বুকের দিকে এগিয়ে যাওয়া ওর শুভ্র কণ্ঠের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে কুটস। নিজের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অন্য এক অজানা উপলব্ধি দিয়ে উইনিফ্রেডকে অনুভব করতে পারে সে। আগুনের আভায় উইনিফ্রেড এখন নিস্পন্দ আর উষ্ণ। অস্পষ্ট ভাবে কুটস অনুভব করে, তার বুকের গভীরে এক নিদারুণ যন্ত্রণা।

'হ্যাঁ,' অবশেষে উইনিফ্রেড বললো, 'এক সঙ্গে থাকলে আমরা এক জন আর এক জনকে শুধু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলবো।'

যে বিষয়টা সম্পর্কে কুটস নিজে এতো নিশ্চিত, এই প্রথম বার উইনিফ্রেডের মুখে তার স্বীকারোক্তি শুনে সে চমকে উঠলো।

'তোমার কোনোদিনও কাউকে বিয়ে করা উচিত নয়,' বললো সে

'কিন্তু তোমার পক্ষে উচিত কাজ হচ্ছে, লাগাম পরার জন্যে মাথাটা এগিয়ে দেওয়া—যাতে কেউ তোমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলতে পারে—তাই না?'

'দুলকি চালে কাউকে নিয়ে ছুটে চলার মতো অনেক সদগুণই আমার আছে,' কুটস হাসলো। 'তুমি কি বোঝো না যে আমি তা-ই চাই?'

'ঠিক বুঝি না,' কুটসের কথার জবাবে উইনিফ্রেড হাসলো।

'আমারও তাই মনে হয়।'

'মনে হলেই ভালো।'

কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই চুপ করে থাকে। শুভ্র আলোটা জ্যোৎস্নার মতো একইভাবে জলতে থাকে। লাল আগুনটা জেগে থাকে সূর্যাস্তের আভার মতো। কোথাও এতোটুকু কাঁপন বা অস্থিরতা নেই।

'আর তুমি?' কুটস জিজ্ঞেস করলো।

উইনিফ্রেড খুকখুক করে একটা ক্ষীণ ক্লান্ত হাসি ছড়ালো।

'তোমার কথামতো তুমি যদি জাহাজের ভার কমাবার জন্যে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া জিনিস হও, আমি তবে জাহাজ-ডুবির পরে সমুদ্রে ভেসে থাকা জিনিস—শেষ অব্দি কোনো চড়ায় গিয়ে ঠেকে থাকবো।'

'না, না। তোমার আবার জাহাজ-ডুবি হলো কবে?'

রিনিরিনি স্বরে ঝরে পড়া অশ্রুর মতো হাসলো উইনিফ্রেড।

'ওহ, উইনিফ্রেড—লক্ষ্মীটি।' কুটসের কণ্ঠে হতাশার স্বর।

দুহাতের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে কুটসের দিকে নিজের বাহু দুটি মেলে ধরে উইনিফ্রেড। ওর অপ্রাকৃত মেদুর দুটি চোখে মন্ত্র উচ্চারণের আকুল আহ্বান। ওর তুলে ধরা বাহু দুটির দিকে কুটসের হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে ওঠে। শিউরে উঠে নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে কুটস, আড়ষ্ট করে রাখে নিজের শরীরটাকে। শব্দ শুনে বুঝতে পারে, উইনিফ্রেডের হাত দুটি ভারী হয়ে খসে পড়েছে নিচের দিকে

'আমাকে যেতে হবে,' ক্লান্ত স্বরে বললো কুটস। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতর দিয়ে দ্রুত বয়ে যাওয়া শিহরণের জন্যে শরীরটা একটু টানটান করে নেবার প্রয়োজন হলো তার।

'হ্যাঁ,' উইনিফ্রেড গম্ভীর গলায় সায় জানালো, 'তোমাকে যেতে হবে।'

ওর দিকে ঘুরে তাকালো কুটস। নিচু করে রাখা ভুরুর নিচ থেকে বিধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে উইনিফ্রেড নিজের ছোট্ট শুভ্র অর্কিডের মতো বাহু দুটি ফের তুলে ধরলো কুটসের দিকে। কিছু না জেনেই কুটস সজোরে ওর মণিবন্ধ দুটি চেপে ধরলো, সাদা হয়ে উঠলো উইনিফ্রেডের রক্ত-লাল নখের প্রান্তভাগগুলি।

'বিদায়,' ওর দিকে চোখ নামিয়ে বললো কুটস

উইনিফ্রেড একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ তুলে নিজের মুখখানা ওপরের দিকে তুলে ধরতেই একটা সবল শুভ্র ডাঁটির ওপরে আচমকা ফুটে ওঠা ফুলের মতো ওর মুখ কুটসের মুখের কাছাকাছি এসে উন্মুক্ত হয়ে উঠলো। ও যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছিলো, ভরিয়ে তুলতে চাইছিলো গোটা পৃথিবীটাকে, হয়ে উঠতে চাইছিলো নিঃসীম বায়ুমণ্ডল। কুটস কি করছিলো, তা সে নিজেই জানে না। সে তখন ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে, উইনিফ্রেডের ঠোঁটে তার ঠোঁট,

উইনিফ্রেডের বাহু দুটি ঘিরে রেখেছে তার গ্রীবা, সে তখনও চেপে রয়েছে উইনিফ্রেডের মণিবন্ধ দুটি, চাপের তীব্রতায় যেন রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে তার নখের নিচে। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত এমনি ভাবে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর আলিঙ্গনের ক্লান্তিতে উইনিফ্রেড শিথিল হয়ে উঠলো। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে শুভ্র নিটোল গ্রীবার কানের নিচের অংশটুকু ও এগিয়ে দিলো কুটসের মুখের কাছে। আরও ঝুঁকে চুমু দিতে গিয়ে কুটসের দেহের প্রতিটি তন্তু কেঁপে কেঁপে উঠলো। কিন্তু সেই নিটোল নৈঃশব্দের মধ্যেও উইনি-ফ্রেডের রক্তের অস্ফুট গাঢ় স্পন্দন আর আলোর চিমনির মধ্যে একটা চকিত স্ফুলিঙ্গের অস্পষ্ট আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলো সে।

উইনিফ্রেডকে কুর্সি থেকে টেনে তুলে নিজের কাছে নিয়ে এলো কুটস। উইনিফ্রেডের দুই বাহু তখনও তার গলাটা জড়িয়ে রেখেছে। কুটস নিজের পা দুটোকে দু-ধারে ছড়িয়ে দাঁড়ালো। তারপর উইনিফ্রেডকে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজলো। আচমকা মুখ ফিরিয়ে কুটসের রক্তিম ঠোঁটে নিজের ঠোঁটদুটিকে চেপে ধরলো উইনিফ্রেড। কুটস অনুভব করলো, তার গোঁফ তার নিজের ঠোঁটেই এসে বিঁধছে। এই প্রথম উইনিফ্রেড তাকে সত্যিকারের চুমু দিলো। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েও নিজের রক্তের গভীরে এক তীব্র স্পন্দন অনুভব করলো কুটস। তার মনে হলো, তার সমস্ত শরীরটাই যেন একটা হৃৎপিণ্ড—যা রক্তের স্পন্দনে কুঁকড়ে উঠেছে। এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কুটস অনুভব করলো যেন সে নিজেই, অর্থাৎ এই হৃৎপিণ্ডটাই, আজ রাতে উইনিফ্রেডের মধ্যে রক্তের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

যন্ত্রণাটা এতোই তীব্র হয়ে উঠলো যে তা কুটসকে বিহ্বলতা থেকে সুস্পষ্ট সচেতনতায় নিয়ে এলো। নিজের ঠোঁটদুটিকে সরিয়ে নিয়ে কুটসের কাছে শুধু গলাটা মেলে রাখলো উইনিফ্রেড। ইতিমধ্যেই ওর প্রয়োজন মিটে গিয়েছিলো। নিচু হয়ে ওর ঘাড়ে মুখ রেখে চোখ খুলতেই কুটস চমকে উঠলো। চারদিকে ঘরের অবারিত আসবাব। চোখের ঠিক নিচেই কামনার অস্বাভাবিক নিবৃত্তিতে প্রায় মূর্ছিতা এক নারীর আধো-বোঁজা অক্ষিপক্ষ্ম। দেখেই কুটস বুঝতে পারলো, ওই চুমুটি ছাড়া উইনিফ্রেড তার কাছ থেকে আর কিছুই চায় নি। তার শরীরে ঢলে থাকা এই নারী, যার গলায় চুমু দেবার জন্যে তার ঠোঁট নিচে নেমে আসছিলো—তার আলিঙ্গনে লীন হয়ে থাকা সত্ত্বেও এই নারী ক্রমশ তাকে খারিজ করে দিচ্ছে। একটা স্ফীত ধমনীর মতো তার সমস্ত শরীর তীব্র যন্ত্রণায় আকীর্ণ, অথচ হৃৎপিণ্ডটা বেদনা আর হতাশায় প্রাণহীন।

এই নারী তাকে শুধু যন্ত্রণাই দিয়েছে, মৃত্যুর মতো আচমকা ছিন্ন করে দিয়েছে তাকে। আর অন্য এক নারীর কাছে সে প্রতারক, সে মেকি। যন্ত্রণায় শিউরে উঠে যেন চোখ খুলতেই আসল হাতির দাঁতের বাতিদানটা দেখতে পেলো কুটস। রাগে তার হৃৎপিণ্ডটা ঝলসে উঠলো।

পায়ের এক আচমকা অনৈচ্ছিক আঘাতে বাতিদানের পায়াটাকে ছিটকে ফেললো কুটস। ঝনঝন শব্দে পালিশ করা ঝকঝকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে বাতিদান, নিভে গেলো আলোটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলোর শিখা কেঁপে কেঁপে জেগে উঠলো ওদের সামনে। কুটসের গলায় জড়িয়ে রাখা হাতের বাঁধন সামান্য শিথিল করে উইনিফ্রেড তখন কুটসের গলায় মুখ ডুবিয়ে রেখেছে। নীল শিখাটা মোড় ফিরে ওর পোশাক আর বাহুর দিকে হলুদ জিহ্বা মেলে দিলো। কেঁপে কেঁপে উঠে উইনিফ্রেড কুটসকে আঁকড়ে ধরলো, নিবিড় আলিঙ্গনে প্রায় শ্বাসরোধ করে ফেললো কুটসের—অথচ মুখে কোনো শব্দ করলো না।

উইনিফ্রেডকে উঁচু করে তুলে ঘরের বাইরে বয়ে নিয়ে এলো কুটস। তারপর ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ওর পোশাকের জলন্ত অংশটুকু দুহাতে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেললো। কুটসের মুখে আগুনের ঝলকানি লেগেছিলো। উইনিফ্রেডের দিকে তাকিয়ে, ওকে সে প্রায় দেখতেই পেলো না।

'আমার কিছু লাগে নি।' উইনিফ্রেড আর্তনাদ করে ওঠে, 'কিন্তু তুমি?'

বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা এগিয়ে আসছিলেন। আগুনের শিখা তখন বৈঠকখান ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। উইনিফ্রেডের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে গিয়ে বড়োসড়ো একটা পশমী কম্বল আগুনের ওপরে ছুঁড়ে দিলো কুটস। তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এক মুহূর্ত।

উইনিফ্রেডকে পেরিয়ে যাবার সময় উইনিফ্রেডের কাছে ধরা পড়ে গেলে কুটস।

'না না, আমার লাগেনি,' ছিটকিনি হাতড়াতে হাতড়াতে জবাব দিলো সে। 'আমি একটা নির্বোধ…একটা নিরেট গাড়ল।'

ঝলসে-ওঠা লাল হাত দুটোকে অন্ধের মতো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে পর মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো মানুষটা।

* The Witch A La Mode

মেয়েটি ওর স্বামীকে ভালোবাসে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারে না। ওদিকে স্বামীও আন্তরিকভাবে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, তবু স্ত্রীকে নিয়ে সে বাস করতে পারে না। দুজনেরই বয়েস চল্লিশের নিচে, দুজনেই দেখতে সুন্দর, দুজনারই আকর্ষণীয় চেহারা। ওদের দুজনারই একের প্রতি অন্যের আন্তরিক শ্রদ্ধা। অদ্ভুত বলে মনে হলেও ওদের দুজনারই ধারণা, ওদের বৈবাহিক বন্ধন চিরদিনের। ওরা অন্য কাউকে যতোটা চেনে, একে অন্যকে চেনে তার চাইতে অনেক বেশি গভীরভাবে এবং অনুভব করে অন্যদের চাইতে পরস্পরের কাছে ওরা অনেক বেশি পরিচিত।

অথচ ওরা একত্রে বাস করতে পারে না। ভৌগোলিক দিক থেকে ওরা সাধারণত হাজার মাইল দূরে দূরে থাকে। ইংলণ্ডের ধূসরতায় এক ধরনের বিষণ্ণ সততা নিয়ে স্বামী বসে বসে স্ত্রীর কথা ভাবে—ভাবে ওর বিশ্বস্ততা, আনুগত্য বজায় রাখার আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা এবং দক্ষিণের সূর্যভরা দেশে ওর উদ্দাম বেপরোয়া প্রেম উপাখ্যানের কথা। আর স্ত্রী সমুদ্রের ওপরে ঝোলানো চত্বরে বসে ককটেল পান করতে করতে বিদ্রূপেভরা ধূসর চোখ দুটি মেলে দেয় ওর স্তাবকটির বিষণ্ণ মুখের দিকে, যাকে ও সত্যিই খুব পছন্দ করে—কিন্তু আসলে ও তখন ওর সুদর্শন তরুণ স্বামীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে, ভাবে কিভাবে ওর স্বামী তার সচিবটিকে তার জন্যে কিছু করতে বলছে। ও জানে, স্বামী এমন মার্জিত আর আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কথাটা বলবে যাতে খুশি হয়েই তার অনুরোধটা পালন করবে মেয়েটি।

সচিবটি মানুষটাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করে। মেয়েটি খুবই সুযোগ্যা, বয়েসটাও বেশ কম এবং সুদর্শনা। মেয়েটি তাকে শ্রদ্ধা করে বটে, তবে কিনা চাকর বাকরেরা—বিশেষ করে চাকরানীরা—সবাই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। অ র পুরুষ-চাকররা পারলেই ঠকিয়ে নেয়।

কারুর যদি শ্রদ্ধাবনত একটি সচিব থাকে এবং আপনি যদি তার স্ত্রী হন, তাহলে আপনি কি করতে পারেন? ওদের মধ্যে 'দোষের' বলতে কিছু নেই। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন তো। না না, যাকে 'ব্যভিচার' বলা যায় তেমন কিছুই ওদের মধ্যে নেই। ওরা স্রেফ একটি তরুণ মনিব এবং তার

সচিব। মানুষটা মেয়েটিকে শ্রুতলিপি দেয়, মেয়েটি ক্রীতদাসীর মতো তার হয়ে খাটে আর তাকে শ্রদ্ধা করে এবং এমনিভাবে পুরো ব্যাপারটা চাকার মতো ঘুরে চলে।

মানুষটা কিন্তু মেয়েটিকে শ্রদ্ধা করে না। কারণ সচিবকে শ্রদ্ধা করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু মেয়েটির ওপরে সে নির্ভর করে। 'আমি স্রেফ মিস রেণ্ডলের ওপরে নির্ভর করি।' অথচ স্ত্রীর ওপরে সে কোনোদিনই নির্ভর করতে পারে নি। স্ত্রীর সম্পর্কে যে কথাটা সে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো তা হচ্ছে তার স্ত্রী নির্ভরযোগ্যা হতে চায় নি।

অতএব একদা বিবাহিত হবার ফলে মুখে না-বলা ভয়ংকর অন্তরঙ্গতা নিয়ে ওরা স্রেফ বন্ধু হয়েই ছিলো। সাধারণত প্রতি বছরই ওরা ছুটি কাটাতে বাইরে যেতো এবং ওরা যদি স্বামী-স্ত্রী না হতো তাহলে তখন একে অন্যের মধ্যে অবশ্যই অনেক মজা আর উত্তেজনার বস্তু খুঁজে পেতো। কিন্তু যেহেতু ওরা বিবাহিত, গত কয়েক যুগ ধরে বিবাহিত এবং যেহেতু গত তিন-চার বছর ধরে ওরা একসঙ্গে থাকতে পারছে না—তাই ওদের পুরো আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতো। দুজনেই দুজনার সম্পর্কে মনে মনে একটা তিক্ত অনুভূতি পুষে রাখতো।

কিন্তু ওরা দুজনেই প্রচণ্ড মহানুভব। মানুষটাতো মহানুভবতার একেবারে সাক্ষাৎ অবতার। স্ত্রী যতোই উদ্দাম প্রেম করে বেড়াক না কেন, ওকে সে সত্যিকারের দরদী বলে মনে করে। ওই সমস্ত বেপরোয়া প্রেম-প্রীতি ওর আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ। 'আর যাই হোক, আমাকে বাঁচতে হবে। তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারছি না বলে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা লবণের মিনার হয়ে উঠতে পারি না! আমার মতো মেয়েদের লবণের মিনার হয়ে উঠতে কয়েক বছর সময় লাগে। অন্তত আমি তাই মনে করি।'

'ঠিক!' মানুষটা বলেছিলো, 'ঠিক বলেছো! কিন্তু তুমি দানা বেঁধে যাবার আগে যে করেই হোক ওর মধ্যে কয়েকটা শশা জারিয়ে রেখো। এটা আমার উপদেশ।'

মানুষটা এমনি—ভীষণ চালাকি আর হেঁয়ালিতে ভরা। জারানো শশার ব্যাপারটা স্ত্রী কম-বেশি বুঝতে পারে। কিন্তু 'দাঁনা বেঁধে যাবার আগে'—বলতে কি বোঝাতে চাইলো মানুষটা? সে কি একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে সে নিজে ভালোভাবেই জারানো রয়েছে, কাজেই ফের লবণে চোবানো তার পক্ষে অহেতুক এবং তাতে তার নির্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে? তার মানে তার স্ত্রীই হচ্ছে

লোমা জল আর অশ্রুর উপত্যকা ?

একটা পুরুষ মানুষ সত্যিকারের চালাক-চতুর, হেঁয়ালিময় এবং খানিকটা খেয়ালি হলে যে কতোটা হিংসুটে হয়ে উঠতে পারে তা কিছুই বলা যায় না। বাঁকা ঠোঁটে অসার দম্ভভরা এই মানুষটার খেয়ালিপনা কিন্তু সত্যি প্রশংসার যোগ্য। তবে কি না একটা সুন্দর, সুপুরুষ, ভণ্ডামিতে ভরা, নাটুকে যুবকের পক্ষে অসার না হয়ে আব উপায় কি ? মেয়েবাই তাকে অমনি করে তুলেছে।

ওহ্, নারী। অন্য কোনো নারী না থাকলে পুরুষমানুষরা কতো ভালো'ই না হতো!

আর অন্য কোনো পুরুষ না থাকলে মেয়েরাও না জানি কতো ভালো হতো। একটি সেরা সচিবের ক্ষেত্রেও তাই। তার স্বামী থাকতে পারে—কিন্তু মনিব বা বড়ো সাহেব, যে শুধু মুখে বলে যাবে আর যার প্রতিটি কথা সে বিশ্বস্তভাবে টুকে নিয়ে ছাপার অক্ষরে রূপ দেবে—তার তুলনায় স্বামীটি থাকবে মানুষের একটি ভগ্নাংশ হয়ে। একবার কল্পনা করে দেখুন, স্বামী স্ত্রীকে যা বলছে স্ত্রী তা-ই লিখে নিচ্ছে! কিন্তু সচিব ? মনিবের প্রতিটি 'এবং' আর 'কিন্তু' সে চিরদিনের জন্যে ধরে রাখে। এর কাছে কোথায় লাগে মিষ্টি ভায়োলেট ফুলের তুলনা।

এখন কথা হচ্ছে : যখন আপনি জানেন যে আপনাব একটি স্বামী আছেন যিনি তাঁর সচিবকে শ্রুতিলিপি দেন বলে আপনাব কাছে শ্রদ্ধার পাত্র এবং যখন তাঁর সচিবটিকে আপনি ঘৃণা না কবে বরঞ্চ অবজ্ঞা করেন—তখন দক্ষিণের সূর্য-জ্বলা আকাশের নিচে উদ্দাম প্রেম উপভোগ করতে দিব্যি ভালোই লাগে। কিন্তু চোখে এক কণা বালি পড়লে বা মনের গোপন কোণে কোনো চিন্তা থাকলে ব্যাপারটা আর ততোটা ভালো থাকে না।

কি আর করা যাবে ? অবিশ্যি স্বামী নিজে কিন্তু স্ত্রীকে দূরে পাঠায় নি।

'তোমার সেক্রেটারি আছে, তোলার কাজ আছে।' স্ত্রী বললো, 'কিন্তু এখানে আমার কোনো জায়গা নেই।'

'একটা শোবার ঘর আর একটা বৈঠকখানা শুধু তোমার জন্যেই রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে একটা বাগান আব একটা মোটব গাড়ির আধখানা।' স্বামী জবাব দিলো, 'কিন্তু তোমাব মন যা চায়, যাতে তুমি সব চাইতে বেশি আনন্দ পাবে—তাই করো।'

'তাহলে শীতের দিনে আমি দক্ষিণে যাবো।'

'হ্যাঁ, যেও। সেটা তো তোমার চিরদিনই ভালো লাগে।'

'তা লাগে,' জবাব দিলো মেয়েটি।

ঐকান্তিক আবেগের গোপন-ছোঁয়া-লাগা এক ধরনের কঠোরতা নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো ওরা। স্ত্রী গেলো বেপরোয়া অভিসারে আর স্বামী মন দিলো নিজের কাজে। স্বামীটি মুখে বলে, কাজ করতে তার ঘেন্না লাগে। কিন্তু কাজ ছাড়া সে কোনোদিনই কিছু করে নি। দিনে দশ-এগারো ঘণ্টা কাজ। নিজে নিজের মনিব হলে তা-ই হয়!

তারপর শীত কেটে বসন্ত এলো, সোয়ালো পাখিরা উড়ে চললো ঘরের দিকে—এক্ষেত্রে উত্তর দিকে। অন্যান্য বারের মতো এবারের শীতটাও কাটানো শক্ত হয়ে উঠেছিলো। বেপরোয়া মহিলাটি প্রাণপণে চোখ পিটপিট করেও চোখের বালিটা থেকে মুক্তি পেলো না। সুগন্ধি লজ্জাবতী লতার তলায় বসেও ও ভাবতো, ওর স্বামী পাঠাগারে বসে রয়েছে আর তার সেই নিখুঁত সুদক্ষ অথচ নেহাতই সাধারণ সচিবটি তার সমস্ত কথা চিরদিনের মতো ধরে রাখছে!

'মানুষটা কি করে পারে! আর ওর মতো একটা সাধারণ মেয়েও যে কিভাবে ব্যাপারটাকে সহ্য করতে পারে, আমি জানি না!' স্ত্রী নিজের মনেই চিৎকার করে বলে। 'ব্যাপারটা' বলতে ও শ্রুতিলিপির কথাই বলতে চেয়েছে—যার অর্থ, শুধু একটা পেন্সিল আর অনর্গল বাক্যস্রোতকে মাঝখানে রেখে দিনে দশ ঘণ্টা ধরে দুজনের নিয়মিত মেলামেশা।

কি আর করা যাবে? পরিস্থিতির উন্নতি হবার বদলে এখন আরও অবনতি হয়েছে। সচিবটি তার মা আর বোনকেও এ সংসারে এনে ঢুকিয়েছে। মা এখন এ বাড়ির রাঁধুনী তথা তত্ত্বাবধায়িকা। আর বোনটি একটু মর্যাদাসম্পন্না একজন পরিচারিকা—পোশাক-আশাক সুন্দরভাবে ধোয়া কাচা করে এবং 'তাঁর' পোশাক-আশাকের দিকে নজর রাখে। বন্দোবস্তটা সত্যিই চমৎকার। বুড়ি মা-টি চমৎকার রান্না করে আর একটি খাস-ঝির কাছ থেকে যা কিছু আশা করা যায়, বোনটির মধ্যে তার সব কিছুই আছে—জামা-কাপড় সাফ রাখা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, টেবিলে পরিবেশন করা, সবেতেই ও তুখোড়। দুজনেই হিসেব করে খরচ করে। মনিবের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা দুজনেই ভালোভাবে জানে। পাওনাদারেরা যখন একেবারে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন সচিবটি শহরে দৌড়ে গিয়ে সবকিছু সামলে আসে।

মানুষটা অবশ্যই ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ শোধ করার জন্যেই সে খাটে। সে যদি রূপকথার রাজপুত্তুর হয়ে সাহায্যের জন্যে পিঁপড়েদের ডাকতে পারতো, তাহলেও তাদের কাছ থেকে এই সচিবটি আর ওর পরিবারটির চাইতে বিস্ময়কর কিছু পেতো না। ওরা মাইনে-পত্তর বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেয় না, অথচ

প্রতিদিনই যেন অলৌকিকভাবে সুখ-সুবিধের বন্দোবস্ত করে রাখে।

'ও' অর্থাৎ মানুষটার স্ত্রী—মানুষটাকে ভালোবাসে। কিন্তু ওই স্ত্রীই তাকে 'ঋণগ্রস্ত' করে তুলতে সাহায্য করেছে এবং এখনও ও মানুষটার পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়বহুল। অথচ মহিলা নিজের 'বাড়িতে' ফিরলে সচিব-পরিবারটি ওকে বিশেষ যত্ন আর সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে। ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নাইটরাও এতোটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারতো না। নিজেকে ওর মনে হয় যেন কেনিলওয়ার্থের রানী এলিজাবেথ, যেন সম্রাজ্ঞী তাঁর অনুগত প্রজাদের দেখা দিতে এসেছেন। তবু ওর মনে একটা খুঁতখুতুনি থেকেই যায়: ফের আমাকে সরাতে পারলে কি ওরা খুশি হবে না?

কিন্তু ওরা তাতে প্রতিবাদ জানাতো। না, না। এতোদিন সবাই মিলে ওরই প্রতীক্ষা করছিলো, ও আসবে বলে আশা করেছিলো, প্রার্থনা করছিলো ও আসুক। সবাই একান্তভাবে চাইছিলো, ও এসে বাড়ির ভার নেবে—ও যে বাড়ির কর্ত্রী, মালিকের স্ত্রী · হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী।

'তাঁর' স্ত্রী। তাঁর দিব্যজ্যোতিটা যেন ওর মাথার একটা বোঝা বিশেষ।

রাঁধুনী-মা সবার কাজে ব্যস্ত। তাই খাস-ঝি কন্যাটিই ফরমাশ নিতে আসে।

'আসছে কাল দিনেরবেলায় আর রাতে কি খাবার হবে, মিসেস গ্যি?'

'সাধারণত তোমরা কি রান্না করো?'

'আমাদের ইচ্ছে, কি রান্না হবে তা আপনিই বলে দেবেন।'

'না, তা নয়। সাধারণত তোমরা কি খাও?'

'আমরা ধরা-বাঁধা কিছু খাই না। মা বাইরে গিয়ে সব চাইতে ভালো আর তাজা জিনিস যা পায় তা-ই পছন্দ করে নিয়ে আসে। কিন্তু মা ভেবেছিলো, এখন থেকে কি আনতে হবে তা আপনিই বলে দেবেন।'

'আমি ওসব জানি নে। ওসব ব্যাপার আমি খুব একটা ভালো বুঝিও না। ওঁকে আগের মতোই চালিয়ে নিতে বলো। উনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সব চাইতে ভালো বুঝবেন।'

'মিষ্টিটা কি হবে, বলবেন?'

'না, মিষ্টি নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আর তুমি তো জানো যে মিঃ গ্যি-ও মিষ্টি পছন্দ করেন না। কাজেই আমার জন্যে মিষ্টিফিষ্টি বানিয়ো না।'

এর চাইতে অসম্ভব কাণ্ড আর কি হতে পারে। বাড়িটা ওরা ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে, যেন স্বপ্নের মতো চালাচ্ছে সংসারটা। ওর মতো একটা অযোগ্য অসংযত স্ত্রী কি সাহসে এর মধ্যে নাক গলাবে! বিশেষ করে ওরা যখন

স্রেফ বিনি খরচাতেই সংসারটা টেনে নিয়ে চলেছে। সত্যিই ওরা চমৎকার।

'তোমার কি মনে হয় না, ওরা খুব ভালোভাবেই সবকিছু চালাচ্ছে ?' ওকে একটু বাজিয়ে দেখার জন্যে স্বামী প্রশ্ন করেছিলো।

'সাংঘাতিক ভালোভাবে! প্রায় রোম্যান্টিকভাবে।' ও জবাব দিয়েছিলো। 'কিন্তু আমার ধারণা তুমি একেবারে নিখুঁত সুখে রয়েছো। তাই কি ?'

'আমি দিব্যি আরামেই আছি।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি! আশ্চর্য হবার মতো আরাম! এমন আরাম আমি জন্মেও দেখিনি! কিন্তু এটা যে তোমার পক্ষে খারাপ নয়, সে বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত ?'

লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো ও। লোকটা দেখতে দারুণ সুন্দর, নাটুকে চালচলন শুরু; মানুষটাকে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। সাজ-পোশাক তো একেবারে চমকে দেবার মতো। ওর মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঋজুতা আর চমৎকার রসিকতাবোধ আছে, যা পুরুষমানুষের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

'না' ঠোঁট থেকে তামাকের নলটা নামিয়ে ওর দিকে একরাশ খেয়ালি হাসি ছড়ালো মানুষটা। 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, সেটা আমার পক্ষে খারাপ হয়েছে ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো ও। স্বাভাবিক কারণেই এবারে ও একটু চিন্তা করে নিলো। কারণ আজকালকার দিনে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর সমস্ত রকম সুখের কথাই ওর চিন্তা করার কথা।

তারপরেই ও অবিশ্যি প্রতিসরণকারী স্রোতে ভেসে যায়।

'তোমার পক্ষে ভালো হলেও, হয়তো তোমার কাজকর্মের পক্ষে এটা ততোটা ভালো নয়,' খানিকটা নিচু গলায় বললো ও। ও জানতো, মানুষটার কাজকর্ম সম্পর্কে ও কোনো বিদ্রূপ করলে, মানুষটা মুহূর্তের জন্যেও তা সহ্য করতে পারে না। আর স্ত্রীর গলার এই নিচু স্বরটাও মানুষটা ভালোভাবে জানে।

'কোন্ দিক দিয়ে ?' মানুষটার লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

'তা জানি নে,' স্ত্রী নির্বিকারভাবে জবাব দেয়। 'তবে পুরুষমানুষ অত্যধিক আরামে থাকলে, সেটা হয়তো তার কাজকর্মের পক্ষে ভালো হয় না।'

'সেটা তো আমার জানা নেই।' তামাকের নলটা টানতে টানতে নাটকীয় ভঙ্গিতে পাঠাগারের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে নেয় মানুষটা। 'আমি ঘড়ি ধরে দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করি, দিন ছোটো হলে দশ ঘণ্টা। কাজেই তুমি বলতে

পারো না, সহজ আরামে আমার পতন হয়েছে।'

'না, তা পারি না,' স্ত্রী স্বীকার করে নেয়।

তবু ও কথাটা চিন্তা করে। মানুষটার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শুধু ভালো খাবার-দাবার বা একটা নরম বিছানার ওপরে ততোটা নির্ভর করে না। আসলে কারুর ওপরে বা কিছুর ওপরেই সে নির্ভর করে না। তাহলে আর কি করা যাবে? মাঝরাতের নিস্তব্ধতায় দূর থেকে মানুষটার নিঃসঙ্গ একঘেয়ে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও—যেন স্যামুয়েলের প্রতি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। মানুষটা শ্রুতলিপি দিয়ে চলেছে। স্ত্রী কল্পনার চোখে দেখতে পায়, সচিবটির ছোটোছোটো আঙুলগুলো ব্যস্ত ভঙ্গিমায় লিখে নিচ্ছে তার প্রতিটি কথা। তারপর ভোরের আলোয় বাড়ির অন্য এক প্রান্ত থেকে পতঙ্গের গুঞ্জনের মতো টাইপ রাইটারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে আসে—মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ঘাস-পোকা ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে চলেছে ক্রমাগত। আসলে বেচারী সচিবটি তখন নিজের সাংকেতিক লিপি দেখে দেখে টাইপের কাজটা সেরে রাখে। ওদিকে মানুষটা তখনও বিছানায়, দুপুরের আগে সে কোনোদিনই ঘুম থেকে ওঠে না।

সচিব মেয়েটির বয়েস মাত্র আঠাশ, কিন্তু নিজেকে ও হাড়েমাসে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। মেয়েটি দেখতে ছোটোখাটো আর দিব্যি সুন্দরী, কিন্তু আসলে একেবারে ক্লান্ত। মানুষটার চাইতে ওর কাজের বহর অনেক বেশি। কারণ ওকে শুধু মানুষটার উগরে দেয়া কথাগুলোই লিখে নিতে হয় না, সেগুলোকে তিনটে নকল সহ টাইপ করেও রাখতে হয়। অথচ মানুষটা তখন বিশ্রাম নেয়।

'মেয়েটা যে এর মধ্যে কি পায়, আমি জানি না।' স্ত্রী ভাবে, 'ওতো একেবারে হাড়ে হাড়ে ক্লান্ত। কারণ একে তো এতো কম মাইনে, তার ওপরে মানুষটা ওকে কোনোদিনও চুমু দেয় নি। আমি যদি মানুষটাকে এতোটুকুও চিনে থাকি, তাহলে চুমু সে ওকে কোনোদিনই দেবে না।'

কিন্তু মানুষটা তার সচিবকে কোনোদিনও চুমু না দেওয়ায় পরিস্থিতিটা ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে, স্ত্রী তা বুঝে উঠতে পারে না। আসলে সে কোনোদিনই কাউকে চুমু দেয় নি। ও নিজে—তার মানে, মানুষটার স্ত্রী—মানুষটার চুমু পেতে চেয়েছে কি না, সে সম্পর্কে ওর নিজেরও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। ওর ধারণা, ও তা চায় না।

তাহলে ও কি চায়? ও মানুষটার স্ত্রী। মানুষটার কাছে ও কি চায় তাহলে?

ও নিশ্চয়ই মানুষটার কথাগুলো সাংকেতিক লিপিতে দ্রুত লিখে নিয়ে ফের সেগুলোকে টাইপ করতে চায় না। আর ও খুব ভালো করেই জানে যে ও সত্যিই চায় না, মানুষটা ওকে চুমু দিক। হ্যাঁ, মানুষটাকে ও বড্ড বেশি চেনে। কোনো পুরুষ মানুষকে খুব ভালোভাবে চিনলে তার চুমু পেতে ইচ্ছে হয় না।

তাহলে? তাহলে ও কি চায়? মানুষটার সম্পর্কে ওর তাহলে কেন এতো অস্বাভাবিক ঝোঁক? স্রেফ তার স্ত্রী বলে? কেন অন্য পুরুষদের সাহচর্য ও উপভোগ করে, অথচ গভীরভাবে কোনোদিনও তাদের গ্রহণ করে না? কেন ভোগের প্রতি ওর এতো সুতীব্র আকর্ষণ? অথচ স্বামীকে সত্যিকারের উপভোগ করতে না পারলেও, কেন তাকে ও এতো গভীরভাবে নিয়েছে?

অবিশ্যি মানুষটার সঙ্গে ও অতীতে অনেক সময়ই আনন্দে কাটিয়েছে। কিন্তু তা অতীতে···আগে··যখন—যাকগে! সে তো হাজারটা জিনিসের আগে, সব মিলিয়ে যার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু এখন মানুষটাকে আর ভালো লাগে না। এমন কি মানুষটার কাছে থাকতেও ইচ্ছে হয় না। পরস্পরের কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও এখন ওদের মধ্যে সর্বদা এক অবিরাম নীরব উত্তেজনা জেগে থাকে, যা কিছুতেই ভেঙে যায় না।

বীভৎস! এর নাম বিয়ে! কিন্তু কি আর করা যাবে? সব চাইতে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, সব কিছু জেনে শুনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে!

আরও একবার বিদেশ থেকে বাড়িতে এলো ও এবং তখনও নিজের বাড়িতে, এমন কি নিজের স্বামীর কাছেও, ও একজন বিশেষ অতিথি হয়েই রইলো। সচিব পরিবারটি তখনও মানুষটার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছে।

জীবন উৎসর্গ! কিন্তু আসলে কি করছে! তিনটি মহিলা মানুষটার জন্যে দিবারাত্রি নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে! আর বিনিময়ে ওরা কি পাচ্ছে? একটা চুমুও না! টাকা-পয়সাও পাচ্ছে খুবই সামান্য, কারণ ওরা মানুষটার ধার-দেনার কথা সবই জানে এবং তার ধার শোধ করার ব্যাপারটাকেই ওরা জীবনের ব্রত হিসেবে মেনে নিয়েছে। এতোটুকু প্রত্যাশা পর্যন্ত নেই! দিনে বারো ঘণ্টা কাজ!

আর তা বাদে? কিচ্ছুটি না! মাঝে-মধ্যে খবরের কাগজে মানুষটার নাম আর ছবি দেখে হয়তো ওরা খানিকটা গর্ব আর গুরুত্ব অনুভব করে। কিন্তু সেটাই একেবারে যথেষ্ট বলে কেউ বিশ্বাস করবে কি?

অথচ এই কাজকেই ওরা শ্রদ্ধা করে। ব্রতধারী মানুষের মতো ওরা যেন এর ভেতরেই গভীর তৃপ্তি খুঁজে পায়। অসাধারণ।

বেশ তো, ওরা যদি এতেই তৃপ্তি পায় তো পাক না। অবিশ্যি ওরা নেহাতই 'সাধারণ' মানুষ। ওদের কাছে এ ধরনের কাজে খানিকটা মোহিনী আকর্ষণ থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু মানুষটার পক্ষে এটা খারাপ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তার লেখা আজকাল অহেতুক ফেনানো হচ্ছে, গুণগত মান খারাপ হচ্ছে। আর কি আশ্চর্য কাণ্ড, তার পুরো স্বরটাই এখন নেমে আসছে...ক্রমশ সাদামাঠা হয়ে উঠছে! হ্যাঁ, ব্যাপারটা তার পক্ষে খারাপ বৈকি!

ও অনুভব করে, মানুষটাকে রক্ষা করার জন্যে স্ত্রী হিসেবে ওর কিছু করা উচিত। কিন্তু কি করে করবে? ওই চমৎকার, নিবেদিত-প্রাণ সচিব পরিবারটির ওপরে ও কিভাবে আক্রমণ হানবে? অথচ ওদের ঝেঁটিয়ে বিস্মরণে পাঠাতে পারলেই ও সব চাইতে বেশি খুশি হতো। হ্যাঁ, মানুষটার পক্ষে ওরা অবশ্যই খারাপ। ওরা মানুষটার কাজকর্ম, লেখক হিসেবে তার সুনাম, তার জীবন—সবই নষ্ট করে ফেলছে। ক্রীতদাসের মতো সেবা দিয়ে ওরা সর্বনাশ করে ফেলছে মানুষটাকে।

তাহলে ওর অবশ্যই উচিত, ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কিভাবে? এতো ভক্তি শ্রদ্ধা! তার বদলে ওর এমন কি আছে, যা ও মানুষটাকে দিতে পারবে? নিশ্চয়ই যমন ক্রীতদাস-সুলভ ভক্তির অঞ্জলি নয় অন্তত মানুষটার অমন বাক্য স্রোতের কাছে তো নয়ই।

সচিব এবং ওর পরিবারটিকে বাদ দিয়ে আরও একবার মানুষটার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠলো ও। এ যেন উলঙ্গ শরীরটাকে জঞ্জালের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলা। সেটা করা যায় না।

অথচ একটা কিছু করতেই হবে। এটা ও অনুভব করে। আরও কয়েক হাজার পাউণ্ড ধার করে, বিলটা যথারীতি মানুষটার কাছে পাঠিয়ে দিতে ভীষণ লোভ হয় ওর।

কিন্তু না। আরও সাংঘাতিক কিছু করতে হবে!

হয় আরও সাংঘাতিক কিছু, নয়তো আরও কোমল কিছু। দুইয়ের মাঝে দুলতে থাকে ও। এবং এই দোদুল্যমান অবস্থার প্রথমটাতে ও কিছুই করে না, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, শূন্যতার ভেতরে টেনে টেনে কাটিয়ে দেয় দিনের পরে দিন—অপেক্ষা করে থাকে ফের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মতো যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চয় করার জন্যে।

এটা বসন্ত কাল। বসন্তের দিনে এখানে এসে হাজির হয়ে কি বোকা-

ঘোটাই না করেছে ও! আর ওর বয়েসটাও তো চল্লিশ হলো! চল্লিশ বছর বয়েস হওয়া একজন মহিলার পক্ষে যে কি বিশ্রী ব্যাপার!

সেদিন বিকেলে পাখিগুলো যখন ঝোপঝাড় থেকে তারস্বরে শিস দিচ্ছে, উষ্ণ আকাশটা যেন ঝুঁকে নেমে এসেছে নিচের দিকে আর ওর কিছুই করার নেই—তখন বাগানে বেড়িয়ে এলো ও। বাগানটা ফুলে ফুলে ভরা। ফুল-গুলোর নাটকীয় বিন্যাসের জন্যে ওর স্বামী ফুল ভালোবাসে। চারদিকে লাইল্যাক আর স্নোবলের ঝোপ, ল্যাবর্নাম আর রেড মে, টিউলিপ আর অ্যানেমোনি আর রঙিন ডেইজি। অংসখ্য ফুল! ফরগেট মি নট-এর পাড়! ব্যাচেলার্স বাটনস! কি অদ্ভুত সব নাম! ও হলে ওদের নাম দিতো নীল-ফুটকি, হলদে ফোঁটা আর সাদা-ঝালর। ওর মধ্যে আবেগ-টাবেগের অতো প্রাবল্য আদপেই নেই।

নিজের ভেতরে সাড়া জাগাবার মতো কোনো বস্তু না থাকলে, পত্রালির শোভা আর কোবাস দলের মেয়েদের মতো অসংখ্য ফুলের বাহারে বসন্ত ঋতুকে কেমন যেন জমকালো নাটুকে আর বোকাটে বলে মনে হয়। এবং মিসেস গ্যির মধ্যে সে বস্তুটি একেবারেই নেই।

কি কাণ্ড! বেড়াঝোপের ওধারে কার যেন একটা স্থির, নাটকীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ও। হে ঈশ্বর!···মানুষটা বাগানে বসে সচিবটিকে শ্রুতলিপি দিচ্ছে যে! হা ভগবান, এর কাছ থেকে পালাবার মতো কি কোনো জায়গা নেই!

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় ও। পালাবার মতো অসংখ্য পথ রয়েছে। কিন্তু পালিয়ে কি লাভ? মানুষটা ক্রমাগত শুধু বলবে আর বলবে। নিঃশব্দে বেড়া ঝোপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান পাতলো ও।

সাময়িক পত্রিকার জন্যে আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে মুখে মুখে একটা প্রবন্ধ বলে যাচ্ছে মানুষটা। 'আধুনিক উপন্যাসে যে বস্তুটির অভাব, তা হচ্ছে স্থাপত্যশিল্প।' হায় ভগবান! বলে কিনা, স্থাপত্য শিল্প! মানুষটা হয়তো এ কথাও বলতে পারে: আধুনিক উপন্যাসে যে বস্তুটির অভাব, তা হচ্ছে তিমির হাড়, কিংবা চায়ের চামচ অথবা দাঁত ওঠার বিলম্ব।

অথচ সচিবটি মানুষটার সমস্ত কথাগুলোই শুধু লিখছে আর লিখছে আর লিখছে। নাঃ, এমনি ভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না! রক্তমাংসের শরীরে আর সহ্য হয় না।

কাসুন্দি রঙের দামি রেশমি জামা আর ঘি রঙের ঢেউ তোলা স্কার্ট পরা বলিষ্ঠ মহিলাটি শিকারের সন্ধানে এগিয়ে চলা নেকড়ের মতো নিঃশব্দে বেড়া-ঝোপটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো। ওর পা দুটি দীর্ঘ আর সুগঠিত, জুতো

জোড়াও মহার্ঘ।

নেকড়ের মতোই চুপিসাড়ে বেড়াঝোপটা পেরিয়ে মহিলা সামনের ছায়া ভরা সবুজ ঘাসজমিটার দিকে তাকালো। দুর্বিনীতের মতো অসংখ্য ডেইজি ফুটে রয়েছে ওখানটাতে। গোলাপি ফুলে ভরা একটা বাদাম গাছে ঝোলানো দড়ির রঙিন দোলনাতে আধ শোয়া হয়ে বসে রয়েছে মানুষটা। পরনে সাদা সার্জের পাতলুন আর হলদে লিনেনের পাতলা জামা। মানুষটার একটা হাত সৌষ্ঠবময় ভঙ্গিতে দোলনা থেকে ঝুলে রয়েছে আর নিজের কথার সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্ছে ক্রমাগত। অদূরে একটা কাঠের টেবিলের পাশে বসে সবুজ পোশাক পরা সচিবটি হাতের খাতার কালো চুলভরা মাথাটা গুঁজে ত্রস্ত হাতে সাংকেতিক লিপিতে মানুষটার কথাগুলো লিখে নিচ্ছে। মানুষটার কথাগুলো শুনে শুনে লেখা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়—ধীরে ধীরেই বলে যাচ্ছে সে আর ঝুলে থাকা হাতটা দিয়ে কথার ছন্দে ছন্দে তাল রাখছে একটানা।

'প্রতিটা উপন্যাসে এমন একটি অসাধারণ চরিত্র অবশ্যই থাকবে যা প্রত্যেকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে মানবিক দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া সত্ত্বেও আমরা সর্বদা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি '

স্ত্রী বিষণ্ন মনে ভাবে, প্রতিটা পুরুষই নিজের কল্পনার নায়ক—কিন্তু ও ভুলে যায়, প্রতিটি নারী একান্তভাবেই নিজের নায়িকা।

কিন্তু শ্রুতলিপি লেখায় মগ্ন সচিবটির প্রায় পায়ের কাছে একটা নীলকণ্ঠ পাখিকে ছুটে যেতে দেখে স্ত্রী চমকে ওঠে। নীলকণ্ঠ না হলেও, পাখিটা নীলই বটে—নীল আর ধূসর আর সামান্য একটু হলুদ। কিন্তু বসন্তের এই আবছা আলোয় ভরা সরস বিকেলে পাখিটাকে ওর নীল বলেই মনে হলো। নীল পাখিটা ডানায় ঝটপটানি তুলে সুন্দরী কিন্তু 'সাধারণ' সচিবটির পায়ের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

নীল পাখি! সুখের নীলকণ্ঠ! আমি ধন্য, স্ত্রী ভাবলো আমি সৌভাগ্যবতী!

ও যখন নিজেকে আশীর্বাদধন্য সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছে, তখনই হঠাৎ আরও একটা নীলকণ্ঠ পাখি ছুটে এসে প্রথম পাখিটার সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করলো। একজোড়া সুখের নীলকণ্ঠ সুখ নিয়ে লড়াই করছে! আহা, কি ভাগ্য আমার!

ও কিন্তু কাজে নিবিষ্ট অন্য মানুষদুটোর মোটামুটি চোখের আড়ালেই ছিলো। কিন্তু নীল পাখি দুটোর লড়াইতে 'মানুষটার' মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটলো,

ওদের ছোটোছোটো পালক তখন বাতাসে উড়তে শুরু করেছে।

'যাও এখান থেকে।' পাখি দুটোর দিকে একটা গাঢ় হলদে রঙের রুমাল দুলিয়ে মানুষটা নরম গলায় বললো, 'তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো অন্য কোথাও লড়াই করে ফয়শালা করে নাও মশাইরা!'

সচিবটি ইতিমধ্যেই কথাগুলো লিখতে শুরু করে দিয়েছিলো, দ্রুত ও চোখ তুলে তাকালো। ওর দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে নিজস্ব মেয়েলী হাসিটি ছড়ালো মানুষটা।

'না না, এগুলো লিখো না,' মানুষটার কণ্ঠে স্নেহের সুর। 'পাখি দুটো কিভাবে একটা অন্যটাকে চেপে ধরেছিলো, দেখেছো?'

'না!' মেয়েটি ঝলমলে চোখে চারদিকে তাকায়। একটানা কাজে ওর চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু নিজের পেছন দিকে মহিলাটির বলিষ্ঠ সৌষ্ঠবময় নেকড়ের মতো শরীরটা ও ঠিকই দেখতে পেলো। আতংক নেমে এলো ওর চোখ দুটিতে।

'আমি দেখেছি!' প্রচণ্ড খাটো ঝুলের স্কার্টের তলা থেকে মেয়ে-নেকড়ের মতো আশ্চর্য দুই সুগঠিত পা বাড়িয়ে স্ত্রী এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

'কি অসাধারণ হিংসুটে বদমেজাজী জীব, তাই না?' স্বামী বললো।

'অসাধারণ!' নিচু হয়ে খসে পড়া একটা বুকের পালক তুলে নিলো স্ত্রী, 'দ্যাখো, কেমন পালক উড়ছে!'

পালকটাকে আঙুলের ডগায় রেখে সেদিকে তাকালো ও। তারপর তাকালো সচিবটির দিকে, তারপর স্বামীর দিকে। ওর দুই ভ্রূরেখার মাঝখানে নেকড়ের মতো এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি।

'আমার মনে হয়,' স্বামী বলতে শুরু করে, 'এখনকার বিকেলগুলো সব চাইতে সুন্দর। রোদ নেই—কিন্তু সমস্ত শব্দ বর্ণ আর গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে একত্রে বসন্তের দিকে ছুটে চলেছে। এ যেন ভেতরে থাকার মতো অবস্থা—মানে ডিমের খোসা ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্যে তৈরি হয়ে থাকা!'

'ঠিক তাই!' বিশ্বাস না হলেও, স্ত্রী সায় জানায়।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সচিব মেয়েটি কিছুই বলে না। ভদ্রমহিলা চলে যাবে বলে অপেক্ষা করে থাকে ওরা দুজনেই।

'তোমরা দুজনে নিশ্চয়ই যথারীতি ভয়ংকর ব্যস্ত!' স্ত্রী প্রশ্ন করে।

'তেমন কিছু নয়,' স্বামী প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মুখ কোঁচকায়।

ফের এক শূন্যগর্ভ স্তব্ধতা, তারই মধ্যে স্ত্রী চলে যাবে বলে স্বামী ফের

অপেক্ষা করতে থাকে।

'আমি জানি, আমি তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি।' স্ত্রী বলে।

'সত্যি বলতে কি,' স্বামী জবাব দেয়, 'এই মাত্র আমি ওই নীল পাখি দুটোকে লক্ষ্য করছিলাম।'

'এক জোড়া ছোট্ট দানব!' স্ত্রী ফুঁ দিয়ে আঙুলের ডগা থেকে হলদে পালকটাকে উড়িয়ে দেয়।

'সত্যি তাই!'

'আমি বরঞ্চ যাই, তোমরা কাজ করো।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই!' প্রশান্ত সদাশয়তায় স্বামী জবাব দেয়, 'সত্যি বলতে কি, ঘরের বাইরে কাজ করতে এসে খুব একটা লাভ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।'

'এ ধরনের চেষ্টাটা করতে গেলে কেন? তুমি তো জানো, তুমি কোনোদিনও এভাবে কাজ করতে পারবে না!'

'হয়তো এতে একটু পরিবর্তন হতে পারে ভেবে মিস রেক্সলই প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার কি তা মনে হচ্ছে, মিস রেক্সল?'

'আমি দুঃখিত,' সচিব মেয়েটি জবাব দেয়।

'তুমি দুঃখিত হতে যাবে কেন?' নেকড়ে যেমন করে সদাশয় দৃষ্টিতে বাদামি-কালো বর্ণসংকর কুকুরের দিকে তাকায়, তেমনি ভাবে স্ত্রী মেয়েটির দিকে তাকায়, 'ওঁর ভালোর জন্যেই তুমি প্রস্তাবটা দিয়েছিলে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত!'

'আমি ভেবেছিলাম, বাইরের বাতাসটা ওঁর পক্ষে ভালো হবে,' মেয়েটি স্বীকার করে নেয়।

'তোমার মতো মেয়েরা কখনও নিজেদের কথা ভাববে না কেন?' স্ত্রী প্রশ্ন করে।

মেয়েটি ওর চোখের দিকে তাকায়।

'হয়তো ভাবি, তবে অন্য ভাবে,' জবাব দেয় ও।

'একেবারে আলাদা ভাবে!' স্ত্রী বিদ্রূপের সুরে বলে। 'কেন তুমি ওঁকে তোমার কথা ভাবাও না? বসন্তের এমন একটা নরম বিকেলে তোমার উচিত ওঁকে দিয়ে কবিতা বলানো—তোমার সুন্দর পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে থাকা সুখের নীলকণ্ঠ পাখিগুলোকে নিয়ে কবিতা। আমি জানি, আমি ওঁর সচিব হলে তা-ই করাতাম।'

সবাই একেবারে মৃতের মতো নিশ্চুপ। স্ত্রী নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর শরীরের অর্ধেকটা মেয়েটির দিকে ঘোরানো, বাকিটা অন্য দিকে। সমস্ত কিছুর দিকেই অর্ধেক পেছন ফিরে থাকে ও।

সচিব মেয়েটি গৃহস্বামীর দিকে তাকায়।

'সত্যি বলতে কি, আমি উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখাচ্ছিলাম,' স্বামী জানায়।

'জানি,' স্ত্রী বলে, 'কিন্তু সেটা তো আরও বীভৎস ব্যাপার। একজন ঔপন্যাসিকের জীবনে কোনো প্রাণময়তা নেই কেন?'

তারপর এক দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা। স্বামীটিকে দেখে ব্যথিত, পরিত্যক্ত, একটা পাথুরে মূর্তি বলে মনে হয়। সচিব মেয়েটি মাথা হেঁট করে বসে থাকে। স্ত্রী আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে যায়।

'আমরা কোন্ অব্দি এসেছিলাম, মিস বেক্সল?' আচমকা মানুষটার কণ্ঠস্বরে সচিব মেয়েটি চমকে ওঠে। ভীষণ বিশ্রী লাগছিলো ওর। ওদের, মানে ওর আর মানুষটার, সুন্দর সম্পর্কটাকে কি না এমন ভাবে অপমান করা হলো! কিন্তু খুব শীঘ্রিই মানুষটার বাক্যস্রোতে ও সম্পূর্ণ ভেসে যায়। এতো ব্যস্ত হয়ে ওঠে যে ব্যস্ততার উদ্দীপনা ছাড়া অন্য কিছুই অনুভব করতে পারে না।

চায়ের সময় এসে গেলো। সচিবের বোনটি চায়ের ট্রে নিয়ে বাগানে এলো। আর ঠিক তক্ষুনি মানুষটার স্ত্রীও ফের এসে হাজির হলো। ইতিমধ্যে ও পোশাক বদলে এসেছে, ওর পরনে মিহি কাপড়ের নীল পোশাক। সচিব মেয়েটি কাগজ-পত্র গুছিয়ে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু স্ত্রী ওকে ডাকলো,'তুমি যেও না, মিস বেক্সল।'

সচিব মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললো, 'আমি যাবো বলে মা আশা করছেন।'

'তাঁকে বলো, তুমি যাচ্ছো না। আর তোমার বোনকে আর একটা পেয়ালা নিয়ে আসতে বলো। আমার ইচ্ছে, তুমি আমাদের সঙ্গে চা খাবে।'

মিস বেক্সল মনিবের দিকে তাকালো। মানুষটা একটা কনুইয়ে শরীরের ভর রেখে সোজা হয়ে বসেছে—কেমন যেন প্রহেলিকার মতো লাগছে ওঁকে। এক পলক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে ছেলেমানুষের মতো অমনোযোগিতায় বললো, 'হ্যাঁ, অন্তত একটি বার তুমি আমাদের সঙ্গে বসে চা খাও।'

মানুষটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো মেয়েটি। তারপর মাকে বলে আসার জন্যে দ্রুতপায়ে চলে গেলো। একটা রেশমি পোশাক গলিয়ে আসার

মতো বেশ খানিকটা দেরীও করলো ও।

'দারুণ ফিটফাট হয়ে এসেছো তো।' মেয়েটি নীল রঙের রেশমি পোশাকটা পরে ফের বাগানে এসে হাজির হতেই মিসেস গি্ন্য বললো।

'আমার পোশাকের দিকে আর তাকাবেন না,' মিস রেক্সল বললো,'আপনার পোশাকের তুলনায় এটা কিছুই নয়!' যদিও দুজনের পোশাক একই রঙের।

'অন্তত তোমার পোশাকটা তুমি রোজগার করে কিনেছো, তাই ওটা আমার তুলনায় ভালো।' চা ঢালতে ঢালতে মিসেস গি্ন্য জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি কড়া চা পছন্দ করো।'

ভারি চোখ তুলে নীল পোশাক পরা, অতিরিক্ত খাটুনিতে ক্লান্ত, ছোটো-খাটো মেয়েটির দিকে তাকালো ও। ওর চোখদুটিতে যেন অনেক না-বলা কথার ঘন বিষণ্ণতা।

'যেমন চা বেরুবে, তাতেই চলবে,' মিস রেক্সল বললো।

'বেশ কালো চা বেরুচ্ছে কিন্তু। তোমার হজম শক্তির বারোটা বাজাতে চাইলে খেতে পারো।'

'তাহলে একটু জল মিশিয়ে নেবো খন।'

'আমার মতে সেটাই ভালো হবে।'

চা খেতে খেতে মেয়েরা পরস্পরের নীল পোশাকের দিকে তাকাতে থাকে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'কাজকর্ম কেমন চলছে, ভালো?'

'এর চাইতে ভালো হবে বলে আশা করা যায় না।' স্বামী জানায়, 'প্রবন্ধটা আসলে স্রেফ এক টুকরো মোরব্বা বিশেষ। কিন্তু ওরা যে তা-ই চায়! জঘন্য —তাই না, মিস রেক্সল?'

মিস রেক্সল অস্বস্তিভরে কুর্সিতে নড়ে চড়ে বসে, 'উপন্যাসটার মতো অতোখানি না হলেও, আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে।'

'উপন্যাস? কোন্ উপন্যাস?' স্ত্রী প্রশ্ন করে, 'আরও একখানা নতুন উপন্যাস হচ্ছে নাকি?'

মিস রেক্সল মনিবের দিকে তাকায়। পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়েই মানুষটার সাহিত্যিক কার্যকলাপ ও অন্য কাউকে ফাঁস করতে রাজী নয়।

'আমি উপন্যাসের মর্মার্থটা মিস রেক্সলকে একটু মুখে মুখে বলছিলাম,' স্বামী বললো।

'তাহলে মিস রেক্সল, তুমিই গল্পটার বিষয় বস্তু আমাদের বলো,' স্ত্রী নিজের কুর্সিটা মেয়েটির দিকে ঘুরিয়ে নিলো।

'আমি…মানে…' মিস রেক্সল আমতা আমতা করতে থাকে, 'বিষয়টা আমার কাছেই এখনও ততোটা পরিষ্কার হয়নি।'

'আরে বলতে থাকো না! তুমি যেটুকু বুঝেছো, তাই বলো।'

মিস রেক্সল একেবারে মূক আর প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে বসে থাকে। ওর মনে হয়, ওকে অত্যাচার করা হচ্ছে। নিজের স্কার্টের নীল ভাঁজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ও।

'আমি পারবো না!'

'পারবে না ভেবে ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি তো দারুণ যোগ্য ব্যক্তি! পুরো ব্যাপারটা যে একেবারে তোমার আঙুলের ডগায় রয়েছে, সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। আমার তো মনে হয় মিঃ গ্রিব বইগুলোর অনেক কিছুই আসলে তোমার লেখা। ও তোমাকে একটু আঁচ দেয় আর তুমি বাকিটা ভরাট করে দাও—তাই নয় কি?' বিদ্রূপের সুরে ও কথাগুলো বলে, যেন একটা বাচ্চাকে খ্যাপাচ্ছে। তারপর চোখ নামিয়ে নিজের দামী নীল স্কার্টের সুন্দর ভাঁজগুলোর দিকে তাকায়।

'এ সমস্ত কথা আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে বলছেন না?' মিস রেক্সলের মেজাজ চড়ে ওঠে।

'বলছি বই কি! এটা আমি বহু দিন ধরেই সন্দেহ করছিলাম—অন্তত কিছুদিন ধরে তো বটেই—যে মিঃ গ্রিব শুধু একটু আভাস দিয়ে দেয় আর ওর হয়ে ওর বইগুলোর বেশ খানিকটা অংশ তুমিই লেখো।' মিসেস গ্রিব কণ্ঠস্বরে সকৌতুক বিদ্রূপের সুর, কিন্তু তা বড়োই নির্দয়।

'এতে আমার প্রচণ্ড গর্ব অনুভব করা উচিত,' মিস রেক্সল সোজা হয়ে বসলো, 'তবে কিনা আমি বুঝতে পারছি আমার যাতে নিজেকে বোকা বোকা বলে মনে হয়, আপনি শুধু সেই চেষ্টাই করছেন।'

'তোমাকে বোকা মনে করাবার চেষ্টা করছি? মোটেই না! তা থেকে আমি লক্ষ যোজন দূরে। তুমি আমার চাইতে দ্বিগুণ বেশি চালাক, আমার চাইতে দশ লক্ষ গুণ বেশি সুদক্ষ। তোমার প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা। তুমি যে কাজ করছো, ভারতবর্ষের সমস্ত মুক্তোর বিনিময়েও আমি তা করবো না—করতে পারবো না…'

মিস রেক্সল কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

'তুমি কি বলতে চাইছো যে আমার বইগুলো পড়লে মনে হয়…' দোলনা থেকে উঠতে উঠতে স্বামী যন্ত্রণাকাতর সুরে বলতে শুরু করে।

'তা-ই বলছি!' স্ত্রী জবাব দেয়, 'ঠিক মনে হয়, তোমার দেওয়া আভাসটুকু থেকে মিস রেক্সলই ওগুলো লিখেছে। আমি কিন্তু সত্যিই তাই ভেবেছিলাম... বিশেষ করে তুমি যখন এতো ব্যস্ত...'

'তুমি কি প্রচণ্ড চতুর!' স্বামী বলে।

'প্রচণ্ড!' স্ত্রী চিৎকার করে ওঠে, 'বিশেষ করে যখন আমার ভুল হয়!'

'তাই হয়েছে।'

'কি আশ্চর্য কাণ্ড! ফের আমার ভুল হলো!'

তারপর এক সম্পূর্ণ নীরবতা।

মিস রেক্সল বিচলিতভাবে নিজের আঙুলগুলোতে মোচড় দিচ্ছিলো। আচমকা স্তব্ধতা ভেঙে ও তিক্ত স্বরে বললো, 'আমি বুঝতে পারছি, আমার আর ওঁর মধ্যে যা কিছু আছে তা আপনি নষ্ট করে দিতে চাইছেন।'

'কিন্তু বাছা, তোমার আর ওঁর মধ্যে কি আছে?' স্ত্রী শুধালো।

'ওঁর সঙ্গে, ওঁর হয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগতো! আমি সুখে ছিলাম!' চোখ ভরা বিরক্তি আর ঘৃণার অশ্রু নিয়ে মিস রেক্সল কেঁদে ফেললো।

'বেশ তো, ওঁর সঙ্গে কাজ করে তুমি যদ্দিন পারো সুখেই থাকো!' স্ত্রী সকল উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি কি মনে করো আমি এতোই নিষ্ঠুর যে আমি তা কেড়ে নিতে চাইবো? ওঁর সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে দেবো না? আমি সাংকেতিক অক্ষরে লিখতে পারি না, টাইপ করতে জানি না, এমন কি হিসেবপত্তরও রাখতে জানি না। আমি তোমাকে বলছি, আমি একেবারে সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি কোনোদিন একটা আধলাও রোজগার করি নি, আমি স্রেফ একটি পরগাছা। ডানায় ঝটপটানি তুলে নীলকণ্ঠ পাখি আমার পায়ের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় না—কারণ হয়তো আমার পা দুটো বড্ড বড়ো আর প্রচণ্ড জোরে সবকিছু মাড়িয়ে চলে।'

চোখ নামিয়ে নিজের দামী জুতো জোড়ার দিকে তাকালো ও। তারপর স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'সমালোচনা করতে হলে আমি তোমাকেই সমালোচনা করবো, ক্যামেরন। তুমি ওর কাছ থেকে অনেক বেশি নাও, কিন্তু বিনিময়ে ওকে কিছুই দাও না।'

'কিন্তু উনি আমাকে সবকিছুই দেন। সমস্ত কিছু!' মিস রেক্সল উঁচু গলায় বললো।

'সব কিছু বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো!' মিসেস গ্যি কঠোর

ভঙ্গিমায় মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো।

মিস রেক্সল নিজেকে সামলে নিলো। বাতাসে আকস্মিক আলোড়ন উঠলো, দিক পরিবর্তন হলো বায়ু স্রোতের।

'এমন কিছু বোঝাতে চাইছি না, যাতে আমার ওপরে আপনাকে নারাজ হতে হবে।' ছোট্টখাট্টো সচিবটি খানিকটা উষ্মা নিয়ে বললো, 'আমি কোনোদিনও নিজেকে সস্তা করে তুলি নি।'

কিছুক্ষণের শূন্য স্তব্ধতাব পর স্ত্রী বললো, 'হে ভগবান! একে তুমি সস্তা হওয়া বলো না? তুমি ওঁর কাছ থেকে কিছুই পাও নি, শুধু দিয়েই গেছো। একে তুমি নিজেকে সস্তা করে তোলা বলবে না? হায় ঈশ্বর!'

'বুঝতেই পারছেন. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা,' সচিবটি বললো।

'আমিও তা-ই বলবো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

'তুমি কার হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছো?' স্বামী বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলো।

'আমার ধারণা, প্রত্যেকেব হয়ে। তোমাব হয়ে, তার কারণ তুমি কিছু না দিয়েও সবকিছু পাচ্ছো। মিস রেক্সলের হয়ে, কারণ মনে হচ্ছে এটাই ওর পছন্দ। আর আমার হয়ে, তার কারণ আমি এসবের একেবার বাইরে রয়েছি।'

'আপনি স্বেচ্ছায় নিজেকে এসবের বাইরে না রাখলে, আপনার বাইরে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই,' মিস রেক্সল উদার হয়ে বললো।

'তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ,' স্ত্রী উঠে দাঁড়ালো। 'কিন্তু আমার আশংকা, কোনো পুরুষমানুষই এটা আশা করতে পারে না যে সুখের দুটো নীলকণ্ঠ পাখি ডানার ঝাটপটানি তুলে তার পায়ের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াবে আর নিজেদের পালক ছিঁড়বে।'

কথাটা বলে মিসেস গি্য হেঁটে চলে গেলো।

উত্তেজনায় টানটান আর মরিয়া হয়ে ওঠা বিরতির পর মিস রেক্সল আর্তনাদ করে উঠলো, 'কোনো মহিলার পক্ষে কি আমাকে হিংসে করার সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে?'

'ঠিক!' মানুষটা বললো।

এবং সে শুধু ওই টুকুই বললো।

* Two Blue Birds

অনাদি আদিম

যে পরিচারিকাটি দরজা খুলে দিলো, সে সবেমাত্র একটি সুন্দরী নারী হয়ে ফুটে উঠছে। তাই নতুন উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির মতো ওর মধ্যে যেন একটা উদ্ধত অহমিকা। স্নিগ্ধতাকে সৌন্দর্যময় করে তোলার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ইহুদী-রক্ত ওর মধ্যে আছে, তাই ও দেখতে অপরূপাই হয়ে উঠবে। ওর উনিশ বছরের সুন্দর ধূসর চোখ দুটি যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা খোঁজে। ফুটফুটে ফর্সা রং আর কালো চুলের আলগা খোঁপা আরও মোহমদির করে তুলেছে ওর মুখখানিকে।

মেয়েটির মাথায় কোনো রুমালের পট্টি বা গায়ে কোনো লজ্জারক্ষণী নেই। কিন্তু ওর পরনে হাতা-ওয়ালা একটা সুন্দর বহির্বাস, যা সম্ভ্রান্ত মহিলারাও গায়ে দিতে থাকেন।

মেয়েটি যে মানুষটাকে দরজা খুলে দিলো সে লম্বা এবং রোগা, কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরা। মানুষটার পরনে সাদা ফ্লানেলের পাতলুন, হাতে একটা টেনিস-র‍্যাকেট। অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথাটা সামান্য নিচু করে সে দোর-গোড়ায় পরিচারিকাটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। যারা নিজেদের চালচলন দিয়েই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানুষটা তাদের মধ্যেই একজন। অলস ভঙ্গিমায় ডানা নেড়ে উড়ে চলা সমুদ্র-পাখির মতো এদের চলনভঙ্গিমাও মানুষ নিজের অজান্তে চোখ মেলে লক্ষ্য করে। বাড়ির ভেতরে ঢোকার বদলে যুবকটি পরিচারিকার পাশে দাঁড়িয়ে আবছা হয়ে আসা সন্ধ্যার দিকে ফিরে তাকালো। নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে থাকলে ওর মধ্যে আজকালকার শিক্ষিত যুবকদের মতো একটা অবিশ্বাসী, শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে যা যুবকদের ঐতিহ্যগত আগ্রাসী মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

'আজকে বাজ পড়বে, কেট,' যুবক বললো।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে', জবাব দিলো মেয়েটি।

রাস্তার ওধারের গাছগাছালি আর ক্রমশ গাঢ় হয়ে ওঠা গোধূলির দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো যুবক।

'ছাখো, সূর্য পাটে বসেছে অথচ কোথাও এতোটুকু রঙের কোনো চিহ্ন নেই। সব কিছুই অস্পষ্ট, ধূসর। আর ওই ওক গাছগুলো যেন সবুজের একটা চাপা আগুন জেলে রেখেছে—ছাখো!'

'হ্যাঁ,' যেন খানিকটা হতচকিত হয়ে জবাব দিলো কেট।

'একটি বিক্ষুব্ধ অস্থির সন্ধ্যা। হতেই হবে—কারণ আজকের সন্ধ্যাই আমাদের সঙ্গে তোমার শেষ সন্ধ্যা।'

'হ্যাঁ,' মেয়েটি লাল আর কঠিন হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর যুবক কণ্ঠস্বরে মৃদু বিদ্রূপ ফুটিয়ে প্রশ্ন করে, 'চলে যাচ্ছো বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে?'

'কিছু কিছু ব্যাপারে হচ্ছে—' খানিকটা ক্রুদ্ধস্বরেই জবাব দেয় মেয়েটি।

যুবক হেসে ওঠে, যেন না বলা কথাটাও সে বুঝে ফেলেছে। তারপর একবার, 'তা বেশ!' বলে হলঘর দিয়ে এগিয়ে চলে।

হাত দুটিকে মুঠিবদ্ধ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে পরিচারিকাটি। বিদ্রোহের আক্রোশে সমস্ত হৃদয় ভরে ওঠে ওর। তারপর বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

এডওয়ার্ড সেভার্ন খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে। আটটা বাজে—জুন মাসের সন্ধ্যার পক্ষে ভীষণ অন্ধকার চারদিকে। আবছা নীল রঙের দেয়ালে শুধু ছবিগুলোর গিল্টি করা ফ্রেমের অস্পষ্ট ঝিলিক। দেয়াল ঘড়িটা মৃদু টিকটিক শব্দ তুলে সমস্ত ঘরটাকে ভরিয়ে রেখেছে। খোলা দরজাটার ওধারে আঙুরলতায় ভরা ছোট্ট একটা কাচঘর। বাগানের ওধারে একটা শিশুর উঁচু গলায় কলকলানি শুনতে পেলো সেভার্ন। কাচের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো সে।

ফুলের পাড় বসানো ঘাসের বুকে সাদা পোশাক পরা তিন বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে ছোটাছুটি করছিলো। মেয়েটি ভারি মিষ্টি আর ছটফটে। ওকে দেখে স্রেফ মজা করার জন্যে একা একা শস্যের স্তূপে খেলা করে বেড়ানো একটা মেঠো-ইঁদুরের কথা মনে হলো সেভার্নের। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো সে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলো মেয়েটি। তারপর আনন্দে ছোট্ট একটু লাফ দিয়ে, যেন মিনতি করার জন্যেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আবার।

'মিঃ সেভার্ন,' অপরূপ আদুরে গলায় মেয়েটি চিৎকার করে বললো, 'এখানে এসে একটু দেখে যাও!'

'কি?' সেভার্ন জিজ্ঞেস করলো।

'এসে ছাখোই না!'

সেভার্ন বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগানে নিয়ে যেতে চায়। মৃদু হেসে এগিয়ে যায় সে।

'ছাখো!' গোলগাল ছোট্ট একখানা হাত বাড়িয়ে দেখায় মেয়েটি।

'কি ?'

বাচ্চাটা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ও মজা করার জন্যে স্রেফ দুষ্টুমি করেই সেভার্নকে ওখানে নিয়ে গেছে।

'সবাই কুঁড়ি হয়ে গেছে,' বুজে থাকা গাঁদা ফুলগুলোকে দেখিয়ে বললো ও। তারপর 'ছাখো !' বলে একটা চিৎকার করে, সেভার্নের পাতলুনটা আঁকড়ে ধরে, পাগলের মতো টানাটানি করতে শুরু করলো। মেয়েটা যেন আত্মহারা একটি ছোট্ট মিন্যাড*। উচ্ছ্বসিত একটা পাখির মতো ও চিৎকার করতে করতে বাগানের ভেতরে ছুটে চলেছে আর ফিরে ফিরে দেখছে, সেভার্ন ওর পেছন পেছন আসছে কি না। সেভার্নের প্রাণ অনুসরণ বন্ধ করতে চাইছিলো না, তাই দ্রুত পায়ে বাচ্চাটার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো সে। আবছা বাগানে ফুলগাছগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো দুটি শুভ্র শরীর। বাতাসের আগে ডানা ঝাপটে উড়ে চলা পাখির মতো রেশমী ঘাঘরা উড়িয়ে ছুটছিলো বাচ্চাটা। যুবক দ্রুত এগিয়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওর গালে নিজের গাল ঘষতে লাগলো। অনুসরণ করার সময় সেভার্নের নিচু গলায় সাবধান বাণী আর বিজয়-উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলছিলো শিশুটির চিৎকৃত কণ্ঠস্বর ! মাঝে-মধ্যে সেভার্নকে সত্যিই ভয় পাচ্ছিলো ও। তারপর সেভার্নের গলাটা ও শক্ত করে আঁকড়ে রইলো। সেভার্ন হেসে হেসে নিচু গলায় ওকে ঠাট্টা করতে লাগলো আর তার প্রতিবাদ জানাতে লাগলো বাচ্চাটা।

লণ্ডনের শহরতলির পক্ষে বাগানটা বেশ বড়োসড়ো। চারদিকের উঁচু অন্ধকার পাঁচিল পপলার গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে গেছে। গাছগুলোর চূড়ার ওপরে, অনেক উঁচুতে, শুঁয়োপোকার মতো চকিত বিদ্যুতের আনাগোনা আর একটা কর্কশ চাপা গর্জন।

মিসেস টমাস অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাত্রি, বিজলির ঝিলিক আর দুটি শুভ্র শরীরের ছোটাছুটি লক্ষ্য করছিলেন।

'এবারে কিন্তু আমাদের ভেতরে যেতে হবে,' সেভার্নকে বলতে শুনলেন মহিলা।

'না !' উন্মত্ত আর উদ্ধত বাক্যানলের** মতো চিৎকার করে উঠে একটা বুনো-বেড়ালের মতো সেভার্নকে আঁকড়ে ধরলো বাচ্চাটা।

'হ্যাঁ।' সেভার্ন জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মা কোথায় ?'

---

* গ্রীক দেবতা ব্যাকাসের উপাসিকা।

** গ্রীকদের আসবদেবতা, ব্যাকাস।

'আমাকে একটু দোল খাওয়াও—'

ওকে তুলে ধরলো সেভার্ন, কচিকচি হাত দুটি দিয়ে শক্ত করে তার গলা জড়িয়ে ধরলো মেয়েটা।

'আমি জিগেস করেছি, তোমার মা কোথায়?' ফের প্রশ্ন করলো সেভার্ন।

'ওপর তলায়,' বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠলো। 'একবারটি দোল খাওয়াও আমাকে!'

'আমার মনে হচ্ছে না, উনি ওপরে আছেন।'

'আছে। দোলাও আমাকে! দোলাও না!'

সেভার্ন সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ায়, বাচ্চাটা তার গলায় একটা বড়সড়ো লকেটের মতো ঝুলে থাকে। ওকে একটু দুলিয়ে দিযে সেভার্ন নিজের মনেই অস্ফুটে হাসে, বাচ্চাটা চিৎকার করে ওঠে ভয় পেয়ে। ও পড়ো পড়ো হতেই সেভার্ন ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

'মে র!' খুশিতে মন-ভরে-ওঠা রমণীর মতো সুরেলা গলায় নিচু স্বরে মিসেস টমাস মেয়েকে ডাকলেন।

'না,' আমি যাবো না!' চিৎকার করে দ্রুত জবাব দিলো বাচ্চাটা।

সেভার্ন হাসতে হাসতেই নিজের মাথাটা ঝুঁকিয়ে গলায় ঝুলে থাকা বাচ্চাটাকে ওর মায়ের দিকে এগিয়ে দিলো।

'এখানে এসো,' বাচ্চাটার কোমর চেপে ধরে মিসেস টমাস কঠিন স্বরে বললেন।

'না', যুবকের ঘাড়ে মাথা গুঁজলো বাচ্চাটা।

'শোবার সময় হয়ে গেছে যে!' সেভার্নের কোল থেকে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে গিয়ে মিসেস টমাস হেসে ফেললেন। মায়ের আকর্ষণের মধ্যে তেমন কোনো দৃঢ়তা নেই বুঝতে পেরে বাচ্চাটাও আরও শক্ত করে সেভার্নকে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগলো। বাঁধন শিথিল করার জন্যে সেভার্ন তখন নিজের মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে হাসতে হাসতে ওকে দোলাতে লাগলো। বাচ্চাটা তার গলা জড়িয়ে হাসতে লাগলো খিলখিল করে আর ওর মা ওকে নিজের দিকে টানতে টানতে হাসতে লাগলেন অস্ফুটে।

'মিঃ সেভার্ন আমাকে পোশাক ছাড়িয়ে দেবে,' যুবককে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো বাচ্চাটা। ওর বয়স যখন বড়ো জোর এক মাস তখন থেকেই সেভার্ন ওর বাবা-মার সঙ্গে একত্রে রয়েছে।

'আজ রাত্তিরে আপনাকেই ওর বেশি পছন্দ,' মিসেস টমাস সেভার্নকে

বললেন। সেভার্ন হাসলো। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তিনজনই বাগানের সীমানার ওধারে আকাশের বুকে ফুটে ওঠা বিজলির ঝিলিক দেখলো। তারপর সবাই মিলে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। বাচ্চাটার পোশাক ছাড়িয়ে দিলো সেভার্ন।

আলগা মুকুটের মতো এলোমেলো হালকা সোনালি রঙের চুল, ঝলমলে ছুটি ফিকে বাদামি চোখ আর ছোট্ট রক্তিম মুখের গভীরে হাসির ঝলকে ঝিকিয়ে ওঠা খুদে খুদে ফাঁকা ফাঁকা দাঁত—সব মিলিয়ে ভারি মিষ্টি মেয়েটা। সেভার্ন ওকে ভালোবাসে। কিন্তু একজন যুবকের কাছে পোশাক ছাড়ার পক্ষে ও বড্ড বড়ো হয়ে উঠছে। উঁচু কোমরের রাত্রিবাস পরে সেভার্নের হাঁটুতে বসে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ও মাখন-মাখানো রুটির টুকরোতে হিংস্র কামড় বসাচ্ছিলো। কিছুতেই শুতে যেতে চাইছিলো না। তবু সেভার্ন ওকে দিয়ে প্রার্থনার মন্ত্র আওড়াচ্ছিলো। আর মিসেস টমাস—যদিও উনি একজন প্রোটেস্টাণ্ট এবং যদিও ক্যাথলিক সেভার্নের অবিশ্বাসে উনি গভীর মর্মাহত, তবু মেয়ের মুখে আধোভাষে ল্যাটিন উচ্চারণ শুনে উনি পুলকিত হয়ে উঠছিলেন।

বিছানায় নিয়ে যাবার জন্যে মা মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। মিসেস টমাসের বয়েস চৌত্রিশ, স্তন ছুটি পূর্ণ বিকশিত আর পরিপক্ক, মাথার কালোচুল এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে থাকে শুভ্র কপালে, গায়ের রঙ ফুটফুটে ফর্সা, সুন্দর ছুটি ভ্রূলেখা, চোখ ছুটি গাঢ় নীল আব মুখের নিচের দিকটা একটু ভারি।

'আমাকে চুমু দাও.' দোল-কুর্সিতে বসে বাচ্চাটার দিকে নিজের মুখ তুলে ধরলো সেভার্ন। হাসি ভরা বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে মা কুর্সির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেভার্নের দিকে তাকিয়ে। মানুষটার মুখ ওপরের দিকে তোলা, হাসি ভরা কোমল চোখ ছুটি থেকে ভারি ভ্রূজোড়া অনেকটা পেছনে সরে এসেছে। মণি ছুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠার জন্যে চোখ ছুটিকে যেন বিষণ্ন দেখায়। নিজের সুন্দর ঠোঁট ছুটিকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে মানুষটা, পাতলা করে ছাঁটা ভারি গোঁফজোড়া উঠে এসেছে ওপরের দিকে।

সেভার্ন এমন একজন মানুষ যে কোমলতা বিলিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে কারুর কাছে তা চায় না। নিজের সমস্ত সমস্যা সে হাসিমুখে নিজের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু যখন শান্ত আর নিশ্চুপ হয়ে থাকে, তখন তার চোখ ছুটো ভারি বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

চুমু দেবার জন্যে মানুষটার তুলে ধরা সুন্দর ঠোঁট ছুটিকে লক্ষ্য করলেন মিসেস টমাস। সামনের দিকে ঝুঁকে বাচ্চাটাকে একটু নিচের দিকে নামিয়ে আনতেই আচমকা সেভার্ণের চোখ ছুটির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে উনি বুঝতে

পারলেন, মানুষটা তার দিকে ক্রমশ নেমে আসা ওর ভারি স্তনদুটির সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। দুরন্ত শিশুটা সেভার্নের মুখের কাছে নিজের মুখ নামিয়ে আনলো। তারপর চুমু দেবার বদলে আচমকা নিজের ভিজে নরম জিভ দিয়ে সেভার্নের গালটা চেটে দিলো। চমকে উঠে নিজের মুখটা পেছন দিকে সরিয়ে আনলো সেভার্ন. এক মারাত্মক হাসিতে ঝলসে উঠলো তার চোখ আর দাঁতগুলি।

'না, হবে না!' দম বন্ধ হয়ে আসা নিচু গলায় সেভার্ন বললো 'কুকুরের মতো চেটে দিলে হবে না, সোনা!'

বাচ্চাটা দুষ্টু হাসির দমকে খিলখিলিয়ে উঠলো।

ফের নিজের মুখটা তুলে ধরলো সেভার্ন, ফের তার মুখটা তরুণী মা-টির মুখের ঠিক নিচে এসে স্থির হলো। ফের তার মুখের কাছে মুখ এনে বাচ্চাটা চেটে দেবার জন্যে নিজের জিভ বের করলো। দ্রুত নিজের মুখটা সরিয়ে এনে হেসে উঠলো সেভার্ণ।

মিসেস টমাস নিজের মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে নিলেন। উনি আর এসব দেখবেন না।

'তুমি যদি মিঃ সেভার্নকে সুন্দর করে চুমু না-ই দাও, তাহলে চলো—' মেয়েকে বললেন উনি।

মেয়েটা হেসে মা-র কাঁধে গড়িয়ে পড়লো, যেন একটা কাঠবেড়ালী গুড়ি মেরে বসে রইলো কাঁধের ওপরে। ওকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

তখনও ভালো করে অন্ধকার হয় নি। মেঘের আড়াল সামান্য সরে গেছে। এক খণ্ড ফরাসী কবিতার বই নিয়ে যুবক একখানা আরাম-কুর্সিতে শরীর এলিয়ে দিলো। একটা গীতিকবিতা পড়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো সে।

'ইস, কি অন্ধকার! আর এই আলোতে বসে বসে পড়া হচ্ছে!' মিসেস টমাস ঘরে ঢুকে ভীরু স্নেহময়তায় সেভার্নকে ভর্ৎসনা করলেন। অন্ধকারের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা সাদা ফ্ল্যানেলে মোড়া মানুষটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন উনি। তারপর মানুষটার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

'সন্ধ্যা বেলায় গাছগুলো থেকে কেমন যেন চড়া গন্ধ বেরোয়। তাই না?' অবশেষে প্রশ্ন করলেন উনি।

কিছুক্ষণ আগে পড়তে থাকা ফরাসী কবিতাটার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে জবাব দিলো সেভার্ন। মিসেস টমাস কিছু বুঝতে পারলেন না। দুজনের

মাঝখানে এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য।

'আয়রিসগুলো একটা অদ্ভুত জান্তব রক্তমাংসের গন্ধে ভরা। তাই না?' অবশেষে টেনে টেনে বললো সেভার্ন।

'আমি কিন্তু এটা জানতাম না,' মিসেস টমাস ছোট্ট করে হাসলেন।

'ঘটনাটা তা-ই,' সেভার্ন শান্ত গলায় সায় জানালো। তারপর কুর্সি থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে মিসেস টমাসের পাশে দাঁড়ালো।

জানলাটার কাছে এক রাশ হলদে রঙের আয়রিস ফুল। আরও দূরে শেষ গোধূলিতে একদল পপি সোনালি-লাল শরীর দুলিয়ে নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখছে। সন্ধ্যার অন্ধকারও ওদের রঙের বাহারকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিতে পারে নি।

'আজ কিন্তু আমাদের ভীষণ দুঃখ অনুভব করা উচিত', একটু পরে মিসেস টমাস বললেন।

'কেন?' প্রশ্ন করলো সেভার্ন।

'এখানে এটাই কেটের শেষ রাত্তির না?' মিসেস টমাসের গলায় সামান্য বিদ্রূপের রেশ।

'কেট বড়ো দুর্বিনীত।'

'আর সত্যিই ভীষণ অভদ্র! আপনি যা করেন, ও যেভাবে তার সমালোচনা করে · তা ছাড়া ওর ঔদ্ধত্য...'

'আমি যা করি?'

'না, আপনি কোনো ভুল করতে পারেন না। আসলে, আমি যা করি.' মিসেস টমাসের কথায় স্তাবকতার সুর বড্ড প্রকট হয়ে ওঠে।

তারপর আবার স্তব্ধতা।

'বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,' অবশেষে সেভার্ন বললো।

'কোথায়?' মিসেস টমাসের চকিত প্রশ্ন সেভার্নকে বিস্মিত করে তোলে। উনি মুখ ফেরাতেই মুহূর্তের জন্যে ওদের দৃষ্টি মিলিত হয়। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে সেভার্ন।

'উত্তর-পুব দিকে,' অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয় সে।

'ওঃ' আকাশের বদলে সেভার্নের হাতের দিকে দৃষ্টি মেলে রেখে অনাগ্রহী সুরে জবাব দেন মিসেস টমাস।

'দেখবেন, ঝড়টাতে ঘূর্ণি হবে।'

'আশা করি ঘূর্ণিটা তাহলে অন্য দিকে ঘুরে যাবে।'

'তা হবে না। আপনি তো বিদ্যুৎ চমকানো পছন্দ করেন না, তাই না? আমি এখানে না থাকলে আপনাকে হয়তো কেটের কাছেই আশ্রয় নিতে হতো।'

সেভার্নের পরিহাসে মৃদু হাসলেন মিসেস টমাস। তারপর তিক্তস্বরে বললেন, 'নাঃ, দরকারের সময় মিঃ টমাস কক্ষনো বাড়িতে থাকেন না।'

'কিন্তু এখন ওঁর প্রয়োজনটা যেহেতু ভীষণ জরুরী নয়, তাই আমরা বরঞ্চ ওঁকে বেকসুর খালাস করে দিই। কেমন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের একটা শুভ্র ঝিলিক ফুটে উঠলো। ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বাজটা পড়লো ভেঙে ভেঙে, যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবে।

'আমরা বরং দরজাটা বন্ধ করে দিই,' স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট নির্লিপ্ত স্বরেই বললেন মিসেস টমাস। মহিলার চেহারাটা শক্ত-সমর্থ, আঁটসাঁট ছিটকিনিটা তুলে উনি সহজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সেভার্ন আলোর বোতামটা টিপে দিলো। ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করে মিসেস টমাস ঘন্টি বাজাতেই কেট এসে হাজির হলো।

'বাচ্চাটার জিনিসপত্রগুলো এখান থেকে সরিয়ে নাও তো,' মিসেস টমাসের কণ্ঠস্বরে ঘৃণার প্রকাশ। কেট বাচ্চাটার ছোটখাটো পোশাক-আশাকগুলো কুড়িয়ে নিতে শুরু করলো। চুল্লির কাছে বেছানো কম্বলটাতে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে থাকা সাদা-পোশাকের মানুষটার উপস্থিতি সম্পর্কে দুই মহিলাই সম্পূর্ণ সচেতন। ওদের দুজনের মধ্যে বিরোধিতার মনোভাবে সামান্য মজা পেয়ে নিজের মনেই হাসছিলো সেভার্ন। কেট মাথা হেঁট করে দুর্বিনীত ভঙ্গিমায় ঘুরে ফিরে নিজের কাজ করছিলো। আগ্রহী চোখ মেলে ওকে লক্ষ্য করছিলো সেভার্ন। ওকে সে বোঝে না। আর আগামী কালই ও চলে যাচ্ছে। ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, তখনও সেভার্ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে আপন মনে। তার নমনীয়, সতেজ ভঙ্গিমার মধ্যে একটা তৎপর স্বাতন্ত্র্য ছিলো, যার জন্যে মিসেস টমাস হাতের সেলাই থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন।

সেভার্ন বুঝতে পারছিলো, সে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাই বললো, 'আমি বরং পর্দাগুলো নামিয়ে দিই।'

'ধন্যবাদ,' রীতিমাফিক জবাব দিলেন মিসেস টমাস।

জাফরি-কাটা পর্দাগুলো নামিয়ে দিয়ে সেভার্ন ফের নিজের কুর্সিতে শরীরটাকে ছুঁড়ে দিলো।

সেভার্নের কাছেই টেবিলের পাশে বসে মিসেস টমাস সেলাই করছিলেন। মিসেস টমাস সুদর্শনা, সুগঠিতা। জ্বালিয়ে রাখা একটা আলোর নিচে বসে রয়েছেন উনি। আলোর ঘেরা টোপটা লাল রেশমের, তাতে হলদে রঙের রেখা টানা। উষ্ণ-সোনালি আলোর অন্তরঙ্গতায় বসে রয়েছেন মিসেস টমাস। দুজনের মাঝখানে অধীর উৎকণ্ঠার মতো এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য—দুজনের কাছেই তা প্রায় যন্ত্রণাদায়ক, অথচ কেউই তা ভাঙবে না। সেলাইয়ের খসখসানি শুনতে পাচ্ছিলো সেভার্ন। মিসেস টমাসের হাতের চঞ্চলতা থেকে চোখ তুলে জানলার পর্দার দিকে তাকালো সে—পর্দার জাফরিতে তখন বিজলির ঝলকানি। বজ্রপাতের শব্দ এখনও অনেক দূরে।

'ওই দেখুন, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।'

সেভার্নের কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস টমাস চমকে উঠলেন। ওঁর মুখ থেকে রঙ সরে গেলো। জানলার দিকে ফিরে তাকালেন উনি। পর্দার ফাঁক দিয়ে বিজলির একরাশ শুভ্র ঝলক ভেতরে এসে ঢুকলো, তারপর অন্ধকার। আকাশের বুকে অনেক ঝড়। এক একটা চকিত দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে মরে যাবার আগেই আবার একটা চমক ছুটে এসে জানলাটাকে শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলছে। সেটা ফুরিয়ে যেতেই উড়ে আসছে আরও একটা—যেন মুহূর্তের জন্যে এক একটা পতঙ্গ উড়ে এসে উধাও হয়ে যাচ্ছে আবার। বজ্রের নির্ঘোষ মিশে মিশে যাচ্ছে একের সঙ্গে আর একটা। একই সঙ্গে আকাশে ঘটে চলেছে দুটো মহাসংগ্রাম।

মিসেস টমাস ভীষণ ফ্যাকাসে হয়ে উঠলেন। উনি জানলার দিকে না তাকাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যখনই অনুভব করছিলেন আলোর দীপ্তিটা ম্লান হয়ে উঠেছে, অমনি উনি চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন—আর প্রতিবারই একটা ঝিলিক লাফিয়ে উঠছিলো জানলাটাতে, কেঁপে উঠছিলেন মিসেস টমাস। সেভার্ন, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই, শুধু চোখ তুলে মৃদু হাসছিলো।

'আপনার ভালো লাগে না, তাই না?' অবশেষে সেভার্ন শান্ত গলায় শুধালো।

'খুব একটা লাগে না,' মিসেস টমাস হাসলেন।

'অথচ সমস্ত ঝড়ই অনেক দূরে, আমাদের স্পর্শ করার মতো কাছেপিঠে কেউ নেই।'

'না, কিন্তু এসব যেন আমাকে জাগিয়ে তোলে।' হাত দুটো কোলের ওপরে রেখে মিসেস টমাস সেভার্নের দিকে তাকালেন, 'আমার যে কেমন লাগে, তা আপনি ঠিক বুঝবেন না। মনে হয় আমি যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।'

মিসেস টমাস অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। নিবিষ্ট হয়ে ওঁকে লক্ষ্য করছিলো সেভার্ন। মহিলাকে তার মর্মান্তিক অসহায় আর বিহ্বল বলে মনে হলো। বয়সে উনি সেভার্নের চাইতে আট বছরের বড়ো। নিজেকে বিপন্ন বলে অনুভব করা মানুষের মতো এক আশ্চর্য সতর্ক ভঙ্গিমায় মৃদু হাসলো সেভার্ন। মহিলা নিজের কাজের দিকে ঝুঁকে, বিচলিতভাবে সেলাই করতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে শুধু নীরবতা, দুজনের কেউই তার মধ্যে অবাধে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না।

একটু পরেই স্বাভাবিকের চাইতে বড়ো আকারের একটা বিদ্যুতের চমক আলোর চিমনিতে ঝিকিয়ে উঠলো। ওরা দুজনেই জানলাটার দিকে তাকালো, তারপর একজন তাকালো অন্যজনের দিকে। মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিটা প্রীতি-সম্ভাষণের মতো দেখালো। তারপরেই সেভার্নের চোখ দুটো হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, ভরে উঠলো বেপরোয়া ভঙ্গিমায়। সে অনুভব করলো, মিসেস টমাস মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে বিচলিত আর শিথিল হয়ে উঠেছেন। ওঁর দুচোখে জল-ভরে-ওঠার ভীরু অসহায়তা দেখে নিজের হৃদয়ে সংকটের তীব্র আঘাত অনুভব করলো সেভার্ন। নিজের হাতের সেলাইতে মুখ লুকোলেন মিসেস টমাস।

সেভার্ন কুর্সিতে শরীর এলিয়ে রইলো। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিলো। তবু থেকে থেকে বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে সঙ্গে ওরা বারবার একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলো। শেষ অব্দি দুজনেই দম ফুরিয়ে হাঁফাতে লাগলো, দুজনেই হয়ে উঠলো ভয়ার্ত—সে ভয় বজ্র-বিদ্যুতের নয়, ভয় নিজেকে আর ভয় পরস্পরকে।

ব্যাপারটা সেভার্নের অনুভূতিতে এতোই নাড়া দিয়েছিলো যে নিজের অস্থিরতা সম্পর্কেও সে সচেতন হয়ে উঠলো। 'এ কোন্ শয়তান জেগে উঠলো?' অবাক হয়ে নিজেকে শুধালো সে। সাতাশ বছর বয়সে আজও তার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। সে অত্যন্ত সুসভ্য, মেয়েদের সে শ্রদ্ধা করে - কারণ তারা অনুভূতি দিয়ে সবকিছু বুঝে নিতে পারে, বিরক্তিকর বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই নিজের চিন্তা এবং অনুভূতিকে সে কোমলভাবে মেয়েদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেশ ধাপে ধাপে এগুলেই আসক্তির পর্যায়ে গিয়ে

পৌঁছনো যায়। কিন্তু সে পদ্ধতিতে সেভার্ন কোনোদিনই চলতে শুরু করেনি। তাই এখন সে চমকিত, বিস্মিত, অস্থির—অথচ সে কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বুকের মধ্যে যেন কি এক যন্ত্রণায় সে হাঁফিয়ে উঠেছে। দুই বাহুতে এক অনৈচ্ছিক উত্তেজনা, মনে হয় যেন কাউকে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু এই 'কোনো একজনটি' যে আসলে মিসেস টমাস, এ কথা মনে হলেও সেভার্ন নিদারুণ আঘাত পাবে। এতোদিন বাসনার ধারা বয়ে গেছে তার অবচেতন মনের গভীর দিয়ে। কিন্তু এখন সেই স্রোতের ধারা এমন আচমকা ছুটে এসেছে যে সেভার্নের সচেতন সত্তাকে সে আনুগত্যের পক্ষে টেনে নিয়ে যাবেই। অবিশ্যি তেমনটি হয়তো কোনোদিনও ঘটবে না, আনুগত্যের কাছে কোনোদিনই আত্মসমর্পণ করবে না সেভার্ন—শুধুমাত্র অন্ধ আবেগ কিছুতেই সে পথে তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

এগারোটা নাগাদ মিঃ টমাস বাড়িতে ফিরলেন।

'তুমি যে বাড়িতে ফিরে আসো, তাতেই আমার অবাক লাগে।' মিসেস টমাসকে বলতে শুনলো সেভার্ন।

'আমি সাড়ে-দশটার সময় অফিস থেকে বেরিয়েছি,' মিঃ টমাসের কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট বিরক্তি।

'থাক, ওই পুরনো গপ্পোটা আমাকে আর বলতে চেষ্টা কোরো না।'

'আমি আদৌ কোনো চেষ্টা করিনি, গার্টি।' মিঃ টমাস বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'আমি তোমার প্রশ্নটার জবাব দিয়েছি।'

সেভার্ন কল্পনা করে নিলো, মিঃ টমাস ম্যাজিস্ট্রেটদের মতো মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমায় মাথা নুইয়ে মৃদু হাসলেন। উনি আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত। মিসেস টমাস স্বামীকে হলঘরে রেখে, ফের টেবিলে এসে বসলেন। একটু আগেই সেভার্ন আর উনি এখানে বসে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন। এখন দুজনেই পড়াশুনোয় মনোযোগী।

মিঃ টমাস ভেতরে এসে ঢুকলেন মুখখানা ভীষণ লাল। ভদ্রলোকের উচ্চতা মাঝারি, বয়েস বছর চল্লিশেক, শক্ত-সমর্থ-সুদর্শন চেহারা। কিন্তু রুক্ষতা প্রকাশের জন্যে এখন উনি চিবুকটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছেন। চোয়ালটা কঠিন, কিন্তু মুখখানা ছোটো এবং তাতে স্নায়বিক কুঞ্চন। ধূসর-রঙা চোখ দুটি আবেগময়, স্নেহপ্রবণ মানুষের মতো—কিন্তু তাতে এতোটুকু অহমিকা অথবা কোনো উগ্রতা নেই।

মিঃ টমাস সেভার্নের সঙ্গে কথা বললেন না, সেভার্নও কিছু বললো না ওঁকে। যদিও সাধারণত ওঁদের সম্পর্কটা বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ, তবু এমনি এক একটা সময় আসে যখন বিনা কারণেই ওঁরা একে অন্যের বিরোধীপক্ষ হয়ে মুখ গোমড়া করে থাকেন। সশব্দে কুর্সিতে বসে বিয়ারের বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন মিঃ টমাস। ওঁর হাত দুটো ভারি ভারি, সঞ্চালনের ভঙ্গিমাটাও আদিম। সেভার্ন লক্ষ্য করলো, ওঁর ভারি আংগুলগুলো এমন ভাবে গ্লাসটাকে চেপে ধরেছে যেন সেটা একটা বিশ্বাসঘাতী শত্রু।

তুমি রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছো, গার্টি?' মিঃ টমাসের কণ্ঠস্বরটা অপমান-জনক শোনালো। ওরা দুজনে বসে বসে শুধু পড়বে, যেন এখানে তাঁর কোনো অস্তিত্বই নেই—এটা তিনি আদপেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

'হ্যাঁ, এমনিতেই যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে।' অধীর বিস্ময়ে স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন মিসেস টমাস, তারপর ফের নিজের বইতে ডুবে গেলেন।

সেভার্ন মাথা নিচু করে মুচকি হাসলো। মিঃ টমাস এক চুমুক বিয়ার গিলে নিলেন। তারপর জেরা করার ভঙ্গিমায় চিবুক বাড়িয়ে বিশ্রীভাবে বললেন, 'অকারণ খুঁটিনাটিগুলো বাদ দিয়ে তুমি আমার প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলে, আমি খুশি হতাম গার্টি।'

'ও, আমার জবাবটা তাহলে যথাযথ হয়নি বুঝি?' নৈর্ব্যক্তিক সুরে চোখ তুলে না তাকিয়েই মিসেস টমাস বললেন।

'বিলক্ষণ! ধন্যবাদ তোমাকে!' নিদারুণ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালেন টমাস। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তার ভঙ্গিমাটা সম্পূর্ণ মাঠে মারা পড়লো।

'হুঁ,' পড়তে পড়তেই অন্যমনস্কভাবে অস্ফুটে জবাব দিলেন মিসেস টমাস।

ফের নীরবতা নেমে এলো। সেভার্ন তখনও নিজের মনে মুখ টিপে হাসছে।

'জানো গার্টি, আজ রাত্তিরবেলা আমি একটা দারুণ প্রশংসা পেয়েছি!' একটু পরেই টমাস অন্তরঙ্গ সুরে বললেন। তখনও উনি সেভার্নকে উপেক্ষা করে চলেছেন।

হুঁ।' স্ত্রী জবাব দিলেন। এটা একটা সুপরিচিত সূচনা। রাগ চেপে রেখে টমাস এখন স্ত্রীর মন পাবার জন্যে নিদারুণ সংগ্রামে রত।

'কমিটির প্রত্যেকের উপস্থিতিতে কাউন্সিলর জার্নডাইস··· তুমি কি আমার কথা শুনছো, গার্টি?'

'হ্যাঁ,' মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে জবাব দিলেন মিসেস টমাস।

'কাউন্সিলর জার্নডাইসের কেতা-পদ্ধতি তো তুমি জানোই,' নিজের ধৈর্য এবং

অমায়িকত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প মানুষের মতো কণ্ঠস্বরে টমাস বললেন, 'তা সেই বিনয়ী ইংরেজ ভদ্রলোকটি··'

'হুঁ!'

'একজনের কথার জবাবে উনি বললেন···' টমাস অশুস্তি ক্লান্তিকর খুঁটিনাটি বিবরণ জানিয়ে গেলেন, কিন্তু কেউই সেদিকে মনোযোগী হলো না।

'তারপর উনি আমাকে এবং তারপর চেয়ারম্যানকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিযে বললেন, 'মিঃ চেয়ারম্যান, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অভিনন্দন জানাবার মতো একটা কারণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমাদের মধ্যে কোনো একজনকে সদস্য হিসেবে পেয়েছি বলে আমরা খুবই ভাগ্যবান। একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা সর্বদাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—সে বিষয়টা হচ্ছে, আইন। মিঃ চেয়ারম্যান, সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'।

'উনি চেয়ারম্যানকে অভিবাদন জানালেন, আমাকেও জানালেন। তারপরেই কাউন্সিল চেম্বারের চারদিক থেকে যে কি সরব প্রশংসা উঠলো, তা যদি তুমি শুনতে! ঘোড়ার খুরের মতো ওই বিশাল টেবিলটা মনের মধ্যে যে কি প্রভাব ছড়িয়ে রাখে, তা তুমি জানো না। সেই টেবিলের প্রতিটা মুখই তখন আমার দিকে ঘুরে রয়েছে, চতুর্দিকে রব উঠেছে 'সাধু! সাধু!' কর্মস্থলে আমি যে কতোটা শ্রদ্ধা সম্মান পাই তা তুমি জানো না, মিসেস টমাস।'

'তাই নিয়েই খুশি থাকো,' আবেগবিহীন শান্ত গলায় মিসেস টমাস বললেন।

সেভার্ন মুখ টিপে হাসতে হাসতে ভাবলো, 'লোকটার মোটা মাথায় দু ফোঁটা স্কচ পড়েছে, তাই কল্পনায় এ সব ছবি আঁকছে।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বলেছিলে, আজ রাত্তিরে কোনো মিটিং নেই,' একটু পরে আচমকা একটা নির্দোষ মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন মিসেস টমাস।

'একটা গোপন বৈঠক ছিলো,' নিজের আচরণে সরকারী পদমর্যাদা সূচক গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনলেন টমাস। ওঁর মাত্রাতিরিক্ত এবং আহত মর্যাদাবোধ সেভার্নকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁর মিথ্যে কথায় বিরক্ত হলেন মিসেস টমাস।

স্ত্রীকে ক্রমাগত তোয়াক্কা করতে থাকা টমাস এতোক্ষণ অপমানজনক ভাবে সেভার্নকে উপেক্ষা করে আসছিলেন। এবারে রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি এমন একটা অহঙ্কারী মন্তব্য প্রকাশ করলেন, যেটা সেভার্নের কাছে প্রচণ্ড আপত্তিকর। কুর্সি ছেড়ে উঠে, হাত পা ছড়িয়ে, হাতের বইটা নামিয়ে

রাখলো সেভার্ন। তারপর এমন নির্বিকার ভঙ্গিমায় ম্যান্টেলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, যেন অন্য দুজনকে সে লক্ষ্যই করছে না। কিন্তু মেয়েদের প্রসঙ্গে আনা বিল সম্পর্কে টমাসকে অভদ্রের মতো একটা মন্তব্য উচ্চারণ করতে শুনে, সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ঠাণ্ডা গলায় গৃহস্বামীর কথায় প্রতিবাদ জানালো। তাপচুল্লির কাছে বেছানো গালচের ওপরে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোশাকের যুবকটির দিকে মিসেস টমাস চকিত খুশির দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। টমাস ঘৃণায় ভরা বাদামি চোখ দুটোকে নিচের দিকে নামিয়ে একের পর এক আঙুল মটকাতে লাগলেন। তারপর সহজাত প্রবৃত্তির চাইতে নিজের ভীরুতা বেশি শক্তিশালী হওয়ার জন্যে, তিনি বেশ খানিকটা বিরক্তি নিয়ে যে ভাষায় জবাব দিলেন, সেটাকে এ বিষয়ে চরম মতামত বলে মনে হলো। কিন্তু সেভার্ন সামান্য কটি কথায় তাকে স্রেফ উড়িয়ে দিলো। তর্ক যুদ্ধে সেভার্ন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে অনেক বেশি ক্ষিপ্র আর মার্জিত। টমাস আইনজীবীদের অজেয় ভঙ্গিমায় চড়া গলায় জবাব দেন, বাক্যবাণে প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করে মৃদু হাসেন—কিন্তু তাঁর উপলব্ধির মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতা নেই। তাছাড়া যুবক সেভার্ন সর্বদাই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সরাসরি তার বয়স্ক প্রতিপক্ষের বাদামি চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে মজা পাচ্ছিলো, ফলে টমাসের সব দম্ভ মুচড়ে উঠছিলো বারবার।

ইতিমধ্যে মিসেস টমাস মেয়েদের স্বপক্ষে গিয়ে খোলাখুলিভাবে স্বামীর পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ফলে সেভার্ন ওর ওপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝেই উনি চকিতে সেভার্নের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিচ্ছিলেন, নিবিড় পুলক আলোড়িত করে তুলছিলো ওর সুন্দর নীল চোখ দুটিকে। নিজের কপট ভূমিকাটা ভারি সুস্বাদু লাগছিলো ওঁর। উনি যদি সেভার্নের পক্ষ নিতেন, তাহলে ওই যুবক এই নিঃসঙ্গ মানুষটাকে করুণা করতো ওঁর সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতো।

বাকযুদ্ধটা ক্রমশ আরও তীব্র হয়ে উঠছিলো। মিসেস টমাস ওদের থামাবার কোনো চেষ্টাই করছিলেন না। শেষ অব্দি সেভার্ন অনুভব করলো, তারা দুজনেই অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ফাঁদে পড়েও বুঝতে না পারা অর্ধ-উন্মাদ খরগোশের মতো টমাস তখন প্রবল যন্ত্রণায় যেন আকুলি-বিকুলি করছেন। অবশেষে তাঁর প্রচেষ্টা প্রতিপক্ষের মনেও করুণার উদ্রেক করলো। মিসেস টমাস তবু করুণাবিহীন। তর্কে স্বামীর কুশলতা ওঁর কাছে বিদ্বেষের বস্তু, তাঁর বুদ্ধিগত অসততা ওঁর কাছে একেবারে সুস্পষ্ট। সেভার্ন তার শেষ কথাটা

উচ্চারণ করে ফেললো, আর কিছুই সে বলবে না। টমাস তখন অপমান হজম করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটার পর একটা আঙুল মটকাতে লাগলেন। নৈঃশব্দ্য নেমে এলো চতুর্দিকে।

'আমি এবারে শুতে যাবো,' সেভার্ন বললো। বাড়ির মালিককে সে কয়েকটা আপোসের কথা বলবে ভেবেছিলো। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষাও করলো। কিন্তু নিজের গলা দিয়ে ওই ধরনের কোনো কথাই সে বের করতে পারলো না।

'ওহো, মিঃ সেভার্ন—আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে কেটের বাক্সটা নিচে নামিয়ে আনতে মিঃ টমাসকে একটু সাহায্য করবেন? উনি সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই, আপনি হয়তো বেরিয়ে যাবেন। ট্যাক্সি আসবে দশটায়। কিছু মনে করলেন?'

'মনে করবো কেন?'

'জো, তুমি তৈরি তো?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস টমাস।

নিজেকে দমিয়ে রাখা এবং ধৈর্য ধরে থাকার জন্যে স্থির সঙ্কল্প মানুষের মতো ভঙ্গিতে মিঃ টমাস উঠে দাঁড়ালেন।

'সেটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'সিঁড়ির ওপরের চাতাল। কেট শুয়ে পড়েছে। আমি ওকে বলে আসছি, নইলে আমরা হয়তো ওকে ভয় পাইয়ে দেবো।'

পরিস্থিতি এখন মিসেস টমাসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। দুজন পুরুষই ওঁর কাছে বিনত। একটা মোমবাতি নিয়ে উনি সকলের আগে আগে চারতলার দিকে এগুলেন। সেখানে বন্ধ দরজার বাইরে ছোট্ট চাতালটায় বিশাল একটা টিনের তোরঙ্গ। বাচ্চার ঘুম যদি ভেঙে যায়, তাই ওঁরা তিনজনই নিশ্চুপ।

'বেচারী কেট,' সেভার্ন ভাবলো, 'এভাবে বিনা কারণে ওকে বাইরের দুনিয়ায় বের করে দেওয়াটা সত্যিই লজ্জাজনক।' নারীজাতির প্রতি একটা নিবিড় ঘৃণা অনুভব করলো সে।

'মিঃ সেভার্ন, আমি কি আগে যাবো?' টমাস প্রশ্ন করলেন।

এক সঙ্গে কিছু করতে হলে অথবা মিসেস টমাস অনুপস্থিত থাকলে মানুষ দুটো এতোটা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে যে তা একেবারে বিস্ময়কর। তখন ওরা হয়ে ওঠে সহকর্মী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুজনের মধ্যে বয়স্ক, গাট্টাগাট্টা চেহারার টমাস তখন অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—যদিও অল্পবয়সী খেয়ালী মানুষটার কথা তিনি সর্বদাই মেনে চলেন।

'আমিই বরঞ্চ আগে যাই,' টমাস বললেন। 'আপনি যদি এটা হাতলটাতে

জড়িয়ে নেন, তাহলে আপনার আঙুলগুলো কাটবে না।'

যুবক সেভার্নকে উনি পকেট থেকে একটা নরম বই বের করে দিলেন। সেভার্নের হাত দুটি এতো ছোট্ট আর সুন্দর যে তা দেখে টমাসের করুণা হয়।

তোরঙ্গের একটা প্রান্ত তুলে ধরে সেভার্ন। তারপর পেছনে মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস টমাসের দিকে একটু হেসে একঝলক হাসি ছড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'কেটের লট-বহর আমার চাইতে অনেক বেশি।'

'আমি জানি, ওটা ভারি,' মিসেস টমাস হাসলেন।

সিঁড়ির প্রান্তে অপেক্ষারত টমাস লক্ষ্য করলেন, যুবক গলা বাড়িয়ে স্মিতমুখ মহিলাটিকে ফিসফিসিয়ে এমন কিছু বলছে যা মহিলাটিকে খুশি করে তুলেছে।

বয়স্ক মানুষটি একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে ভীষণ সতর্ক এবং আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় সিঁড়ির একটা ধাপ নেমে এলেন।

'গার্টি, তুমি কি আমার জন্যে আলোটা ধরে রয়েছো?' এক ধাপ নেমেই টমাস বিদ্রূপের সুরে বললেন। মিসেস টমাস সবেগে আলোটা তুলে ধরলেন। টমাস কাজকর্মে অনেক সোরগোল তুলেছেন, আসলে উনি ভয়ে শিটিয়ে উঠেছেন। সবদাই নির্বিকার সেভার্ণ এবারে নিতান্ত অবহেলাভরে তোরঙ্গটাকে নিচু করে ধরলো। বস্তুত ভারি ওজনটার তিন চতুর্থাংশই এখন টমাসের দিকে। মিসেস টমাস ওপর থেকে দৃষ্টি মেলে রাখলেন ওদের দুজনার দিকে।

'এখন আমি যদি পিছলে পড়ি, তাহলে লোকটাকে চেপটে একেবারে বাগদা চিংড়ি করে ফেলবো,' বাড়ির মালিকের উদ্বিগ্ন লাল মুখটার দিকে তাকিয়ে, কথাটা ভাবতে ভাবতে সেভার্ণ নিজের মনেই হাসলো। তারপর অনুসরণ রতা মিসেস টমাসকে নিচু গলায় বললো, 'এখুনি আসবেন না। আপনি পিছলে পড়লে আপনার স্বামী চেপটে যাবেন। ভয়াবহ হিমানী-সম্প্রপাত হইতে সাবধান'।

সেভার্ন হাসলো, মিসেস টমাসও মুখ টিপে হাসলেন। প্রচণ্ড লাল এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা টমাস বিরক্তির দৃষ্টিতে ওদের দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

সিঁড়ির বাঁকের কাছে আসতেই সেভার্ন অনুভব করলো, এই তিনকোনা সঙ্কীর্ণ সিঁড়িতে ঘরে-পরার চটিটা ঠিক নিরাপদ নয়। প্রত্যেকটা জিনিসেই সে ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে। প্রতিদ্বন্দ্বী তোরঙ্গের তলায় থাকার দরুন তার অবচেতন প্রবৃত্তি এখন সেই ঝুঁকিটাকেই তার কাছে দ্বিগুণ মধুর করে তুললো—অথচ সেভার্ন জেনে শুনে গৃহস্বামীর একটি চুলেও আঘাত করতো না।

টমাস যখন স্বস্তিতে ঘামতে শুরু করেছেন, চাতালে নামতে যখন আর মাত্র একটি ধাপ বাকি—তখন একেবারে আকস্মিকভাবেই সেভার্ন পিছলে গেলো। বিশাল বাক্সটা যেন তীব্র যন্ত্রণায় আছড়ে পড়লো, সেভার্ন পিছলে পড়লো সিঁড়ি দিয়ে। টমাস পেছন দিকে ছিটকে পড়লেন চাতালের ওধারে, বেস্টনির থামে তাঁর মাথাটা সজোরে ঠুকে গেলো। উনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তেমন কোনো মারাত্মক ক্ষতি হয়নি দেখে সেভার্নও হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'আমি ভীষণ দুঃখিত—'

টমাস তখন ষাঁড়ের মতো ক্ষিপ্ত। সেভার্নের হাসিভরা মুখ দেখে উনি উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ঝলসে উঠলো তাঁর বাদামি রঙের চোখ দুটো।

'আপনি···আপনি ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছেন,' চিৎকার করে উঠে ভদ্রলোক যুবকের চোয়াল এবং কানে সোজাসুজি দুটো প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে দিলেন। যুবক বয়সে টমাস ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় এবং মুষ্টি যোদ্ধা, সোয়ানসির গুণ্ডা-মস্তানদের মধ্যে উনি বড়ো হয়ে উঠেছেন। আর সেভার্ন পড়াশুনো করেছে ফ্রান্সের এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের কলেজে। এর আগে কেউ কোনোদিনও তার মুখে আঘাত করেনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে সাদা এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলো। টমাস ততোক্ষণে ঘুঁষি বাগিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গিমায় রুখে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ছোট্ট সঙ্কীর্ণ সিঁড়িতে মারামারি করার মতো জায়গার নিতান্তই অভাব। তার ওপরে ঘুঁষোঘুঁষি করার মতো মানসিকতা সেভার্নের একেবারেই ছিলো না। শক্ত করে মেলে রাখা খোলা আঙুল নিয়ে যুবক তার প্রতিপক্ষের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুঁষি খাওয়া সত্ত্বেও, সে যেন তা বুঝতেই পারলো না। সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে টমাসের জামার কলারটা আঁকড়ে ধরে, মানুষটাকে সে সজোরে মেঝেতে পেড়ে ফেললো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার সুন্দর হাত দুটি মানুষটার মোটা গলাটাকে টিপে ধরলো। টমাসের লিনেনের কলার তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে খুলে গেছে। অন্ধ পাশব শক্তি নিয়ে উনি তখন পাগলের মতো লড়ে চলেছেন। কিন্তু অন্যজন একখণ্ড শুভ্র ইস্পাতের মতো তাঁকে ঢেকে রাখলো। সেভার্নের বিরল বুদ্ধিমত্তা তখন বিক্ষিপ্ত নয়—একাগ্র। তার একাগ্রতা টমাসকে দ্রুত দম আটকে মেরে ফেলার দিকে। গৃহস্বামীর মাথাটাকে সে সজোরে সিঁড়ির পরবর্তী ধাপটার প্রান্তভাগের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো। শক্ত সমর্থ রক্তাক্ত টমাস আত্ম নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চিহ্নই হারিয়ে ফেললেন। কসাইখানার পশুর মতো লড়তে লাগলেন উনি। নাক বেয়ে তাঁর মুখে রক্তের ধারা নামলো। লড়তে লড়তে দম বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরুতে

লাগলো তার কণ্ঠ থেকে।

আচমকা সেভার্ন অনুভব করলো, কে যেন দুহাতে তার মুখটা ঘুরিয়ে ধরলো। কেটের চোখের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হতেই একটা সত্যিকারের আঘাত পেলো সে। কেট সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, কেট বন্দী করে ফেলেছে তার চোখ দুটোকে।

'কি করছেন আপনি, শুনি?' নিদারুণ ঘৃণা আর ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো কেট। রাত্রিবাস পরা অবস্থায় কেট ঝুঁকে রয়েছে সেভার্নের ওপরে, লম্ব হয়ে ঝুলছে ওর দুটি কালো বিনুনি। নিজের মুখ লুকিয়ে হাত দুটোকে সরিয়ে নেয় সেভার্ন। হাঁটু মুড়ে উঠতে গিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, আতংক আর অনুতাপে বিহ্বল মিসেস টমাস সিঁড়ির বেষ্টনী ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিস্পন্দ হয়ে। ওঁর অনুতাপটাও স্পষ্ট করে দেখতে পায় সেভার্ন। নিদারুণ লজ্জায় উন্মাদ হয়ে নিজের মুখটা লুকিয়ে নেয় সে। দেখতে পায়, গৃহস্বামী হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছেন ওঁর হাত দুটো গলার কাছে, ওঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, উনি হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছেন। যুবকের হৃদয় অনুতাপ আর অনুশোচনায় ভরে ওঠে। ভারী মানুষটাকে দুহাতে জড়িয়ে টেনে তুলতে তুলতে সে নরম গলায় বলে, 'দেখি, আমি আপনাকে উঠতে সাহায্য করছি।'

সেভার্ন টমাসকে দেয়ালের কাছে তুলে দাঁড় করাতেই, উনি ফের ঢলে পড়তে শুরু করেন। 'না, সোজা হয়ে দাঁড়ান,' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিয়ে ফের গৃহস্বামীকে তুলে ধরে সেভার্ন। টমাস নির্বোধের মতো কোনোক্রমে আদেশ পালন করলেন। তখনও তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, তখনও তিনি হাত দিয়ে নিজের গলাটা চেপে রেখেছেন, তখনও একটা অদ্ভুত শব্দ করে উনি হাঁফাচ্ছেন। তবে ওঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ আরও দীর্ঘ হয়ে উঠছে।

'জল, কেট — আর স্পঞ্জ — ঠাণ্ডা,' সেভার্ন বললো।

কেট মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে আসে। গৃহস্বামীর মুখ, কপালের দুটো পাশ আর গলাটা ধুইয়ে দেয় যুবক। রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শক্তসমর্থ মানুষটার শ্বাস প্রশ্বাস তখনও অনিয়মিত, প্রচণ্ড ফোঁপাতে থাকা শিশুর মতো তখনও উনি ঝাঁকুনি তুলে তুলে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছেন। অবশেষে লম্বা করে একটা শ্বাস নেবার পর সামান্য এক আধটু অনিশ্চিত বিরতিসহ ওঁর বুকের স্পন্দন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তখনও ওর হাতটা গলার কাছে, বিহ্বল দুটি করুণ-ধূসর চোখ তুলে উনি যেন মূক আকুতি জানাচ্ছেন। কিছু বলার প্রচেষ্টায় উনি জিভটা নাড়লেন, মাথাটা পেছন দিকে সামান্য

হেলালেন, ওঁর গলার পেশীগুলো একটু নড়েচড়ে উঠলো। তারপর ব্যথার জায়গায় ফের হাত রাখলেন ভদ্রলোক।

সেভার্ন তখন বেদনা-বিদ্ধ। যে মানুষটাকে সে আঘাত করেছিলো, সেই মুহূর্তে তাকেই সে স্বেচ্ছায় নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দিতে রাজী।

মিসেস টমাস এতোক্ষণ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ উনি নড়াচড়া করতে সাহস পেলেন না। কারণ জানতেন, তাহলেই উনি চেতনা হারিয়ে ফেলবেন। উনি দেখছিলেন ওঁর জীবনের একটা সংকট কেটে যাচ্ছে। বিবেক-দংশনে-ভরা মন নিয়ে উনি পৌঁছে গিয়েছিলেন অনুশোচনার তিক্ত দেশে। নিজের জন্যে উনি আর কোনোদিনও নিজেকে কিছু আশা করতে দেবেন না। বাকি জীবনটা ওঁকে কাটাতে হবে শুধু আত্ম-বঞ্চনায়। এতোটুকু সহানুভূতি, ভালোবাসায় এতোটুকু মাধুরী, জীবন যাত্রায় কোনো সৌষ্ঠব বা সঙ্গতি কিছুই আর কামনা করা চলবে না। নিজের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে এখন থেকে উনি মৃত।

'এখন কি আগের চাইতে একটু ভালো বোধ করছেন?' অসুস্থ মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলো সেভার্ন। টমাস প্রশ্নকর্তার দিকে ম্লান দুটি ধূসর চোখ তুলে তাকালেন সে চোখে ক্রোধ নেই, আছে শুধু মূক আত্ম-করুণা। উনি কোনো জবাব দিলেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন আহত জন্তুর মতো যাকে দেখে মনে সমবেদনা জাগে। ওদিকে একটা অধীর অবজ্ঞাবোধকে দ্রুত চেপে রেখে, মিসেস টমাস মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন একটা অসাড়, বিমূর্ত কর্তব্যবোধ— যা মহিমান্বিত, কিন্তু প্রাণহীন।

'আসুন,' সমবেদনায় ভরা এবং মেয়েদের মতো কোমল স্বরে সেভার্ন বললো, 'আমি আপনাকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

সেভার্নের শরীরে নিজের শরীরের ভর রেখে টমাস হোঁচট খেতে খেতে হতভাগ্যের মতো নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেভার্নের সাদা পোশাক ততোক্ষণে রক্ত আর জলে জবজবে হয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকে সে টমাসের জুতোর ফিতে এবং কলারের অবশিষ্ট অংশটুকু খুলে দিলো। সেই মুহূর্তে মিসেস টমাসও ঘরে এসে পৌঁছলেন। নিজের ভূমিকাটা উনি এবারে গ্রহণ করলেন। উনি কাঁদছিলেনও বটে।

'ধন্যবাদ, মিঃ সেভার্ন,' প্রাণহীন শীতল কণ্ঠে বললেন মিসেস টমাস। সেভার্ন চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মিসেস টমাস বিছানায় উঠে স্বামীর করুণ মাথাটাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে সজোরে চেপে ধরলেন। নিচে

নামার সময় স্ত্রীর কান্নার ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে স্বামীর সামান্য ফোঁপানির শব্দও শুনতে পেলো সেভার্ন। সব কিছু ভালোভাবে শেষ হয় কিনা দেখার জন্যে কেট এতোক্ষণ সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলো। সেভার্ন দেখলো, এবারে কেটও শীতল শান্ত মুখে নিজের ঘরের দিকে উঠে গেলো।

বাড়ির দরজা বন্ধ করে সেভার্ন সবকিছু গোছগাছ করে রাখলো। তার মুখটা যন্ত্রণাদায়কভাবে ফুলে উঠছিলো। মুখটা ধুয়ে নেবার জন্যে খানিকটা জল গরম করে নিলো সে। তারপর সেঁক দেওয়া শেষ করে, এক রাশ লজ্জা নিয়ে বসে বসে তিক্ত মনে চিন্তা করতে লাগলো।

সেভার্ন যখন বসে রয়েছে, তখন মিসেস টমাস যেন কি একটা কাজে নিচে নেমে এলেন। ওঁর হাবভাব শীতল এবং বৈরিতায় ভরা। সবকিছু নিরাপদ আছে কিনা দেখার জন্যে চতুর্দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিলেন উনি। তারপর বললেন, 'মিঃ সেভার্ন, শোবার আগে আপনি কিন্তু আলোটা নিভিয়ে দেবেন।' সমুদ্রসৈকতে দেখা হলে বাড়ির মালিকান যেভাবে কথা বলেন, মিসেস টমাসের কথা বলার ধরন তার চাইতেও বেশি লৌকিকতাময়। সেভার্ন অপমানিত বোধ করে। কারণ যে কোনো সাধারণ লোকই শোবার আগে আলোটা নিভিয়ে দেবে। তা ছাড়া প্রায় রাতে সে-ই দরজার চাবি লাগায় এবং সব চাইতে শেষে শুতে যায়।

'দেবো মিসেস টমাস,' অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করলো সেভার্ন। বিদ্রূপের ঝিলিক ফুটে উঠলো তার চোখ দুটিতে—কারণ সে জানে তার মুখটা ফুলে উঠেছে।

সিঁড়ির চাতাল অব্দি পৌঁছে ফের নেমে এলেন মিসেস টমাস।

বাক্সটা নামিয়ে আনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে, আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না,' মিসেস টমাসের কণ্ঠস্বর শান্ত, প্রাণহীন।

সেভার্ন কোনো জবাব দেয় না। অথচ একঘণ্টা আগে হলে সেভার্ন বলতো, মিসেস টমাসকে সে অবশ্যই সাহায্য করবে না—কারণ কাজটা পুরুষ মানুষের, মিসেস টমাস অবশ্যই এ কাজ করবেন না। এখন সেভার্ন উঠে দাঁড়ালো, মিসেস টমাসের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলো এবং বাক্সের বেশির ভাগ ওজনটা নিজে নিয়ে, দ্রুত নিচে নেমে এলো।

'ধন্যবাদ, আপনার অশেষ করুণা। শুভ রাত্রি।' মিসেস টমাস বিদায় নিয়ে শুতে চলে গেলেন।

সকাল বেলায় সেভার্ন দেরী করে উঠলো। তার মুখ বেশ খানিকটা ফুলে

রয়েছে। বহির্বাসটা গায়ে গলিয়ে টমাসের ঘরে গিয়ে হাজির হলো সে। অন্য মানুষটি তখনও শুয়ে রয়েছেন—দেখতে অনেকটাই আগের মতো, কিন্তু মুখের অবস্থা শোচনীয়, যদিও আদর সোহাগ পেয়ে মনে মনে খুশি।

'আজ সকালে কেমন আছেন?' সেভার্ন জিজ্ঞেস করলো।

টমাস হাসলেন, বন্ধুর দিকে প্রায় কোমল দৃষ্টিতেই তাকিয়ে বললেন, 'তা ভালোই আছি, ধন্যবাদ।'

যুবকের ফুলে ওঠা এবং কালশিরে পড়া গালের দিকে তাকালেন উনি। তারপর ফের স্নেহের দৃষ্টিতে সেভার্নের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত'—তারপর চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে 'ওই জন্যে।'

সেভার্ন নিজস্ব মনোহর ভঙ্গিতে চোখ দিয়ে হাসলো, 'আমি জানতাম না আমরা আসলে এতোটা বর্বর। ভেবেছিলাম, আমি কতো না সভ্য।' বিকৃত, আড়ষ্ট মুখে ফের হাসলো সে।

টমাস বিকৃত শব্দ করে দুঃখের হাসি হাসলেন, 'এতে বোঝা গেলো, মানুষের মধ্যে খানিকটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে।'

টমাস মিনতি মাখানো দৃষ্টিতে সেভার্নের দিকে তাকালেন। তিক্ততার রেশ নিয়ে মৃদু হাসলো সেভার্ন। দুটি মানুষ হাত চেপে ধরলেন পরস্পরের।

পরিচয়ের শেষ দিন অব্দি সেভার্ন আর টমাস ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, একের প্রতি অন্যের আচরণ ছিলো শান্ত আন্তরিক। অন্যদিকে সেভার্নের প্রতি মিসেস টমাসের ব্যবহার ছিলো শুধু মার্জিত এবং আনুষ্ঠানিক, যেন সেভার্ন একটা অপরিচিত বাইরের মানুষ।

আর কেট - কেট যাদের বাড়ি ছিলো তারাই স্থির করে দিয়েছিলো ওর ভাগ্য। কেট ভাল সরে গিয়েছিলো ওদের জীবন থেকে।

' The old Adam

ব্যভেল হচ্ছে ইংলণ্ডের বৃহত্তম যাজক-পল্লী। অথবা বলা যায়, ব্যভেল ছিলো ইংলণ্ডের বৃহত্তম যাজক-পল্লী। এখানকার জনসংখ্যা স্বল্প। তিনটে বিশাল খনি-অঞ্চলের গ্রামের অসংখ্য ঘর-দোরের ঝাঁকের মধ্যে থেকে মাত্র সামান্য কয়েকটি ছিটকে এসে এখানকার জালে আটকে পড়েছে। বাদ বাকি অঞ্চলটা জুড়ে বিশাল অরণ্য, প্রাচীন শেরউডের অংশ বিশেষ, পশুচারণ আর চাস জমির গুটি-কয়েক টিলা, তিনটে কোলিয়ারি এবং সবশেষে একটা সিস্টার্সিয়ান মঠের ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষটা একটা প্রান্তরের মধ্যে, তারপরেই বনাঞ্চলের শেষাংশ—যার ওক গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মে মাসে নীল হাইঅ্যাসিনথগুলো জলের মতো ঝিলমিল করে। মঠটার শুধু পুবদিকের দেয়ালটাই এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। তার এক কাঁধে একটা ঘন আইভিলতার ভারী বোঝা আর উঁচু জানলাগুলোর নকশা-কাটা জালিতে পায়রাদের আবাস। কথা হচ্ছিলো এই জানলাটা নিয়েই।

ব্যভেলের যাজক অবিবাহিত, বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। একেবারে প্রথম জীবনে কোনো একটা অসুখে ওঁর ডানদিকের অঙ্গে সামান্য পক্ষাঘাত হওয়ায় উনি একটু পা টেনে টেনে চলেন এবং ওঁর ঠোঁটের ডান দিকটা গালের দিকে একটু ঠেলে তোলা—ফলে মনে হয় সর্বদাই উনি মুখটা বিকৃত করে রেখেছেন যেটা ওঁর ভারী গোঁফজোড়াও ঢেকে রাখতে পারে না। ওঁর মুখের এই গোচড়টা ভারি করুণ—চোখ দুটি তীক্ষ্ণ আর বিষণ্ণ। মিঃ কোলব্রানের কাছাকাছি যাওয়া খুবই কঠিন। সত্যি বলতে কি, ওঁর মুখের বিকৃতির খানিকটা এখন ওঁর মনেও এসে লেগেছে। ফলে উনি যখন বিদ্রূপ করেন না, তখন ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁর চাইতে বেশি ধৈর্য এবং বদান্যতায় ভরা মানুষ খুব কমই আছেন। অভব্য চাবাড়ে মানুষরা ওঁকে নিয়ে যতোই উপহাস করুক, উনি শুধু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসেন—ওঁর চোখে তখন এতোটুকুও বিদ্বেষ থাকে না, শুধু ওদের কথা শেষ হওয়া অব্দি লেগে থাকে অপেক্ষার এক প্রশান্ত অভিব্যক্তি। ওঁর নিজের লোকজন কেউই ওঁকে পছন্দ করে না, অথচ কেউই ওঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারেনি। ওরা শুধু বলে, 'উনি যে কখন কাকে কব্জা করে ফেলবেন, তা কেউই বলতে পারে না।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি যাজক মহোদয়ের সঙ্গে তাঁর পাঠ-ঘরে বসেই রাতের খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন ভাস্কর্যের অলঙ্করণ থাকায় এ ঘরখানা অন্যান্যদের মর্মপীড়ার কারণ। এখানে রয়েছে লেয়াকুনের* একখানা মূর্তি, অন্যান্য কিছু ধ্রুপদী মূর্তির প্রতিরূপ, তাছাড়া ব্রোঞ্জ এবং রুপোর তৈরি ইতালিয় পুনরভ্যুদয়ের কিছু কাজ। বাদবাকি সবই মলিন এবং তামাটে।

মিঃ কোলব্রান একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নিজেকে কোনো গুরুত্ব দেন না বলে এ ব্যাপারে তাঁর মতামতের মূল্য যে কতোটা, তা কেউই জানে না।

'এই দেখুন,' খাওয়া-দাওয়ার পরে উনি আমাকে বললেন, 'আমার মহান কাজের আরও একটা অনুচ্ছেদ আমি পেয়ে গেছি।'

'কি কাজ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি কি আপনাকে বলিনি যে আমি ইংরেজদের জন্যে বাইবেলের একখানা সংকলন তৈরি করছি? যে বাইবেল হবে তাদের অন্তরের জিনিস, অচেনার উপস্থিতিতে তাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস? এর একটা ভগ্নাংশ আমি পেয়ে গেছি, এটা ব্যাবেল থেকে ঈশ্বরের দিকে একটা ঝাঁপ।'

'কোথায় পেলেন?' চমকে উঠলাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই যাজক ভদ্রলোক চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন, 'স্রেফ এক টুকরো পার্চমেন্ট কাগজে।'

তারপর উনি আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে একখানা হলদে রঙের পুঁথি তুলে নিয়ে, পড়ে পড়ে অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন:

'আমরা যখন সুর করে প্রার্থনা করছি, তখন পুবদিকের বিশাল জানলাটা থেকে একটা কড়কড়াৎ শব্দ শোনা গেলো ওই জানলাতেই ছিলেন ক্রুশবিদ্ধ আমাদের প্রভু। আসলে আমাদের ওপরে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিদ্বেষী লোলুপ শয়তান তখন জানলার কাচে আঁকা প্রভুর পবিত্র প্রতিচ্ছবিখানিকে ভেঙে ফেলছিলো। আমরা দেখলাম দানবটার লৌহ মুষ্টি জানলাটাকে চুরমার করে ভাঙছে আর ঝুড়িতে জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখার মতো টকটকে লাল একটা মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। আমাদের হৃৎপিণ্ডগুলো দ্রবীভূত হয়ে উঠলো, পা ভেঙে আসতে লাগলো, মনে হলো আমরা মরতে চলেছি। হতভাগ্যটার শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে উঠলো সমস্ত গির্জাটা।

'কিন্তু আমাদের প্রিয় সন্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের রক্ষাকল্পে দ্রুত স্বর্গ

* ট্রোজান পুরোহিত, কাঠের ঘোড়া সম্পর্কে ইনি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

থেকে নেমে এলেন। শয়তানটা গভীর আর্তনাদ এবং গর্দভের মতো চিৎকার করতে শুরু করলো। সে দমিত, পরাজিত ও বিদূরিত হলো।

'সূর্যোদয়ে যখন প্রভাত হলো, তখন কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে বাইরের মিহি তুষারে বেরিয়ে এলো। আমাদের সন্তের প্রতিমূর্তিটা ওখানেই ভগ্ন অবস্থায় পড়েছিলো। জানলায় একটা দুষ্ট ছিদ্র। শয়তানের স্পর্শে যেন ওই পবিত্র ক্ষত থেকেই বেরিয়ে এসেছে পূত রক্তধারা। বরফের বুকে সোনার মতো ঝলকাচ্ছে ওই রক্ত। কেউ কেউ আনন্দে তা সংগ্রহ করে নিলো।'

'দারুণ!' বললাম, 'এটা কোত্থেকে পেলেন?'

'ব্র্যাভেলের নথিপত্র থেকে—পঞ্চদশ শতাব্দীর নথি।'

'ব্র্যাভেল অ্যাবিতে আবাসিক সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুবই কম ছিলো। ভাবছি, কি দেখে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।'

'আমিও তাই ভাবছি,' উনি বললেন।

'কেউ হয়তো জানলা বেয়ে উঠে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো।'

'কি বললেন?' উনি হাসলেন।

'আপনার কি মনে হয়?'

'আমার ধারণা অনেকটাই ওই ধরনের।' উনি বললেন, 'আমার বইতে টীকা দেবো বলে এটা আমি বেছে রেখেছি।'

'আপনার সেই মহান ব্রত? আমাকে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।'

মিঃ কলব্রান বাতিটার ওপরে একটা ঢাকনা চাপিয়ে দিতেই ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে উঠলো।

'আমি কি স্রেফ একটা কণ্ঠস্বর হয়ে গেলাম?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'আমি আপনার হাতটা দেখতে পাচ্ছি,' আমি জবাব দিলাম

উনি আলোর বৃত্তটা থেকে একেবারে বাইরে চলে গেলেন। তারপর শোকগাঁথা গাইবার মতো একঘেয়ে সুরে, অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন:

'আমি ছিলাম রোলেসটাউনের নিউথর্প তালুকের একজন ভূমিদাস—আস্তাবলের পরিচালক। ঘোড়ার খিদমত করার সময় একদিন একটা ঘোড়া আমাকে কামড়ে দিয়েছিলো। ঘোড়াটা ছিলো আমার পুরনো দুশমন। একদিন আমি ওর নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ঘোড়াটা সুযোগ পেয়েই তেড়ে এসে আমার মুখ কামড়ে দেয়। আমি তখন একটা ছোট্ট কুঠার তুলে নিয়ে ওর মাথায় বসিয়ে দিই। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে শয়তানটা

তখন সব কটা দাঁত বের করে আমাকে বিক্ষত করে তোলে। কিন্তু শেষ অব্দি আমিই ওকে পেড়ে ফেলি।

'ঘোড়াটাকে মেরে ফেলার জন্যে ওরা যতক্ষণ না ভাবলো আমি মরে গেছি, ততোক্ষণ আমাকে চাবকালো। আমার গঠন ছিলো শক্ত-সমর্থ, কারণ আমরা—মানে ঘোড়ার খিদমতদাররা—প্রচুর খাবার-দাবার পাই। চেহারাটা শক্ত-সমর্থ ছিলো বটে, কিন্তু যতোক্ষণ অব্দি আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিলো ততোক্ষণ অব্দি ওরা আমাকে চাবকালো। পরদিন রাত্রিবেলা আমি আস্তাবল-গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। আর আস্তাবলগুলো আগুন ধরালো বাড়িটাতে। লক্ষ্য করলাম, আগুনের লাল শিখা জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, লোকজন সবাই ছুটছে—সবাই ছুটছে যে যার জন্যে। আমার মনিবও ওই ভয়ার্ত মানুষদের মধ্যে একজন মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। ছাদটা ধসে গিয়ে আগুনের ফুলকিগুলো চারদিকে ছিটকে উঠতেই ওরা চিৎকার করে উঠলো—ব্যাগপাইপের বাজনা শুনে কুকুরগুলো যেমন ভাবে চিৎকার করতে থাকে, ঠিক তেমনি চিৎকার। মনিব আমাকে অভিশম্পাত দিলেন, আমি হাসতে হাসতে কাছেই একটা ঝোপের নিচে শুয়ে পড়লাম।

'আগুনটা নিভে যেতে, আমার ভয় হলো। দুচোখে আগুনের ঝলকানি আর দুকানে ভেঙে পড়ার কড়কড় শব্দ নিয়ে আমি বনের দিকে ছুটলাম। কয়েকঘণ্টা আমি যেন আগুনের মধ্যেই রইলাম। তারপর একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সন্ধ্যা। আমার গায়ে কোনো লম্বা আলখাল্লা ছিলো না, ঠাণ্ডায় জমে আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। পাছে পিঠের ক্ষতগুলো পাতলা বরফের মতো ফেটে যায়, তাই নড়াচড়া করতেও আমার ভয় করছিলো। খিদের জ্বালা অসহ্য হয়ে না ওঠা অব্দি আমি চুপচাপ শুয়েই রইলাম। তারপর নড়াচড়ার কষ্টতে অভ্যস্ত হবার জন্যে একটু হাঁটাচলা করে খাদ্যের সন্ধান করতে শুরু করলাম। কিন্তু বুনো ফল ছাড়া কোথাও কোনো খাবার নেই।

'ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় আমি ফের গাছটার তলায় এসে লুটিয়ে পড়লাম। আমার ওপরে ঝোপটা তুষারে মচমচ করে উঠলো। চমকে উঠে আমি চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। তারার আলোয় ডালপালাগুলোকে চুলের মতো দেখাচ্ছিলো। আমার হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে রইলো। ফের সেই ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। তারপর আচমকা একটা উল্লাসধ্বনি যেন দূরে শিস দিয়ে উঠলো। একটা মরা ডালের মতো আমি গাছের নিচে পড়ে রইলাম।

তবে শেষ অব্দি ওই অদ্ভুত শিসের শব্দে বুঝলাম, ওটা তুষারের চাপে নিরেট বরফের বেঁকে যাওয়া অথবা আঁট হয়ে যাবার আওয়াজ। আমি তখন আমার মনিবের তালুক থেকে মাত্র দুমাইল দূরে, হ্রদের ওপর দিকে জঙ্গলটার মধ্যে রয়েছি। তবু হ্রদ থেকে ফের সেই শিসের মতো ফাঁকা আওয়াজটা ভেসে আসতেই আমি সজোরে জমে ওঠা শক্ত জমিটাকে আঁকড়ে ধরলাম। আমার শরীরের প্রতিটি মাংসপেশীই তখন ওই শক্ত মাটির মতো আড়ষ্ট। সারাটা রাত আমি মুখ তুলতে ভরসা পেলাম না, মুখ গুঁজে টানটান হয়ে শুয়ে রইলাম যেন খোঁটাতে উপুড় করে বেঁধে রাখা হয়েছে আমাকে।

'যখন ভোর হলো তখনও আমি নড়াচড়া করছি না, একটা স্বপ্নের মধ্যে স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছি। কিন্তু বিকেলের দিকে শরীরের ব্যথা-বেদনা আমাকে জাগিয়ে তুললো। নড়াচড়া করতেই যন্ত্রণায় দম খিঁচিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। তারপর ফের হিংস্র হয়ে উঠলাম। হাত দুটোকে আঘাত দেবার জন্যে গাছের অমসৃণ বাকলে সজোরে পিটতে লাগলাম, যাতে পুরনো যন্ত্রণাটা অতো বেশি করে অনুভব না করি। বেদনায় অবসন্ন হয়ে না ওঠা অব্দি আমি এমনিভাবেই প্রচণ্ড রাগে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে দুলিয়ে চললাম। যন্ত্রণাকে জয় না করা পর্যন্ত নিজের শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেলাম। তারপর সন্ধ্যা নেমে আসতে শুরু করলো। সারাটা দিন ধরে সূর্যটা তুষার গলাতে পারেনি। বিকেলের দিকে অনুভব করলাম, আকাশটা ফের হিমেল হয়ে উঠছে। বুঝতে পারলাম, রাত্রি আসছে। এবং যে সুবিশাল ভয়ংকর প্রান্তর আমি সবেমাত্র পেরিয়ে এসেছি, যা আমাকে অন্য একটা মানুষ করে তুলেছে - তার কথা মনে করে আমি অরণ্য পেরিয়ে ছুটে চললাম।

'কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি যে ওক গাছটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম, সেটাতে পাঁচটা গলায় দড়ি-দেওয়া মানুষ ঝুলছিলো। লাঠির মতো আড়ষ্ট শরীর নিয়ে ওরা রাতের পর রাত ওখানেই ঝুলবে। এ আতংক আরও ভয়ংকর। মুখ ঘুরিয়ে অরণ্যের মধ্যে দিক ভুল করে আমি যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে গাছের সংখ্যা পাতলা হয়ে এসেছে, শুধু এলোমেলো রোমশ হথর্নগুলো নেমে গেছে হ্রদের প্রান্ত অব্দি।

আকাশটা লাল। হ্রদের বুকে বরফের ঝলকানি দেখে মনে হয়, জলটা বুঝি গরম। সামান্য কয়েকটা বুনো হাঁস বরফের স্তূপে যেন পাথরের - তো বসে রয়েছে। মার্থার কথা মনে হলো আমার। ও হ্রদের ওধারের জাঁতাওয়ালার মেয়ে। ওর চুলগুলো বাতাসে উড়তে থাকা বীচ গাছের পাতার মতো লাল।

মাঝে মধ্যে আমি যখন ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ওখানে গেছি, ও আমাকে খাবার এনে দিয়েছে।

'আমি ভেবেছিলাম, একটা কাঠবেড়ালী তোমার কাঁধে বসে রয়েছে,' আমি ওকে বলেছিলাম। 'আসলে তোমার চুলগুলো এলো হয়ে খসে পড়েছে'।

'সবাই আমাকে খেঁকশেয়ালী বলে,' ও বলেছিলো।

"আমি যদি তোমার কুকুর হতাম'! আমি বলেছিলাম।

'ঘোড়া নিয়ে আমি যখনই ওই শস্য পেষাইয়ের কারখানায় গেছি, ও আমাকে শুয়োরের মাংস আর ভালো দেখে রুটি এনে দিয়েছে। এখন রুটির টুকরো আর মাংসের কথা মনে পড়ায় আমি মাতালের মতো টলতে লাগলাম। সারাটা দিন আমি খরগোশের গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছি আর ডালপালা চিবিয়েছি। এখন মাথার মধ্যে এমন একটা ভোঁতা অনুভূতি, যে আমি আঘাতের যন্ত্রণা বা হাঁটুতে কাঁটার আঘাত—কিছুই বুঝতে পারছি না। পেছনে গাছ থেকে গাছে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসা অন্ধকারের ভয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে, মানুষ আর মৃত্যুর ভয়কে প্রায় ভুলে গিয়ে, আমি টলতে টলতে কারখানাটার দিকে এগিয়ে চললাম।

'জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় এসে কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। ঠিক নিচেই পুকুরটা। চিরদিনই দেখেছি, এখানটা জলের কলতানে ভরে থাকে। কিন্তু এখন চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। নিজের কথা ভুলে, তুষারের কথা ভুলে, আমি এই নীরবতার আতংকে সামনের দিকে ছুটে চললাম। জঙ্গলটা যেন ক্রমাগত অনুসরণ করছিলো আমাকে। কিন্তু ঠিক সময় মতোই আমি শুয়োরের খোয়াড়ের পাশে গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। কারখানার মালিক তখন ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসছিলেন, সঙ্গে তার চিৎকৃত কুকুরটা। শুনতে পেলাম — উনি দিনটাকে অভিশম্পাত জানালেন, চাকর-বাকরদের গালাগাল দিলেন আমাকে উনি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাই পণ্ডশ্রমের রাগে গালাগাল দিলেন আমাকেও। ওখানে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই আমি ছাউনিটার ভেতরে চুষে চুষে দুধ খাওয়ার শব্দ পেলাম। বুঝলাম মাদী শুয়োরটা ভেতরে রয়েছে এবং ওর অধিকাংশ দুধের-ছানাকেই আগামীকালের ক্রিসমাসে জবাই করা হবে। কারখানার মালিকটি এই সময়টাতে ছানা পাবার বন্দোবস্ত করে দূরদর্শীর কাজই করেছেন এবং মধ্য-শীতের ভোজ-উৎসব উপলক্ষ্যে ওই দুধের ছানাগুলোকে দিয়ে মুনাফা তুলে নিয়েছেন।

'ঘনায়মান সন্ধ্যায় মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিক নিস্তব্ধ হতেই আমি দরজার খিল

খুলে কুঠরির ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। মাদী শুয়োরটা ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠলো, কিন্তু আমাকে আবিষ্কার করার জন্যে এগিয়ে এলো না। একটু একটু করে আমি ওর উষ্ণতার দিকে এগিয়ে গেলাম। এখন ওর তিনটে ছানা রয়েছে, তারা ওকে রাগিয়ে তুলেছে। মা শুয়োরটা দুধে একেবারে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝেই ও ছানাগুলোকে এলোপাতাড়ি আঘাত করছে, আর ছানাগুলো চিৎকার করে উঠছে। ছানাগুলোকে নিয়ে ও ব্যস্ত থাকায় আমি অন্ধকারের মধ্যে ওর দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু এতো কাঁপছিলাম যে নিজের ওপরে আস্থা রেখে ওর কাছাকাছি যেতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। বেশ খানিকক্ষণ ওর দিকে নিজের নগ্ন মুখটা এগিয়ে নিতেও আমি সাহস পেলাম না। কিন্তু শেষ অব্দি খিদে আর আতংকে শিউরে উঠে হাত দিয়ে নিজের মুখটা আড়াল করে আমি ওর দুধ পান করলাম। ওর ছানাগুলো সচিৎকারে বারবার আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, কিন্তু শূকরীটা স্বস্তি পেয়ে শুয়ে শুয়ে শুধু ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগলো। অবশেষে পান শেষ করার অবসন্নতায় আমিও শুয়ে রইলাম মাতাল হয়ে।

'ঘুম ভাঙলো কারখানা-মালিকের চিৎকারে। মালিকের মেয়েটি কাঁদছিলো। রাগারাগি করে উনি মেয়েকে বকছিলেন, মাদী-শুয়োরটাকে খাওয়াবার জন্যে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিলেন মেয়েটিকে। একটা আড়কাঠের তলা দিয়ে মাথা নিচু করে কুঠরির দরজার কাছে এসে, মেয়েটি দরজার খিলটা ভাঙা দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। তারপর মাদী শুয়োরটা ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠতেই সন্তর্পণে ভেতরে এসে ঢুকলো। আমি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে, ওকে কাছে টেনে নিলাম। আমার বুকের মধ্যে ও ছটফট করতে লাগলো আর আমার হৃৎপিণ্ডটা স্পন্দিত হতে শুরু করলো সশব্দে। অবশেষে ও বুঝতে পারলো, লোকটা আমি। আমি ওকে জড়িয়ে রইলাম, ও এলিয়ে রইলো আমার বাহুবন্ধনে। ও মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছিলো বলে আমি ওর গলায় চুমু দিলাম। হয়তো ঘোড়ার কামড়ে বিক্ষত আমার মুখের যন্ত্রণাটা তীব্র হয়ে উঠেছিলো— তা ছাড়া অশ্রুজল কেন অমন করে আমার দৃষ্টিকে অন্ধ করে তুলছিলো, জানি না।

'ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে,' ও ফিসফিসিয়ে বললো।

'না,' জবাব দিলাম আমি।

'ও নিচু স্বরে কাঁদলো। আমাকে চোখের জলে ভিজিয়ে, মুখে নরম চুল বুলিয়ে, দুহাতে আমার মাথাটা তুলে ধরে আমাকে চুমু দিয়ে, ও আমার সর্বাঙ্গ উষ্ণ করে তুললো।

"আমি এখান থেকে যাবো না,' আমি বললাম। 'তুমি আমাকে একটা ছুরি এনে দাও, তাই দিয়ে আমি নিজেকে রক্ষা করবো'।

'ও চলে যাবার পর, ও যেখানে বসেছিলো সেখানে বুক চেপে আমি শুয়ে রইলাম। খিদের চাইতেও একাকীত্বের শূন্যতা আরও দুঃসহ।

'পরে ও আবার এলো। দেখলাম, দোরগোড়ার কাছে এসে ও মাথা নোয়ালো—একটা লণ্ঠন দুলছে ওর সামনে। ওর খসে পড়া চুলের রক্তিম আভার তলা দিয়ে ও উঁকি মারতেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ও খাবার নিয়ে এসেছিলো। আবছা আলোয় আমরা দুজনে মিলে বসলাম। তখনও আমি মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম, আমার গলা দিয়ে কিছু নামছিলো না।

'বললাম, 'তুমি আমার জন্যে যা এনেছো তা সবই যদি আমি খাই, তাহলে কেউ এসে আমাকে খুঁজে পাওয়া অব্দি আমি পড়ে পড়ে ঘুমবো'।

'ও তখন অবশিষ্ট মাংসটুকু সরিয়ে নিলো।

'বললাম, 'কেন আমি খাবো না, শুনি'? ও আতংকের অশ্রু নিয়ে আমার দিকে তাকালো।

'কি হলো, বলো'? আমি জিজ্ঞেস করলাম। তবু ও কোনো জবাব দিলো না। আমি ওকে চুমু দিলাম, আমার আহত মুখের আঘাতটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

'বললাম, 'এখন তোমার মুখে আমার রক্ত'। মসৃণ হাত দিয়ে ঠোঁট দুটি মুছে নিয়ে ও সেদিকে তাকালো, তারপর তাকালো আমার দিকে।

'বললাম, 'তুমি যাও। আমি ক্লান্ত'। ও যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

'কিন্তু একটা ছুরি নিয়ে এসো,' আমি বললাম। ও তখন ছবি দেখার মতো লণ্ঠনটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরলো।

'তোমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা বলির পশুর মতো দেখাচ্ছে', ও বললো। 'তোমার চোখ দুটো বিষণ্ণ, কিন্তু বিস্ফারিত'।

'তাহলে আমি ঘুমবো, কিন্তু বেশি দেরী করে উঠবো না।'

'এখানে থেকো না'।

'আমি জঙ্গলে ঘুমবো না, আমার ভয় করে'। আমি মনের কথাটাই বলে ফেললাম। 'জঙ্গলের শব্দের চাইতে বরঞ্চ মানুষ আর কুকুরের কণ্ঠস্বর শুনেও ভয় পাওয়া ভালো। তুমি আমাকে একটা ছুরি এনে দাও, আমি সকালবেলা চলে যাবো। এখন একা একা আমি যাবো না'।

'সন্ধানকারীরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে'।

'তুমি আমাকে একটা ছুরি এনে দাও'।

'ওহ্, তুমি যাও'! ও কেঁদে ফেললো।

'এখন নয়···এখন আমি যাচ্ছি না···'

'ও লণ্ঠনটা তুলে ধরে ওর নিজের এবং আমার মুখটা আলোকিত করে তুললো। ওর নীল চোখ দুটিতে অশ্রু শুকিয়ে গেছে। আমি ওকে নিজের কাছে টেনে নিলাম। কারণ আমি জানি, ও আমার।

আমি আবার আসব', বললো ও।

'ও চলে গেলো, আমিও হাত গুটিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

'যখন জাগলাম, তখন ও আমাকে জাগাবার জন্যে পাগলের মতো ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো।

'বললাম, 'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, একটা বিশাল স্তূপ—যেন একটা পাহাড় আমার ওপরে এসে পড়েছে'।

'ও আমার গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে আমাকে একটা শিকারের ছুরি, এক থলে খাবার আর অন্যান্য কি সমস্ত দিলো, আমি খেয়াল করিনি। তারপর নিজের চাদরের নিচে ও লণ্ঠনটাকে লুকিয়ে নিলো।

'বললো, 'চলো, যাওয়া যাক'। এবং আমিও অন্ধের মতো ওকে অনুসরণ করলাম।

'বাইরের ঠাণ্ডায় বেরিয়ে আসতেই কে যেন আমার মুখ আর চুল স্পর্শ করলো।

'এই! কে···'? আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'ও দ্রুত আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুপ করিয়ে দিলো।

তখনও আমি ঘুমের ঘোরে রয়েছি। চিৎকার করে বললাম, 'কে যেন আমাকে ছুঁয়ে গেলো।'

'চুপ করো!' ও কেঁদে ফেললো, 'তুষার ঝরে পড়ছে।'

'বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরগুলো ডাকতে শুরু করলো। ও সামনের দিকে ছুটে গেলো, ওর পেছনে আমি। নদীর অগভীর জায়গাটায় এসে ও দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে নদীটা পেরিয়ে গেলো, কিন্তু আমি ছুটলাম বরফ ভেঙে ভেঙে। তখন বুঝতে পারলাম, আমি কোথায় রয়েছি। দ্রুত নেমে আসা সূক্ষ্ম তুষার কণা আমার মুখে এসে বিঁধছিলো। অরণ্যে কিন্তু বাতাসও ছিলো না, তুষারও ছিলো না।

'শোনো!' আমি ওকে ডেকে বললাম, 'শোনো, আমি ঘুমের ঘোরে আটকে পড়েছি।'

'আমি মাথার ওপরে গর্জন শুনতে পাচ্ছি,' ও জবাব দিলো। 'বড়ো বড়ো বাদুরের মতো গাছগুলোর মধ্যে আমি তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনছি।'

'আমাকে তোমার হাতটা দাও,' আমি বললাম।

'চলে যেতে যেতে আমরা অনেক আওয়াজ শুনলাম। একবার আমাদের সামনে একরাশ শুভ্রতা জেগে উঠতেই ও উঁচু গলায় চিৎকার করে উঠলো।

'না,' আমি বললাম, 'আমার হাত থেকে তোমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে না'। শীঘ্রিই আমরা ঝরে-পড়া তুষার পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। কিন্তু ভয়ে ভয়ে ও বারবার শুধু পেছনে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো।

'আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'যখনই তুমি আমার হাতটা পেছন দিকে টেনে ধরছো, তখনই তুমি আমার কাঁধের একটা বরে চাবুকের ক্ষত আলগা করে দিচ্ছো।'

'সেই থেকে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলা হরিণ শিশুর মতো ও-ও আমার পাশাপাশি ছুটে চললো।

উপত্যকাটা পেরিয়ে আমরা নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছবো,' আমি বললাম। 'নদীটা বরফের ওপর দিয়ে আমাদের গভীর অরণ্যের পথে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে আমরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। ওখান থেকে নেকড়েদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নেকড়েরা অনুসরণ করেছে তাড়িয়ে দেওয়া হরিণগুলোকে।'

'আমরা সরাসরি উড়ন্ত তুষারকণার মধ্যে নিজে থেকে জেগে ওঠা একটা বিশাল উজ্জ্বলতার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।'

'আঃ'। মার্থা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আমার মনে হলো, আমরা সীমানা পেরিয়ে পরীদের রাজ্যে ঢুকে পড়েছি এবং এখন আমি আর মানুষ নই। তুষারের ভেতর থেকে কার চোখ আমার দিকে টিপটিপ করে জ্বলছে, বাতাসের দমকের সঙ্গে কোন্ চতুর আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে—তা আমি কেমন করে জানবো? তাই কি হয় দেখার জন্যে আমি অপেক্ষা করে রইলাম ভুলে গেলাম মার্থার কথা, ভুলে গেলাম ও ওখানেই রয়েছে। শুধু অনুভব করছিলাম, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারা উড়ে বেড়াচ্ছে —ঘুরপাক খাচ্ছে আমার চতুর্দিকে।

'মার্থা তখন আমাকে জড়িয়ে রেখেছে, চুমু দিচ্ছে অবাধে। সেই মুহূর্তে

কুকুর কিংবা মানুষ অথবা দানবেরা এসে আমাদের মুখোমুখি হলো। তাই আমরা দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া তুষারের ওপরে রঙে রঙে রঙিন ছায়াটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, আমরা একটা আলোর দরজার নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। দরজাটা তুষারের রঙের সঙ্গে নিজের রঙ ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে। মার্থা কোনোদিনও এমনটি ছাখেনি, আমিও না। দরজাটা খুলে আগুনের মতো রক্তিম আর সাহসী কি যেন বেরিয়ে এলো। আমরা অবাক হয়ে রইলাম।

'এ যে পরীর দেশ,' কিছুক্ষণ বাদে মার্থা বললো, 'কেউ কি এমন জিনিস··· ওহ্, না'!

'তখন তুষারের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল আর নীলের ঝলকানি।

'মানুষ যেমন করে বুকে টুকটুকে লাল রোজবেরি গুঁজে রাখে, তেমনি ভাবে কেউ যদি লাল ফুলের মতো এমনি ছোট্ট এক টুকরো আলো— সামান্য একটা টুকরো নিজের কাছে রাখতে পারে, তাহলে তাঁকেই আমাদের পরম প্রভু বলে চিনে নেওয়া যাবে'।

'ছায়াটার মুখে বেয়ে ওঠার জন্যে আমি আমার চাদরটাকে ছুঁড়ে ফেললাম, নামিয়ে রাখলাম নিজের যতো বোঝা। পাথরের কিনারায়, তারপর তুষারের গহ্বরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালাম ওপরের দিকে। আমার হাতটা লাল আর নীল হয়ে উঠলো কিন্তু আমি জিনিসটাকে তুলে নিতে পারলাম না। রাত পোকার ডানার রঙের মতো সেটা আমার হাত থেকে ক্রমশ বেড়ে ওঠা তুষারের ওপরে উড়ে গেলো। একটা তুষার-মানবের মাথায় দাঁড়িয়ে আমি আরও ওপরের দিকে হাত বাড়ালাম। অনুভব করলাম, উজ্জ্বল জিনিসটা হিমশীতল কিন্তু সেটাকে তুলে নিতে পারলাম না। নিচ থেকে মার্থা তখন চিৎকার করে আমাকে ওর কাছে ফিরে আসতে বলছে। পাঁজরের মতো একটা জিনিস হাতে লাগতেই আমি আমার ছুরিটা দিয়ে সেখানে আঘাত করলাম। রক্তিমতার মধ্যে একটা ফাটল বেরিয়ে পড়লো। সেখান দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম যেন শুভ্র বিহ্বল দেবদূতেরা তাদের বিষণ্ণ মুখগুলোকে আতংকে ওপরের দিকে তুলে রেখেছে। ওদের প্রত্যেকের দু'টা করে মুখ, মাথায় ঝুমকো চুলের বৃত্ত। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। উজ্জ্বল লাল জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরে টান লাগালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিচে তুষার মানুষটা ধসে পড়লো। ফলে আমিও যেন ভেঙে-চুরে লুটিয়ে পড়লাম তুষারের বুকে।

'শীঘ্রিই আমি ফের উঠে দাঁড়ালাম, দুজনে মিলে ছুটতে লাগলাম নদীর দিকে। পায়ের নিচে বরফের মসৃণ পথটা পেয়ে দুজনেই স্বস্তি পেলাম খানিকটা।

এভাবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াবার পক্ষে এটা ছিলো কিছুক্ষণের বিশ্রাম। কিন্তু আমাদের ঘিরে বাতাস বইতে লাগলো, তুষার জমে উঠলো আমাদের সর্বাঙ্গে, ঝড়ের দাপটে আমরা হেলে পড়তে লাগলাম এধার থেকে ওধারে। আমি মার্থাকে কাছে টানলাম, বাতাসে টালমাটাল হওয়া পাখির মতো ও আমার কাছে সরে এলো। একটু একটু করে তুষারপাত কমে এলো, অবশেষে আর বাতাসের দাপটে নেই। আমি তখন পরিশ্রম বা ঠাণ্ডা কিছুই অনুভব করছি না। শুধু বুঝতে পারছি, অন্ধকার আমাদের দুপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আর মাথার ওপরে ফ্যাকাসে রঙের একটা গলি ধরে চাঁদটা ছুটে চলেছে আমাদের আগে আগে। তখনও আমি অনুভব করছি, চাঁদটা আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, গাছগুলো আমাকে ঘিরে ধীর ঝিমঝিম ছন্দে পাক খেতে খেতে পেছনে সরে যাচ্ছে। আমি অনুভব করছি আমার কাঁধের আঘাত। বুঝতে পারছি মার্থাকে ধরে থাকায় আমার টান করে রাখা হাতটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। চাঁদ আর নদীকে অনুসরণ করে আমরা তখন ছুটে চলেছি। কারণ আমি জানতাম নদীর জল যেখানে নিজের গোপন গহ্বর থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয়। কিন্তু আচমকা কোনো শব্দ না করে বা কিছু বুঝতে না দিয়ে মার্থা ঘুমিয়ে পড়লো।

'আমি ওকে তুলে নিয়ে নদীর তীরে উঠে এলাম। সেখানে আমাকে ঘিরে লার্চ-গাছগুলো ফিসফিসিয়ে উঠলো। গাছের নিচে শুকনো পাতার সমকোণী কারুকাজ। কিছুটা দূর আর আমি ওকে গাছের ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে গেলাম। তারপর ওকে শুইয়ে রেখে বেশ ঝোপঝাড় ছেঁটে সাফ করলাম। এবারে ওই শুকনো শয্যায় ওকে আমার বুকের ওপরে রেখে, আমরা দুজনে সারাটা রাত একসঙ্গে অবসন্নের মতো কাটিয়ে দিলাম। নিজের শরীর দিয়ে মার্থাকে আমি ঘিরে রাখলাম, ঢেকে রাখলাম—ও শুয়ে রইলো খোলসের ভেতরে থাকা বাদামের মতো।

'ফের ভোরবেলা ঠাণ্ডার কামড়ে আমার ঘুম ভাঙলো। আমি কঁকিয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার দুবাহুর মাঝখানে লাল চুলের স্তূপ দেখে আমার মন উষ্ণ হয়ে উঠলো। আমি যখন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছি, তখন আমার চোখের দিকে ও চোখ মেলে তাকালো। তারপর হাসলো—হাসির ভেতর থেকে এলো আতংক। যেন একটা ফাঁদের মধ্যে ফের নিজের মাথাটা গলিয়ে দিয়েছে ও।

'বললাম, 'আমাদের কাছে কোনো চকমকি পাথর নেই'।

আছে,' ও বললো, 'থলেটার মধ্যে চকমকি, ইস্পাত আর শুকনো খড়কুটো।

রাখার বাক্সটা রয়েছে'।

'ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় আমি লার্চের ঝোপগুলোকে দিয়ে আগুন জ্বাললাম। মার্থা আমাকে ভয় পাচ্ছিলো—কাছে কাছে ঘুরছিলো, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসছিলো না।

'বললাম, 'এসো, আমরা খাবারটা খেয়ে নিই'।

'ও বললো, 'তোমার মুখে রক্তের প্রলেপ'!

'আমি চাদরটা খুলে ফেললাম, 'কিন্তু তুমি এসো—ঠাণ্ডায় তুমি জমে গেছো'।

'এক মুঠো তুষার তুলে নিয়ে আমি মুখটা ঘষে নিলাম, তারপর মুছে ফেললাম চাদরটা দিয়ে।

"এখন আমার মুখে আর রক্তের দাগ নেই, আমাকে তোমার আর কোনো ভয়ও নেই। চলে এসো, আমার পাশে এসে বসো—আমরা খেয়ে নিই'।

'কিন্তু ওর জন্যে ঠাণ্ডা রুটিটা কাটতে যেতেই ও আচমকা আমাকে জাপটে ধরে চুমু দিতে শুরু করলো। আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আমার হাঁটু দুটো নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর আমার পায়ে মুখ গুঁজে রাখলো, ওর চুলগুলো আগুনের মতো ছড়িয়ে রইলো আমাব চারদিকে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওই রমণীর দিকে।

"না,' আমি চিৎকার করে উঠলাম। ও নিচ থেকে নিজের মুখখানা আমার দিকে তুলে ধরলো।

"না,' আমি চিৎকার করে বললাম। বুঝতে পারলাম, আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে। আমার বুকে ওর মাথা—আমার নিজের চোখের জল নিজেদের উৎস থেকে বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে তুললো আমার গাল আর ওর চুল, যা আমারই অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিলো।

'তারপর মনে পড়তেই, আমি বুকের ভেতর থেকে গত রাত্রির সেই রঙিন আলোটাকে বের করে নিলাম। দেখলাম, সেটা কালো আর অমসৃণ।

'বললাম, 'একি, এ যে ভোজবাজি'!

"কালো পাথর'! ও অবাক হয়ে গেলো।

'বললাম, 'এটা গতকাল রাতের সেই আলো'।

"এটা জাদু,' জবাব দিলো ও।

"এটা কি আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো'? নুড়িটা তুলে ধরে আমি প্রশ্ন করলাম, 'ভয় পেয়ে এটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলবো'?

'ওটা চকচক করছে' ! মুডিটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ও চিৎকার করে উঠলো, 'রাত্রিবেলায় জানোয়ারদের চোখের মতো, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো নেকড়ের চোখের মতো ওটা চকচক করছে'।

''এটা ভোজবাজি। এটা আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে দাও'।

'কিন্তু না, ও আমার হাতটা ধরে রাখলো।

'চিৎকার করে বললো, 'ওটা লাল, আর চকচক করছে!'

'এটা রক্ত-পাথর,' আমি জবাব দিলাম। 'এটা আমাদের আঘাত দেবে, আমরা রক্ত-ঝরে মরবো'।

''ওটা আমাকে দাও'।

''এটা রক্তের লাল'।

'আঃ, দাও ওটা'।

'বললাম, 'এটা আমার রক্ত'।

''ওটা দাও আমাকে,' নিচু গলায় আদেশের সুরে বললো ও।

'বললাম, 'এটা আমার জীবন-পাথর'।

"দাও না ওটা.' ও মিনতি জানালো।

'আমি ওটা ওকে দিলাম। ও সেটাকে উঁচু করে তুলে ধরে স্মিত হাসলো—হাসলো আমার মুখের ওপরে, আমার দিকে নিজের বাহু দুটি তুলে ধরে। আমি মুখ দিয়ে ওকে গ্রহণ করলাম—আমার মুখ রাখলাম ওর মুখে, ওর শুভ্র গ্রীবায়। ও একটুও কুঁকড়ে উঠলো না, নিবিড় সুখে কাঁপতে লাগলো থিরথির করে।

'গাছগাছালিগুলো যখন আবার ছায়ায় ভরে উঠতে লাগলো, আগুনটা নিভে গেলো, ডুবে যাওয়া মানুষের মতো যখন আমরা চোখ খুলে ওপরের দিকে তাকালাম, তাকালাম গাছের চূড়ায় চূড়ায় জেগে থাকা উজ্জ্বল আর ঘন আলোটার দিকে—তখন যা আমাদের জাগিয়ে তুললো, তা হচ্ছে নেকড়ের আওয়াজ……'

'না,' যাজক ভদ্রলোক আচমকা উঠে দাঁড়ালেন, 'সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে ওরা সুখেই জীবন কাটিয়েছে।'

'না,' আমি বললাম।

* A Fragment of Stained Glass.

সাতখানা মাল বোঝাই বগি নিয়ে ছোট্ট চার নম্বর এঞ্জিনটা ঝনঝন শব্দ তুলে হোঁচট খেতে খেতে সেলস্‌টন থেকে নেমে এলো। মোড়ের কাছ থেকে শব্দ শুনে মনে হচ্ছিলো গাড়িটা বুঝি প্রচণ্ড জোরে আসছে। কিন্তু চমকে ওঠা একটা বাচ্চা-ঘোড়া ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে এক ছুটে স্বচ্ছন্দে গাড়িটাকে হারিয়ে দিয়ে মাঝ-বিকেলের আলোর অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেলো। রেল-লাইন ধরে একটি মেয়ে আণ্ডারউডের দিকে হেঁটে আসছিলো। ঝোপ-ঝাড়ের দিকে নেমে গিয়ে মেয়েটি ওর হাতের ঝুড়িটা একপাশে নামিয়ে রাখলো, তারপর এগিয়ে আসা এঞ্জিনটার চালক-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক। প্রচণ্ড শব্দ তুলে বগিগুলো একে একে ধীর ও অনিবার্য গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো—ঝাঁকুনি তুলে এগিয়ে চলা বগিগুলো আর ঝোপটার মাঝখানে অর্থ-হীন ভাবে আটকে রইলো মেয়েটি। বগিগুলো মোড় ঘুরে কপিস্‌ ঝোপগুলোর দিকে এগিয়ে চললো। ওক গাছের শুকনো পাতা সেখানে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে। গাছগাছালিতে ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা নেমে এসেছিলো, বগিগুলোর পাশাপাশি টুকটুকে লাল শরীর ভাসিয়ে পাখিগুলো উড়ে গেলো সেদিকে। এঞ্জিনের ধোঁয়া ফাঁকা জমিতে নিচের দিকে নেমে এসে লেগে রইলো অমসৃণ ঘাসের বুকে। মাঠগুলো বিষণ্ণ আর জনহীন। জলাজমিটার শেষ প্রান্তে শরগাছে ভর্তি একটা পুকুর। মুরগীগুলো আলডার গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে ছোটাছুটি শেষ করে তাদের আলকাতরা মাখানো খোঁয়াড়ে ফিরে গেছে। পুকুরের ওধারে কোলিয়ারির প্রান্তভাগটা বিকেলের বদ্ধ আলোয় অস্পষ্টভাবে ওপরের দিকে উঠে গেছে, আগুনের শিখা একটা রক্তিম ক্ষতের মতো জিভ মেলে দিয়েছে আশেপাশের পাঁশুটে অঞ্চলগুলোর দিকে। তারপরেই জেগে রয়েছে ব্রিন্‌স্‌লে কোলিয়ারির ক্রমশ সরু হয়ে ওঠা চিমনিগুলো। আকাশের পটভূমিতে দুটো চাকা দ্রুত ঘুরে চলেছে, আর তার এঞ্জিনটা ধকধক শব্দে প্রকাশ করছে নিজের বিক্ষোভ। খনি-শ্রমিকরা উঠে আসছে এবারে।

এঞ্জিনটা শিস দিতে দিতে কোলিয়ারির পাশে পর-পর লাইন পাতা প্রশস্ত অঞ্চলটাতে এসে পৌঁছলো। সারি সারি মালগাড়ি এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খনি-শ্রমিকরা কেউ একা, কেউ-কেউ দল বেঁধে ছায়ার মতো বাড়ি ফিরছে।

রেলপথের পাশে অঙ্গার বেছানো পথটার তিন ধাপ নিচে একটা নিচু ছাদের কুটির যেন হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। বড়সড়ো একটা সতেজ আঙুরলতা যেন টালির ছাদটাকে থাবা দিয়ে পেড়ে আমার জন্যে আঁকড়ে ধরেছে বাড়িটাকে। ইঁট বাঁধানো চত্বরটার আশেপাশে গুটি কয়েক নিস্তেজ প্রিমরোজ। তার ওধারে দীর্ঘ বাগানটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা ছোট্ট নদীর দিকে। বাগানে ডালপালায় ভরা কয়েকটা আপেল গাছ আর কিছু শুঁটকো বাঁধাকপি। রাস্তার পাশে গোলাপি চন্দ্রমল্লিকার এলোমেলো বাহার, দেখে মনে হয় যেন ঝোপঝাড়ের ওপরে গোলাপি কাপড় ঝুলছে। বাগানের মাঝখানে মুরগীর ঘরটা থেকে একটি মেয়ে নিচু হয়ে বেরিয়ে এলো। ঘরের দরজা ভেজিয়ে তালা লাগিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ালো মেয়েটি। তারপর সজ্জারক্ষণী থেকে টুকরো-টাকরা কুটোগুলো ঝেড়ে ফেললো।

মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, উদ্ধত চেহারা, সুদর্শনা, সুন্দর দুটি কালো ভ্রূলেখা, মসৃণ কালো চুলগুলো নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও রেলপথ ধরে এগিয়ে চলা খনি-শ্রমিকদের লক্ষ্য করলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে চললো নদীর দিকে। ওর মুখখানা শান্ত, দৃঢ় আর মোহমুক্তিতে নির্বাক। কিছুক্ষণ বাদে ও ডাকলো, 'জন!'

কোনো সাড়া-শব্দ নেই। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো মেয়েটি। তারপর পরিষ্কার গলায় ফের বললো, 'কোথায় তুমি?'

'এই তো এখানে!' ঝোপগুলোর ভেতর থেকে বিরস শিশুকণ্ঠে জবাব এলো। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটি।

'তুমি কি নদীর দিকে রয়েছো নাকি?' কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলো ও।

জবাবে চাবুকের মতো জেগে থাকা রাস্‌বেরি বেত ঝোপের কাছে বাচ্চাটা নিজেই এসে হাজির হলো। শক্তপোক্ত চেহারার পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট ছেলে। একেবারে স্থির হয়ে, অবাধ্যের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ও।

'ও! আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওই জলকাদার দিকেই নেমে গেছো,' মা মিটমাট করে নেবার স্বরে বললো! 'আমি তোমাকে কি বলেছিলাম, মনে আছে?'

ছেলেটা নড়লো না, কোনো জবাবও দিলো না।

'এসো, চলে এসো,' মা আরও নরম গলায় বললো, 'অন্ধকার হয়ে আসছে। ওই দ্যাখো, তোমার দাদুর এঞ্জিনটাও লাইন ধরে এগিয়ে আসছে!'

নির্বাক, ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে ছেলেটি। ওর পরনের

পাতলুন আর ওয়েস্টকোটটা যে কাপড় দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটা ওই মাপের পোশাকের পক্ষে বেশ মোটা আর শক্ত। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওগুলো কোনো বয়স্ক মানুষের পোশাক কেটে বানানো হয়েছে।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে ছেলেটা গুচ্ছ গুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে মুঠো-মুঠো পাপড়ি পথে ছড়াতে লাগলো।

'অমন করে না, সোনা—দেখতে বিশ্রী লাগে,' মা বললো। তারপর আচমকা নিজেই তিন-চারটে নিস্তেজ ফুল শুদ্ধু একটা ছোট্ট ডাল ছিঁড়ে নিয়ে নিজের গালের কাছে ধরলো। বাড়ির উঠোনের কাছে এসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি—ফুলগুলো ফেলে না দিয়ে, ওগুলো নিজের সজ্জারক্ষণীর কোমরের ফিতেতে গুঁজে রাখলো ও। তারপর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মায়ে-ছেলেতে মিলে ঘর-ফিরতি শ্রমিকদের দেখতে লাগলো। ছোট্ট ট্রেনটাও ততোক্ষণে বেশ কাছাকাছি এসে গেছে। আচমকা এঞ্জিনটা ওদের বাড়িটাকে পেরিয়ে গিয়ে, ফটকের উলটো দিকে থমকে দাঁড়ালো।

এঞ্জিন-চালক—বেঁটেখাটো, পাকাদাড়িওয়ালা মানুষটি—এঞ্জিন থেকে বাইরে ঝুঁকে খোস মেজাজী স্বরে মেয়েটিকে বললো, 'এক পেয়ালা চা হবে নাকি রে?'

মানুষটা মেয়েটির বাবা। মেয়েটি চা দেবে জানিয়ে ভেতরে চলে গেলো এবং তক্ষুনি ফিরে এলো।

'রোববার তোর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি নি,' লোকটা বলতে শুরু করলো।

'তুমি আসবে বলে আমি আশাও করি নি,' মেয়ে জবাব দিলো।

এঞ্জিন-চালক মুখটা কোঁচকালো। তারপর ফের খুশিয়াল স্বরে বললো 'ও, তুই তাহলে খবরটা শুনেছিস? তা এ ব্যাপারে তোর কি মনে হয়?'

'ব্যাপারটা খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো।'

মেয়ের ছোট্ট খোঁচায় ছোটোখাটো মানুষটা অধৈর্যের ভঙ্গিমা প্রকাশ করলো। তারপর মিষ্টি স্বরে, অথচ ভয়ংকর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'একটা পুরুষমানুষ আর কি করতে পারে, বল? আমার বয়সী একটা মানুষের পক্ষে এটা একটা জীবনই নয়—এ যেন নিজের বাড়ির তাপচুল্লির কাছে একটা বাইরের লোক হয়ে বসে থাকা। আর ফের যদি বিয়েই করি, তাহলে এমনিতেই হয়তো অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি কি করি বা না করি তাতে অন্যের কি এসে যায়?'

মেয়েটি কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর এক পেয়ালা চা আর একটা পিরিচে এক টুকরো রুটি-মাখন নিয়ে হিস্‌হিস্ শব্দ

তোলা এঞ্জিনটার পাদানির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'রুটি-মাখন আমার কোনো দরকারই ছিলো না। তবে এক পেয়ালা চা...' একটা চুমুক দিয়ে বাবা প্রশংসার সুরে বললো, 'ভারি সুন্দর হয়েছে চা-টা।' ফের দু-এক মুহূর্ত চায়ে চুমুক দিয়ে মানুষটা বললো, 'শুনলাম ওয়াল্টার নাকি ফের একটা কাণ্ড করেছে।'

'কাণ্ড সে কবে করে না?' মেয়েটির কণ্ঠস্বরে তিক্ততার রেশ।

'সেদিন লর্ড নেলসনে গিয়ে শুনলাম, সে নাকি বড়াই করে পুরো আধ সভ্‌রিণের* মদ খেয়েছে।'

'কবে?'

'এইতো, শনিবার রাতে। আমি জানি কথাটা সত্যি।'

'হতেও পারে,' মেয়েটি তিক্ত হাসি ছড়ালো। 'ও আমাকে তেইশ শিলিং করে দেয়।'

'চমৎকার কাণ্ড! টাকা নিয়ে আর কিছু করার নেই তো নিজেকে জানোয়ার করে তোলে!' পাকা জুলফিওয়ালা মানুষটা বললো। মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ওর বাবা চায়ের শেষ চুমুকটা গিলে নিয়ে পেয়ালাটা ফিরিয়ে দিলো মেয়ের হাতে।

মুখটা মুছে নিয়ে মানুষটা বললো, 'এটা তাহলে শেষবোধ চুকেবুকে গেলো...' তারপর হাতলটাতে হাত রাখতেই ছোট্ট এঞ্জিনটা কষ্টেসৃষ্টে গুঙিয়ে উঠলো, গড়গড় করে মোড়ের দিকে চলতে শুরু করলো ট্রেনটা। মেয়েটি ফের লাইনের ওধারে তাকালো। রেল-লাইন আর বগিগুলোর ওপরে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। ধূসর ছায়া-মূর্তির মতো দলে দলে শ্রমিক এখনও ঘরে ফিরে চলেছে। সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে পুলি-এঞ্জিনগুলো। বিষণ্ণ জনস্রোতের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে এলিজাবেথ বেটস বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। ওর স্বামী এখনও ফিরে এলো না।

রান্নাঘরটা ছোটো, চুল্লির আগুনে-আলোয় উজ্জ্বল। স্তূপীকৃত গনগনে কয়লা চিমনির মুখে আলোর আভা ছড়াচ্ছে। ঘরের মধ্যে প্রাণ বলতে যা কিছু আছে, তা সবই যেন ওই উষ্ণ তাপচুল্লি আর তার ইস্পাতের বেষ্টনীটার মধ্যে—যার গায়ে ফুটে উঠছে আগুনের লালচে প্রতিফলন। চায়ের জন্য টেবিলে কাপড় পাতা হয়েছে, ছায়ার আঁধারে ঝকমক করছে পেয়ালাগুলো। পেছন দিকে—সিঁড়ির নিচের দিককার ধাপগুলো যেখানে ঘরে এসে ঢুকেছে, সেখানে

* ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা—এখনকার এক পাউণ্ডের সমতুল।

একটি ছেলে বসে বসে ছুরি দিয়ে এক খণ্ড কাঠ কাটার চেষ্টা করছে। ছায়ার মধ্যে প্রায় যেন হারিয়ে গেছে ছেলেটা। বাবা না এলে ওরা চা খাওয়া শুরু করতে পারছে না। কাঠ কাটার চেষ্টায় ব্যস্ত ছেলেটার জেদী মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথের মনে হলো, বাপের মতো ছেলেটাও নিজের বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে নির্বিকার। স্বামীর চিন্তাতেই যেন মগ্ন হয়ে রয়েছে এলিজাবেথ। বাড়িতে ঢোকার আগে মদ গেলার জন্যে মানুষটা হয়তো নিজের বাড়ির দরজাই সবেগে পেরিয়ে চলে গেছে। আর এদিকে অপেক্ষায় থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে তার রাতের খাবারগুলো। ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, আলুর পাত্রটা থেকে জল ছেঁকে ফেলার জন্যে উঠোনে বেরিয়ে এলো এলিজাবেথ। বাগান আর নদীর ওধারে মাঠঘাটগুলোতে অনিশ্চিত অন্ধকার। গরম জলের ধোঁয়া-ওঠা নালাটাকে পেছনে রেখে ও যখন সসপ্যানটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো তখন দেখলো, রেল-লাইন আর মাঠটা পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে উঠে যাওয়া বড় রাস্তাটিতে হলদে বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

ঘরে ঘর-ফিরতি মানুষগুলোকে লক্ষ্য করলো ও। ক্রমশ ওদের সংখ্যা কমে আসছে, এখন আরও কম।

ভেতরে আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে, ঘরটা গাঢ় লাল। সসপ্যানটা তাকে রেখে মেয়েটি একখণ্ড পুডিং উনুনটার মুখে রাখলো, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো নিস্পন্দ হয়ে। তক্ষুনি দরজার বাইরে কোনো হালকা পায়ের চটুল শব্দ শোনা গেলো। কে যেন এক মুহূর্ত দরজার হাতলটাকে ধরে রইলো—তারপরেই একটি ছোট্ট মেয়ে ঘরে ঢুকে টানাটানি করে বাইরের পোশাক খুলতে লাগলো। টুপিটা ধরে টান লাগাতেই সোনালি থেকে সবেমাত্র বাদামি হতে থাকা এক রাশ কোঁকড়ানো চুল ঢেকে দিলো ওর চোখ দুটিকে।

দেরী করে স্কুল থেকে ফেরার জন্যে মা ওকে বকলো। বললো, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয় বলে শীতের দিনগুলোতে ওকে বাড়িতেই রেখে দিতে হবে।

'কেন মা এখনও তো অন্ধকারই হয় নি! ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, বাবাও বাড়িতে ফেরে নি।'

'না, ও অবিশ্যি ফেরে নি। কিন্তু এখন পৌনে পাঁচটা বাজে! বাবাকে তুমি কোথাও দেখেছো নাকি?'

বাচ্চাটা গম্ভীর হয়ে ওঠে, চিন্তা মাখানো বড়োবড়ো নীল চোখ মেলে মা-র দিকে তাকায়।

'না মা, দেখিনি। কেন, বাবা কি এই অব্দি এসে আবার ওল্ড ব্রিনস্লের

দিকে চলে গেছে না কি? না মা, বাবা তা করেনি—আমি তো দেখলাম না বাবাকে!'

'তুমি যাতে তাকে দেখতে না পাও, সেদিকে সে নিশ্চয়ই নজর রেখেছিলো,' মা তিক্ত স্বরে বললো। 'ধরে নিতে পারো, সে এখন প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সে বসে রয়েছে। নইলে আসতে এতো দেরী করতো না।'

বাচ্চা মেয়েটা করুণ চোখে মা-র দিকে তাকালো, 'এসো মা, আমরা চা খেয়ে নিই—কি বলো?'

মা জনকে টেবিলে আসতে ডাকলো। তারপর ফের দরজাটা খুলে লাইনের অন্ধকারের ওধারে তাকালো। কেউ কোথাও নেই। ঘুরন্ত চাকাগুলোর এঞ্জিনের শব্দও ও শুনতে পেলো না। নিজের মনেই বললো, 'হয়তো সে কোথাও ফুর্তি করতে গেছে।'

ওরা চা খেতে বসলো। টেবিলের এক প্রান্তে দরজার কাছে বসা জন অন্ধকারে প্রায় হারিয়েই গেছে। অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি আগুনের বেষ্টনীর কাছে নিচু হয়ে পুরু একখণ্ড পাঁউরুটি আস্তে আস্তে নেড়েচেড়ে শেঁকে নিচ্ছিলো, আগুনের আভায় ওর মুখখানা লাল। ছেলেটি ছায়ার মধ্যে অন্ধকার হয়ে থাকা মুখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে।'

'তাই বুঝি?' মা শুধালো, 'কেন?'

'কি লাল!' আর ছোটোছোটো গুহায় ভর্তি। আগুন পোহাতে খুব মজা। গন্ধটাও বেশ।'

'চুল্লিটা সারানো দরকার,' মা বললো, 'তোমাদের বাবা বাড়িতে ফিরেই বলতে শুরু করবে, খনি থেকে ঘাম ঝরিয়ে এসে কোনদিনও বাড়িতে একটু আগুন পাওয়া যায় না। ওদিকে শুঁড়িখানাগুলো সব সময়েই দিব্যি গরম থাকে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকার পর ছেলেটি অভিযোগের স্বরে বললো, 'একটু তাড়াতাড়ি করো না, অ্যানি!'

'করছি তো! আমি তো আর আগুনকে দিয়ে জোর করে রুটি শেঁকাতে পারি না!'

'ও ইচ্ছে করেই রুটিটা দূরে রেখেছে, যাতে দেরী হয়।'

'ছিঃ সোনা', মা বললো, 'অমন আজেবাজে কথা ভাবতে নেই।'

একটু পরেই অন্ধকার ঘরখানা রুটি চিবানোর কুড়মুড়ে শব্দে ভরে ওঠে। মা খুব সামান্যই খেলো। চা খেতে খেতে ভাবলো। যখন কুর্সি ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো, মাথার ঋজু ভাঙ্গমায় ওর মনের রাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। চুল্লির কাছে রাখা পুডিংটার দিকে তাকিয়ে আচমকা ফেটে পড়লো ও, 'কি লজ্জার কথা, রাতের খাবারটা খেয়ে নেবার জন্যেও মানুষটা বাড়িতে ফিরতে পারে না! যাকগে, পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমার কি? নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে উনি শুঁড়িখানায় গেলেন, আর আমি বসে রইলাম ওঁর খাবার আগলে…'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এলিজাবেথ। তারপর ফিরে এসে লাল আগুনের ওপরে একটার পর একটা কয়লা টুকরো ফেলতেই দেয়ালে ছায়া পড়তে শুরু করলো, প্রায় অন্ধকার হয়ে গেলো পুরো ঘরটা।

'আমি দেখতে পাচ্ছি না,' অন্ধকারে মিলিয়ে থাকা জন বিরক্তিতে বিড়বিড়িয়ে বললো।

'নিজের মুখের রাস্তাটা তো চেনো,' মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেললো। কয়লার পাত্রটা বাইরে রেখে এলো ও। কিন্তু একটা ছায়ামূর্তির মতো ফের ঘরে এসে ঢুকতেই ছেলেটা আবার বিরস স্বরে অভিযোগ জানালো।

'আমি দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'ওহ্, ভগবান!' এলিজাবেথ বিরক্তিতে ফেটে পড়লো, 'একটু অন্ধকার হয়েছে কি অমনি বাপের মতো শুরু করলো!'

তবু তাপচুল্লির তাকে রাখা স্তূপটা থেকে একটুকরো কাগজ ধরিয়ে, ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা বাতিটার দিকে এগিয়ে গেলো ও। বাতিটার দিকে হাত বাড়াতেই বোঝা গেলো, অন্তঃসত্ত্বা হবার দরুন ওর শরীরটা সবেমাত্র ভরাট হতে শুরু করেছে।

'মা!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো অ্যানি।

'কি হলো?' বাতিটাতে চিমনি লাগাতে গিয়েও এলিজাবেথ থমকে রইলো। ওর হাত দুটি তখনও ওপরের দিকে তোলা, মুখখানা মেয়ের দিকে ঘোরানো, তামার প্রতিফলক থেকে আলোটা সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ওর ওপরে।

'তোমার পোশাকে একটা ফুল!' এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় মেয়েটা যেন আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

'তাই বলো!' এলিজাবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'লোকে শুনলে ভাবতো বাড়িতে বুঝি আগুন লেগেছে।' চিমনিটা লাগিয়ে সলতেটা উসকে দেবার আগে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে রইলো ও। একটা পাণ্ডুর ছায়া অস্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে রইলো মেঝের ওপরে।

'আমাকে একটু গন্ধ শুঁকতে দাও!' এগিয়ে গিয়ে অ্যানি মা-র কোমরে মুখ

গুঁজলো।

'আর ন্যাকামো করতে হবে না, যাও!' এলিজাবেথ বাতিটাকে উসকে দেয়। আলোটা ওদের উদ্বেগকে এতো স্পষ্ট করে তোলে যে এলিজাবেথের কাছে তা প্রায় অসহ্য বলে মনে হয়। অ্যানি তখনও ওর কোমরের কাছে নিচু হয়ে রয়েছে। বিরক্ত হয়ে কোমরের ফিতেটা থেকে ফুলগুলোকে খুলে নেয় ও।

'না মা, ওগুলো খুলো না লক্ষ্মীটি।' অ্যানি ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে ফুল-গুলোকে যথাস্থানে গুঁজে রাখার চেষ্টা করে।

'কি যে বোকামো করো!' মা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

অ্যানি বিবর্ণ চন্দ্রমল্লিকাগুলোকে ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে অস্ফুটে বলে, 'কি সুন্দর সুবাস, তাই না!'

'না', এলিজাবেথ ছোট্ট করে হাসে, 'আমার কাছে না। যেদিন আমার বিয়ে হলো, যেদিন তুমি জন্মালে আর প্রথম যেদিন ওকে মাতাল অবস্থায় সবাই মিলে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এলো—প্রতিদিনই ওর বোতাম-ঘরে চন্দ্রমল্লিকা গোঁজা ছিলো।'

এলিজাবেথ বাচ্চাদের দিকে তাকায়। ওদের চোখ আর ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটগুলি বিস্ময়ে ভরা। খানিকক্ষণ দোল-কুর্সিটাতে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে ও। তারপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কঠোর তিক্ততায় ভরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'ছ-টা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। সবাই মিলে ধরাধরি করে না আনা অব্দি সে আসবে না, ওখানেই লেগে থাকবে! তবে খনির নোংরা পোশাক পরে এখানে গড়াতে গড়াতে আসার কোনো দরকারও নেই, আমি ধুইয়ে-মুছিয়ে সাফ করাতে পারবো না। ইচ্ছে হলে মেঝেতে শুয়ে থাকতে পারে। ইস, কি বোকামোই না আমি করেছি—কি প্রচণ্ড বোকামো! এই জন্যেই কি আমি এখানে, এই নোংরা গর্তটাতে এসে ঢুকেছিলাম! মানুষটা কিনা নিজের দরজার কাছ দিয়ে চোরের মতো সরে পড়ে! সপ্তাহে দুবার—এখন আবার শুরু করেছে ...'

কথা বন্ধ করে টেবিলটা সাফ করার জন্যে উঠে দাঁড়ায় এলিজাবেথ।

ঘন্টাখানেক বা তার চাইতে খানিকটা বেশি সময় বাচ্চারা খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো। কিন্তু মা-র রাগ আর বাবার বাড়ি ফেরার কথা ভেবে আজ ওদের খেলায় আর ততোটা মন নেই। মিসেস বেটস দোলকুর্সিতে বসে ঘি-রঙের একখণ্ড মোটা ফ্লানেল নিয়ে একটা জামা তৈরি করছিলো। বাচ্চাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে উৎসাহ ভরে সেলাই করছিলো ও, রাগটা শান্ত হয়ে

উঠছিলো নিজে থেকেই। বাইরে ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই ও সেলাই থামিয়ে চকিতে মাথা তুলে বাচ্চাদের বলছিলো, 'চুপ!' কিন্তু পায়ের শব্দ দরজাটা পেরিয়ে চলে যেতেই ও সময় মতো সামলে নিচ্ছিলো নিজেকে, বাচ্চাদেরও খেলার রাজ্য থেকে সরে আসতে হচ্ছিলো না।

কিন্তু শেষ অব্দি অ্যানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হার মানলো। পর-পর ৮টি সাজিয়ে রেলগাড়ি খেলা ওর আর ভালো লাগছিলো না। অভিযোগ জানাবার ভঙ্গিতে ও মা-র দিকে ফিরে তাকালো।

'মা!' অ্যানি অস্ফুটে ডাকলো।

জন সোফার তলা থেকে একটা ব্যাঙের মতো গুড়ি মেরে বেরিয়ে এলো। মা চোখ তুলে তাকালো।

'ছাখো, ওর জুতো দুটোর দিকে তাকিয়ে ছাখো একবার,' বললো ও।

ভালো করে দেখার জন্যে ছেলেটা হাত দুটোকে সামনে মেলে ধরলো, মুখে কিছু বললো না। তারপরেই লাইনের ওধার থেকে কে যেন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, উদ্বেগ কণ্টকিত হয়ে উঠলো সারা ঘরটাতে। কিন্তু দুটো লোক কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে দিয়েই চলে গেলো।

'শোবার সময় হয়ে গেছে,' মা বললো।

আমার বাবা তো এখনও ফেরেনি!' অ্যানির কণ্ঠস্বরে বিলাপের সুর। কিন্তু এলিজাবেথের মন তখন সাহসে ভরে উঠেছে।

'না এলো। যখন আসবে, তখন সবাই মিলে ওকে একটা কাঠের গুঁড়ির মতো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসবে।' ও বলতে চায়, তখন কোনো নাটকীয় দৃশ্য গড়ে উঠবে না। 'যতোক্ষণ নিজে থেকে না জাগবে, ততোক্ষণ মেঝেতেই শুয়ে ঘুমোবে। আমি তো জানি, এর পর আসছে কাল সে আর কাজে বেরুবে না।'

বাচ্চাদের হাত আর মুখ ফ্লানেল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হলো। ওরা দুজনেই খুব চুপচাপ। রাত্রিবাস পরে ওরা প্রার্থনা করলো। ছেলেটা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো প্রার্থনার বাণীগুলো। মা তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে—তাকিয়ে রইলো মেয়েটার ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে থাকা বাদামি রঙের কোঁকড়ানো এলোমেলো রেশমি চুলের বোঝা আর ছেলেটার কালো চুল ভরা মাথাটার দিকে। ওদের বাবা—যে এই তিনটি প্রাণীর এতো উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়েছে, তার ওপরে প্রচণ্ড রাগে বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো ওর। বাচ্চা দুটো আরাম পাবার জন্যে ওর স্কার্টে মুখ গুঁজলো।

মিসেস বেটস যখন ফের নিচে নেমে এলো তখন ঘরটা আশ্চর্য শূন্য, প্রতীক্ষায়

উদগ্রীব। কিছুক্ষণ মাথা না তুলে ও বসে বসে সেলাই করলো। ততোক্ষণে ওর রাগের মধ্যে আতংকের ছোপ লেগেছে।

ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজতেই এলিজাবেথ কুর্সিতে সেলাইটা ফেলে রেখে আচমকা উঠে দাঁড়ালো। সিঁড়ির দরজাটা খুলে কান পেতে রইলো ও। তারপর বাইরে বেরিয়ে, পেছন দিকে দরজাটা তালা বন্ধ করে রাখলো।

উঠোনে একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠলো ও—যদিও ও জানে এসব ইঁদুরের কাণ্ড, ইঁদুরে জায়গাটা একেবারে বোঝাই। রাতটা ভীষণ অন্ধকার। সারি সারি মালগাড়ি বোঝাই বিশাল রেলপথটাতে কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই। শুধু দূরে খনির কাছে গুটিকয়েক হলদে বাতি আর চিমনির মুখে জ্বলন্ত কয়লার রক্তিম আভাটুকু দেখতে পেলো ও। দ্রুতপায়ে রেললাইন পেরিয়ে সাদা ফটকটার কাছে পৌঁছে গেলো এলিজাবেথ। এখান থেকেই রাস্তাটা বেরিয়েছে। যে আতংকটা ওকে এই অব্দি নিয়ে এসেছে, এবারে তা কুঁকড়ে উঠলো। রাস্তা ধরে মানুষ-জন নিউ ব্রিনস্লের দিকে হেঁটে চলেছে। বাড়িঘরের আলোগুলোও দেখতে পেলো এলিজাবেথ। আর বিশ গজ দূরেই প্রিন্স অফ ওয়েলসের বড়ো বড়ো জানলা—ভারি উষ্ণ আর আলোকিত ওই জানলাগুলো। ওখানকার পুরুষমানুষদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বরগুলো এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়। স্বামীর একটা বিপদ-আপদ হয়েছে ভেবে কি বোকামোটাই না করেছে ও! আসলে মানুষটা হয়তো স্রেফ প্রিন্স অফ ওয়েলসে বসে বসে মদ গিলছে। এলিজাবেথ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আজ অব্দি কোনোদিনও ও মানুষটাকে ওখান থেকে নিয়ে আসার জন্য যায়নি, যাবেও না কোনোদিন। তাই ও বড়ো রাস্তার ধারে এলোমেলোভাবে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে, একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়লো।

'মিঃ রিগলে? হ্যাঁ! আপনি তাঁকে চান? না, এই মুহূর্তে উনি তো বাড়িতে নেই!'

অস্থি-সর্বস্ব মহিলাটি বাসন মাজতে মাজতে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে এলিজাবেথের ওপরে একটা অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

'মিসেস বেটস নাকি?' মহিলার কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রমের সুর।

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম তোমার কত্তাটি বাড়িতে আছেন কিনা দেখে যাই। আমারটি তো এখনও ফেরেন নি।'

'ফেরেন নি বুঝি ! জ্যাক তো বাড়িতে ফিরে খেয়ে দেয়ে বেরুলো। শোবার আগে আধঘণ্টার জন্যে বেরিয়েছে। তা তুমি প্রিন্স অফ ওয়েলসে একবার খোঁজ নিয়ে দেখেছো ?'

'না...'

'যেতে ইচ্ছে হয়নি বোধহয় ? না হবারই কথা।—জায়গাটা তো খুব একটা ভালো নয় !' মহিলার কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয়ের সুর। কিছুক্ষণ নীরবতার পর মহিলা ফের বললো, 'জ্যাক কিন্তু তোমার কত্তার সম্পর্কে কিছুই বলেনি।'

'আমার ধারণা সে ওখানেই জমে রয়েছে।'

তিক্তস্বরে কথাটা বললো এলিজাবেথ। ও জানে, উঠোনের উলটো দিকের বাড়ির মহিলাটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে। কিন্তু তাতে ওর কিছুই এসে যায় না। ও ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই মিসেস রিগলে বললো, 'একটু দাঁড়াও! আমি জ্যাককে জিগেস করে আসি ও কিছু জানে কিনা।'

'না, না—আমি তোমাকে ঝামেলায় ফেলতে...'

'ঝামেলার কিছু নেই, আমি যাবোই। তুমি শুধু ভেতরে এসে একটু খেয়াল রাখো, বাচ্চাগুলো নিচে নেমে এসে গায়ে আগুন-টাগুন না ধরায়।'

এলিজাবেথ বেটস অস্ফুটে আপত্তি জানাতে জানাতে ভেতরে গিয়ে ঢোকে। অন্য মহিলাটি ঘরের অগোছালো অবস্থার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

রান্নাঘরের অবস্থার জন্যে ক্ষমা চাইবারই কথা। সোফা আর ঘরের মেঝেতে ছোটোছোটো ফ্রক, পাতলুন আর বাচ্চাদের অন্তর্বাস ছড়ানো। চতুর্দিকে অসংখ্য খেলনা। টেবিলের কালো অয়েল ক্লথটার ওপরে রুটি আর কেকের টুকরো, খানিকটা ঝোল আর ঠাণ্ডা চা ভর্তি একটা টি-পট।

'আমাদের বাড়িরও এমনি দুর্দশা,' ঘরের দিকেনয়—মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো এলিজাবেথ।

মিসেস রিগলে মাথায় একটা কালো শাল চাপিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'আমি এক্ষুনি আসছি।'

ঘরের অগোছালো অবস্থার দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ অপ্রসন্ন মুখে বসে থাকে। তারপর মেঝেতে ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো হরেক মাপের জুতোগুলো গুনতে শুরু করে। মোট বারো জোড়া। 'অবাক হবার কিছু নেই'...ঘরের নোংরা অবস্থাটা লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও। তারপরেই উঠোনে দু-জোড়া পায়ের শব্দ শোনা যায়, রিগলেরা ভেতরে এসে ঢোকে। এলিজাবেথ উঠে

দাঁড়ায়। রিগলের চেহারাটা বিশাল, হাড়গুলো প্রচণ্ড চওড়া—বিশেষ করে মাথাটা একেবারে অস্থিসার। কপাল জুড়ে একটা নীল ক্ষতচিহ্ন। খনিতে কাজ করার সময় ওখানে আঘাত পেয়েছিলো রিগলে। কয়লার গুঁড়ো ঢুকে থাকায় এখন ওটা একটা নীল উল্কি বলে মনে হয়।

'ও এখনও ফেরেনি?' কোনো রকম সম্ভাষণ না জানিয়ে, সম্ভ্রম আর সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করলো মানুষটা। 'কোথায় আছে তা তো আমি বলতে পারবো না, তবে ওখানে নেই—।' মাথায় ঝাঁকুনি তুলে ইঙ্গিতে প্রিন্স অফ ওয়েলসের কথাটা বুঝিয়ে দিলো সে।

'হয়তো ইউ-তে গেছে,' মিসেস রিগলে বললো।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব হয়ে থাকে। রিগলেকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, সে কোনো একটা কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। অবশেষে সে বলে, 'আমরা খনি থেকে উঠে আসার সময় ওকে চিৎকার করে জিগেস করলুম, 'ওয়াল্ট তুমি এখন আসবে না'? সে বললে, 'তোমরা যাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি'। তারপর আমি আর বাওয়ার্স উঠে এলুম, ভাবলুম ও হয়তো পরের খাঁচাটাতে উঠে আসবে।'

রিগলে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সঙ্গীকে ছেড়ে আসার অভিযোগে তাকে জবাবদিহি দিতে হচ্ছে। একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে ফের সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে এলিজাবেথ। তবু রিগলেকে আশ্বস্ত করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার মনে হয় আপনাদের কথাই ঠিক—ও হয়তো ইউ-ট্রিতেই গেছে। এই তো প্রথম নয়, এর আগেও আমি এভাবে ভুগেছি। সবাই মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলে, তবে ও বাড়ি ফিরবে।'

'কি অন্যায়, তাই না।' মিসেস রিগলে দুঃখ প্রকাশ করে।

পাছে মনের আশংকাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে রিগলে প্রস্তাব জানায়, 'আমি বরঞ্চ ডিকের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসি, ও সেখানে আছে কি না।'

এলিজাবেথ জোর দিয়ে বলে, 'আমি কিছুতেই আপনাকে অতোটা বিরক্ত করতে রাজী নই।' কিন্তু রিগলে বুঝতে পারে, এলিজাবেথ তার প্রস্তাবে খুশিই হয়েছে।

ওরা হোঁচট খেতে খেতে গলিটা ধরে এগিয়ে চলে। এলিজাবেথ শব্দ শুনে বুঝতে পারে, রিগলের স্ত্রী খবরটা জানাবে বলে এক ছুটে উঠোনটা পেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীর দরজা খোলালো। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের সবটুকু রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডটা থেকে সরে গেলো।

'সাবধান কিন্তু।' রিগলে ওকে সতর্ক করে দেয়, 'পথটা খারাপ। আমি বহুবার বলেছি, একদিন এখান দিয়ে চলতে গিয়ে কারুর পা ভাঙবে।'

এলিজাবেথ নিজেকে সামলে নিসে রিগলের সঙ্গে যেতে যেতে বলে, 'বাড়িতে কেউ না থাকলে বাচ্চাদের শুইয়ে রেখে বেরিয়ে আসতে আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

'না, তা ঠিকই!' রিগলে সৌজন্য প্রকাশ করে।

একটু পরেই ওরা এলিজাবেথদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে যায়। রিগলে বলে, 'আমি এক্ষুনি খবর নিয়ে আসছি। আপনি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবেন না। ও ভালোই আছে।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ রিগলে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রিগলে চলে যেতে যেতে বলে, 'আমি বেশি দেরী করবো না।'

বাড়িটা নিস্তব্ধ-নঝুম। টুপি খুলে, শালটা গুটিয়ে, এলিজাবেথ বেটস কুর্সিতে গিয়ে বসে। ন-টা বেজে মাত্র কয়েক মিনিট হয়েছে। হঠাৎ খনির দিক থেকে ভেসে আসা পুলি-এঞ্জিনের ক্ষিপ্র আওয়াজ আর খনি-গহ্বরে নামতে থাকা খাঁচাটার থমকে দাঁড়ানোর শব্দ শুনে চমকে ওঠে এলিজাবেথ। শরীরের মধ্যে রক্তের সেই যন্ত্রণাদায়ক স্রোতটার উপস্থিতি ফের অনুভব করে ও। কপালের দুপাশে হাত রেখে ও নিজেকেই ভর্ৎসনা করে বলে, 'হে ঈশ্বর! কেন এতো ভাবছি আমি? ওটা নিশ্চয়ই রাত-শ্রমিকদের খনিতে নামার শব্দ।'

নিস্পন্দ আর উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে এলিজাবেথ। এমনিভাবে বসে থেকে আধঘণ্টাতেই অবসন্ন হয়ে ওঠে ও। করুণভাবে নিজেই নিজেকে বলে, 'কেন আমি এভাবে নিজেকে উত্তেজিত করে চলেছি? এমনি করলে আমি নিজেই নিজের ক্ষতি করে ফেলবো।'

ফের সেলাইটা নিয়ে বসে ও।

পৌনে দশটায় পায়ের শব্দ শোনা গেলো। এক জন! দরজাটা খুলবে বলে তাকিয়ে রইলো এলিজাবেথ। মাথায় কালো টুপি আর গায়ে কালো রেশমী শাল জড়ানো এক বৃদ্ধা ঘরে এসে ঢুকলেন। বৃদ্ধা ওর শাশুড়ি। মহিলার বয়েস প্রায় ষাট, নীল চোখ, পাণ্ডুর মুখে অসংখ্য রেখার আঁকিবুঁকি। দরজাটা বন্ধ করে উনি পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে খিটখিটে গলায় কঁকিয়ে উঠলেন, 'হায়রে লিজি, আমাদের কি হবে! কি করবো আমরা!'

চকিতে একটু পেছিয়ে গেলো এলিজাবেথ, 'কি হয়েছে, মা?'

'তোমায় কি করে বলবো জানি নে বাছা!' বৃদ্ধা নিজে থেকেই সোফায় বসে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকেন। উৎকণ্ঠিত আর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঁকে লক্ষ্য করতে থাকে এলিজাবেথ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা বললেন, 'আমার যন্ত্রণার আর শেষ নেই! এ জীবনে কতো দুর্ভোগই যে সইলুম!' ওঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তবু উনি চোখ মুছলেন না।

'কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন না, মা?' এলিজাবেথ ওঁকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছে?'

এলিজাবেথের সরাসরি প্রশ্নে বৃদ্ধার চোখের-জলের ঝরণাধারা বন্ধ হলো। আস্তে আস্তে চোখ দুটো মুছে উনি গুমরে উঠলেন, 'হায়রে বেচারা। বাছা আমার! আমরা যে কি করবো, তা-ই জানি না! এদিকে তোমার তো এই অবস্থা · ওদিকে যে সত্যিই সবনাশ হয়ে গেলো!'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো এলিজাবেথ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'ও কি মারা গেছে?' ও বুঝতে পারছিলো, প্রশ্নটার চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতায় ওর গাল দুটোতে লজ্জার সামান্য ছোপ লেগেছে। তবু প্রশ্নটাতে ওর নিজের বুকটাই প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠলো। বৃদ্ধাকে ভয় পাইয়ে দেবার পক্ষেও কথাটা একেবারে যথেষ্ট।

'অমন কথা বোলো না, এলিজাবেথ! আশা করি ঘটনাটা আমাদের পক্ষে ততোটা খারাপ হবে না। না না, ভগবান আমাদের তেমন বিপদে ফেলবেন না! আমি শুতে যাবার আগে সবেমাত্র এক গ্লাস পানীয় নিয়ে বসেছি. আর ঠিক তক্ষুনি রিগলে গিয়ে হাজির। বললো, 'মিসেস বেটস, ওয়াল্টের একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমরা ওকে বাড়িতে না নিয়ে যাওয়া অব্দি আপনি বরঞ্চ একটু এলিজাবেথের কাছে গিয়ে বসুন'। আমি ওকে আর কিছু জিগেস করার মতো সময় পাইনি, তার আগেই ও চলে গেলো। আমিও তক্ষুনি টুপিটা মাথায় চাপিয়ে সোজা এখানে চলে এলুম। আসতে আসতে ভাবছিলুম, 'বেচারী লিজা! কেউ গিয়ে আচমকা খবরটা দিলে ওর যে কি হবে, তা কে জানে'! তুমি কিন্তু এতে ভেঙে পড়ো না, লিজি। কারণ তাহলে যে কি হতে পারে, তা তো তুমি জানোই! ক মাস চলছে তোমার—ছয়, না পাঁচ?' বৃদ্ধা মাথা দোলান, 'সময় চলে যায়, শুধু চলে যায়!'

এলিজাবেথ তখন অন্য কথা চিন্তা করছে। মানুষটা যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার সামান্য ভাতা আর ও নিজে যেটুকু রোজগার করতে পারবে—

তা দিয়ে এলিজাবেথ কি সংসার-খরচা সামলাতে পারবে? দ্রুত হিসেব কষে নেয় ও। মানুষটা আহত হয়ে থাকলে, ওরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে না—তখন ওকে সেবা-শুশ্রূষা করাটা কি ক্লান্তিকরই না হয়ে উঠবে। তবে সে ক্ষেত্রে এলিজাবেথ হয়তো ওর মদ খাওয়া এবং অন্যান্য বদ অভ্যেসগুলো ছাড়াতে পারতো। মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে, এলিজাবেথ তার সব কিছুই করবে। ছবিটার কথা চিন্তা করতেই ওর চোখে জল এসে যায়। কিন্তু এসব কি দুঃখ-বিলাস শুরু করেছে ও? এবারে বাচ্চাদের কথা ভাবতে থাকে ও। যাই হোক না কেন, বাচ্চাদের কাছে ও অপরিহার্য। তাদের নিয়েই ওর সব কিছু।

বৃদ্ধা ফের বলতে শুরু করলেন, 'মনে হচ্ছে যেন দু-এক হপ্তা আগে ওয়াল্ট ওর প্রথম মাইনের টাকাটা আমাকে এনে দিলো। ওর দিক থেকে দেখতে গেলে ও বেশ ভালো ছেলেই ছিলো গো, এলিজাবেথ—বেশ ভালো ছেলে। কেন যে ও অমন গোলমেলে হয়ে উঠলো, জানি নে। বাড়িতে ও দিব্যি হাসিখুশিই থাকতো, তবে দুরন্তপনায় ভর্তি। ও যে একটি শয়তানের শিরোমণি ছিলো, সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। আশা করি ও নিজের দোষগুলো শুধরে নেবে বলে ভগবান এবারের মতো ওকে রক্ষা করবেন। তুমিও ওকে নিয়ে অনেক ভুগেছো এলিজাবেথ, সত্যিই ভুগেছো। কিন্তু এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে আমার কাছে ও দিব্যি হাসিখুশিই ছিলো। জানি না, কি করে ...'

বৃদ্ধা একঘেয়ে বিরক্তিকর সুরে বকবক করেন আর এলিজাবেথ নিজের চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে থাকে। হঠাৎ এঞ্জিনের দ্রুত আওয়াজে চমকে ওঠে ও, তারপরেই ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। এলিজাবেথ শুনতে পায়, এঞ্জিনটা আরও আস্তে আস্তে চলছে, ব্রেকের আর আওয়াজ নেই। বৃদ্ধা কিন্তু কিছুই খেয়াল করেন নি। শুধু এলিজাবেথ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে।

'কিন্তু লিজি, ও তো তোমার ছেলে নয়—তফাতটা তো সেখানেই। এখন ও যা-ই হোক না কেন, আমার কাছে ও সেই ছোট্টটি ই রয়ে গেছে। আমি ওকে বুঝতে শিখেছিলুম, ওর আব্দার সইতে শিখেছিলুম। ওদের আব্দারগুলোকে একটু প্রশ্রয় তো দিতেই হয়...'

সাড়ে দশটা বাজে। বৃদ্ধা তখনও বলে চলেছেন, 'জীবনের শুরু থেকে শেষ অব্দি সবটাই শুধু ঝামেলা। যতোই বুড়ো হও না কেন, ঝামেলার আর শেষ নেই...' বলতে বলতেই দরজায় দড়াম করে একটা শব্দ হয়, সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ জেগে ওঠে।

'আমি যাচ্ছি, লিজি'—বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার আগেই এলিজাবেথ

দরজায় পৌঁছে গেছে। দরজার বাইরে খনির-পোশাক পরা একটা লোক।

লোকটা বললো, 'ওরা ওকে নিয়ে আসছে।'

মুহূর্তের জন্যে এলিজাবেথের হৃৎপিণ্ডটা যেন স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর ফের তা এমন উত্তাল হয়ে উঠলো যে ওর প্রায় দম বন্ধ হয়ে ওঠার উপক্রম।

'ও কি · আঘাতটা কি খুবই খারাপ?' জিজ্ঞেস করলো এলিজাবেথ।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালো, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন, ও বেশ কয়েকঘণ্টা আগেই মারা গেছে। উনি বাতি-ঘরে ওকে পরীক্ষা করে দেখেছেন।'

বৃদ্ধা এলিজাবেথের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা শুনে উনি ধপাস করে একখানা ·কুর্সিতে বসে, হাত দুটো গুটিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'হায় হায়! হায় রে বাছা আমার!'

'চুপ!' চকিতে এলিজাবেথের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো, 'আপনি একটু স্থির হোন মা—বাচ্চাদেব জাগিয়ে দেবেন না···আমি কিছুতেই ওদের ভেঙে পড়তে দেবো না।'

বৃদ্ধা দুলে দুলে নিচু গলায় বিলাপ করতে থাকেন। লোকটা সবে পড়ছিলো। এলিজাবেথ এক পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করে হলো?'

'দেখুন, আমি সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারবো না,' লোকটা ভীষণ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে জানালো। 'ও সামান্য একটা কাজ সেরে নিচ্ছিলো। সঙ্গীরা সবাই ওপরে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে খাদের চালটা ওর মাথায় ভেঙে পড়ে।'

'ও সেটাতে চাপা পড়েছে?' শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠলো বিধবা।

'না, চালটা ওর পেছন দিকে ভেঙে পড়েছিলো—ওর গায়ে একটুও লাগেনি। কিন্তু ওর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মনে হয়, ও দম আটকেই মারা গেছে।'

এলিজাবেথ শিউরে উঠে পেছিয়ে যায়। শুনতে পায়, পেছন থেকে বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে প্রশ্ন করছেন, ''কি হয়েছিলো? হ্যাগো, কি বলছে লোকটা?'

লোকটা আরও একটু চড়া গলায় বললো, 'ও দম আটকে মারা গেছে।'

বৃদ্ধার কান্না এবারে উচ্চকিত হয়ে উঠলো। এলিজাবেথ ওঁর হাতে নিজের হাত রেখে বললো, 'মাগো, বাচ্চাগুলোকে জাগিয়ে তুলবেন না, মা—বাচ্চাগুলোকে জাগাবেন না!'

নিজের অজান্তেই এলিজাবেথ সামান্য একটু কাঁদলো। বৃদ্ধাও দুলে দুলে বিলাপ করতে লাগলেন। এলিজাবেথের মনে পড়লো, মানুষটাকে ওরা

বাড়িতে নিয়ে আসছে—অতএব ওকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। মুহূর্তের জন্যে পাণ্ডুর আর হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। নিজের মনেই বললো, 'ওকে ওরা বাইরের ঘরেই রাখবে।'

একটা মোমবাত্তি জেলে ছোট্ট ঘরখানাতে গিয়ে ঢুকলো এলিজাবেথ। ঘরের বাতাসটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে—কিন্তু তাপচুল্লি নেই বলে এ ঘরে আগুন জালানো যাবে না। মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলো ও। মোমবাতির আলোটা জানলার শার্সি, গোলাপি-চন্দ্রমল্লিকা রাখা দুটো ফুলদানি আর মেহগনি কাঠের ঘন-রঙা আসবাবগুলোতে পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকাগুলোর মৃত্যু-শীতল সুবাস। ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এলিজাবেথ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে একবার হিসেব কষে নিলো, সোফা আর কারুকাজ করা-আলমারিটার মাঝখানের মেঝেতে মানুষটাকে এনে শোযাবার মতো যথেষ্ট জায়গা হবে কিনা। কুর্সি-গুলোকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলো ও। এবারে মানুষটাকে এনে শোয়াবার এবং ওর পাশ দিয়ে চলা-ফেরা করার মতো জায়গাটা পাওয়া যাবে। গালচের টুকরোটাকে বাঁচাবার জন্যে ও একটা লাল রঙের পুরনো টেবিল-ঢাকা এবং আরও একটা পুরনো কাপড় নিয়ে এসে মেঝেতে বিছিয়ে দিলো। বাইরের ঘরটা থেকে আসার সময় ও শীতে কাঁপছিলো। তাই পোশাক রাখার দেরাজ থেকে একটা পরিষ্কার জামা বের করে, সেটাতে হাওয়া লাগাবার জন্যে আগুনের সামনে রেখে দিলো। এই পুরো সময়টাই ওর শাশুড়ি শুধু দুলে দুলে বিলাপ করছিলেন। এলিজাবেথ ওঁকে বললো, 'আপনাকে ওখান থেকে উঠতে হবে, মা। ওরা ওঁকে নিয়ে আসছে। আপনি এই দোল-কুর্সিটাতে এসে বসুন।'

বৃদ্ধা মা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে গিয়ে আগুনের কাছে বসে, ফের বিলাপ করতে শুরু করলেন। এলিজাবেথ আর একটা মোমবাতি নিয়ে আসার জন্যে ভাঁড়ারে গিয়ে ঢুকলো এবং সেখানে সেই নগ্ন টালির ঢালু ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে মানুসগুলোর আসার শব্দ শুনতে পেলো। ভাঁড়ারের দোরগোড়ায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। শব্দ শুনে বুঝলো, ওরা বাড়ির শেষ প্রান্তটা পেরিয়ে এসে এলোমেলো পায়ে সিঁড়ির তিনটে ধাপ পেরিয়ে এলো। অনেকগুলো মানুষের পা ঘষটে চলার আওয়াজ, কিছু অস্ফুট কণ্ঠস্বর। বৃদ্ধাও এখন নীরব। মানুষ গুলো উঠোনে এসে পৌঁছেছে।

এলিজাবেথ শুনতে পেলো খনির ম্যানেজার ম্যাথিউস বলছে, 'জিম, তুমি আগে যাও। দেখো, সাবধান কিন্তু!'

দরজাটা খুলে যেতেই মহিলারা দেখতে পেলো, স্ট্রেচার ধরে একটা লোক ঘরের দিকে পেছন ফিরে ভেতরে এসে ঢুকলো। স্ট্রেচারের ওপরে মৃত মানুষটার নাল-লাগানো জুতোজোড়াই শুধু দেখা যাচ্ছিলো। বাহক দুজন থমকে দাঁড়ালো, অন্য দিকের লোকটা তখন দোরগোড়ায় ঝুঁকে রয়েছে।

'কোথায় রাখবে?' ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন। মানুষটার ছোটোখাটো চেহারা, মুখে সাদা দাড়ি।

এলিজাবেথ নিজেকে জাগিয়ে তুললো। না জ্বালানো মোমবাতিটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও, 'বাইরের ঘরে।'

'ওদিকে, জিম!' ম্যানেজার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতেই বাহকরা মোড় ঘুরে ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু ওরা দুটো দোরগোড়ার মাঝখান দিয়ে এলোমেলো ভাবে বাঁক নেবার জন্যে মৃতদেহটাকে ঢেকে রাখা কোটটা নিচে পড়ে গেলো। মেয়েরা দেখলো, ওদের মানুষটার কোমর অব্দি গা খোলা। বৃদ্ধা আতংকে নিচু গলায় কাঁদতে শুরু করলেন।

'স্ট্রেচারটাকে এক পাশে নামিয়ে, ওকে কাপড়ের ওপরে শুইয়ে দাও।' ম্যানেজার বললেন, 'এবারে দেখো...সাবধান। সামলে!'

বাহকদের মধ্যে একজনের ধাক্কা লেগে চন্দ্রমল্লিকা রাখা ফুলদানিটা মেঝেতে ছিটকে পড়লো। লোকটা অপ্রস্তুতভাবে সেদিকে তাকিয়ে স্ট্রেচারটা নামিয়ে রাখলো। এলিজাবেথ ওর স্বামীর দিকে তাকিয়েও দেখেনি। ঘরে ঢোকার সুযোগ পেতেই, ও ভেতরে গিয়ে ভাঙা ফুলদানি আর ফুলগুলো কুড়িয়ে নিলো।

'একটু দাঁড়ান!' বললো ও।

ওরা তিনজনে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইলো, এলিজাবেথ ততোক্ষণে ঝাড়ন দিয়ে মেঝে থেকে জলটা মুছে নিলো।

'ছি ছি, কি একটা বিশ্রী কাণ্ডই না ঘটে গেলো!' বিড়ম্বনা আর বিহ্বলতায় ভ্রূদুটো ঘষতে ঘষতে ম্যানেজার বললেন, 'এমন একটা কাণ্ড আমি জীবনেও শুনিনি! ওর তখন ওখানে পড়ে থাকার মতো কোনো কাজই বাকি ছিলো না। এমন একটা ঘটনা কস্মিনকালেও হয়েছে বলে আমি শুনিনি! ছাদটা হুস করে নেমে এসে, ওকে ভেতরে আটকে ফেললো। মোট চার ফুটও ফাঁকা জায়গা ছিলো না—অথচ ওর গায়ে বলতে গেলে একটি আঁচড়ও লাগেনি।' কয়লার গুঁড়ো মাখা অর্ধনগ্ন মৃত মানুষটার দিকে চোখ নামিয়ে তাকালেন উনি, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন, 'শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু'। এমন ভয়ংকর ব্যাপার আমি জন্মেও শুনিনি। দেখে মনে হয় যেন চক্রান্ত করে কাজটা করা হয়েছে।

ছাদটা পড়বি তো পড়, ঠিক ওর পথ বন্ধ করে পড়লো—ঠিক যেন একটা ইঁদুর ধরার কল।' হাতটা সজোরে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন উনি।

খনির শ্রমিক দুজন পাশে দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়লো। ঘটনার বীভৎসতা ওদের সকলকেই শিউরে তুলেছে।

ওপর তলা থেকে অ্যানির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ওরা, 'মা, কে এসেছে—মা? কি হয়েছে?'

এলিজাবেথ দ্রুত পায়ে সিঁড়ির নিচে ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরলো। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'তুমি ঘুমোতে যাও! চেঁচামেচি করছো কেন? এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়োগে—কিচ্ছু হয়নি।'

তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো ও। সিঁড়িতে, ওপরের ছোট্ট শোবার ঘরটাতে ওর পায়ের শব্দ নিচ থেকেও শুনতে পেলো সকলে। তারপর স্পষ্ট শুনতে পেলো এলিজাবেথ বলছে, 'ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে তোমার, বোকা মেয়ে?' ওর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা আর নকল নমনীয়তা।

'আমার মনে হলো, কারা বুঝি এসেছে।' বাচ্চাটা কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা কি এসেছে?'

'হ্যাঁ, ওরা তাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাই নিয়ে হৈচৈ করার মতো কিছু হয়নি। নাও—এবারে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ো তো সোনা।'

শোবার ঘর থেকে ভেসে আসা এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর ওরা নিচ থেকেও শুনতে পেলো। ওরা অপেক্ষা করে রইলো, এলিজাবেথ বিছানার চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো বাচ্চা দুটোকে।

'বাবা কি মাতাল হয়ে এসেছে?' ভয়ে ভয়ে, আধোভাবে মেয়েটি জানতে চাইলো।

'না না, মাতাল হয়নি! ও · ও ঘুমোচ্ছে।'

'নিচের তলায় ঘুমোচ্ছে?'

'হ্যাঁ-- এবারে আর গোলমাল করবে না কিন্তু।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর সবাই শুনলো, মেয়েটি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'বললাম তো, কিছু নয়। তবু ওই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন?'

শব্দটা ওদের ঠাকুরমার চাপা কান্নার। সব কিছু ভুলে গিয়ে উনি ওঁর কুর্সিতে বসে শুধু দুলে দুলে কাঁদছেন। ম্যানেজার ওঁর বাহুতে হাত রেখে অনুরোধ জানানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'শ্‌ শ্‌...'

বৃদ্ধা চোখ খুলে ম্যানেজারের দিকে তাকালেন। বাধা পেয়ে উনি যেন আহত, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

'কটা বেজেছে?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়ার আগে অ্যানি করুণ স্বরে শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলো।

'দশটা,' ওর চাইতেও নরম গলায় জবাব দিলো এলিজাবেথ। তারপর নিশ্চয়ই নিচু হয়ে চুমু দিলো বাচ্চা দুটোকে।

ম্যাথিউস মজুর দুজনকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। ওরা মাথায় টুপি চাপিয়ে স্ট্রেচারটা নিয়ে, মৃতদেহটাকে ডিঙিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। জেগে-থাকা বাচ্চা দুটোর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে না যাওয়া অব্দি ওরা কেউই কোনো কথা বলেনি।

এলিজাবেথ নিচে নেমে এসে দেখলো, শুধু একা ওর শাশুড়ি মেঝেতে বসে মৃত মানুষটার ওপরে ঝুঁকে রয়েছেন—ওঁর অশ্রু ঝরে পড়ছে মানুষটার শরীরে।

'ওকে একটু ঠিকঠাক করে শোয়াতে হবে,' কেতলিটা চুল্লিতে চাপিয়ে ফিরে এলো এলিজাবেথ। তারপর মানুষটার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করলো। একটি মাত্র মোমবাতির আলোয় ঘরটা স্যাঁতসেঁতে আর অস্পষ্ট। তাই প্রায় মেঝে অব্দি মুখটা নামিয়ে আনতে হলো এলিজাবেথকে। অবশেষে ভারি জুতো দুটোকে খুলে, দূরে সরিয়ে রাখলো ও।

'এবারে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে,' ফিসফিসিয়ে বৃদ্ধাকে বললো ও। দুজনে মিলে মানুষটার পোশাক ছাড়ালো ওরা।

উঠে দাঁড়িয়ে ওরা দেখলো, মৃত্যুর সরল মহিমা নিয়ে শুয়ে আছে মানুষটা। আতংক আর শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা, তাকিয়ে রইলো মানুষটার দিকে। বৃদ্ধা মা অস্পষ্ট স্বরে কাঁদছেন। এলিজাবেথের মনে হলো, ওর ন্যায্য অধিকারটুকু যেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন নিজের মাঝে চরম অলঙ্ঘ্য হয়ে শুয়ে আছে মানুষটা। এলিজাবেথের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এলিজাবেথ এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। একটু ঝুঁকে, দাবী জানানোর ভঙ্গিমায়, মানুষটার শরীরে নিজের হাত রাখলো ও। শরীরটা এখনও গরম · কারণ খনির ভেতরটা—যেখানে ও মারা গেছে, সেখানটা গরম ছিলো। মা নিজের শুষ্ক করপুটে ছেলের মুখখানা ধরে অসংলগ্ন ভাবে অস্ফুটে যেন কি বলছেন। গাছের ভেজা পত্রালি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া জলের মতো ওঁর চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঝরে পড়ছে। মা কাঁদছেন না, শুধু চোখের জল নেমে আসছে অজস্র ধারায়। এলিজাবেথ স্বামীর

শরীরটাকে জড়িয়ে ধরলো—গাল আর ঠোঁট ছুঁইয়ে যেন কি শুনলো, কি খুঁজলো, যেন ফিরে পেতে চেষ্টা করলো স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো পথ। কিন্তু পেলো না। ওকে ফিরে আসতে হলো। ওয়াল্টার এখন অজ্ঞেয়।

এলিজাবেথ উঠে দাঁড়ালো। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে একটা গামলায় গরম জল ঢেলে, সাবান ফ্লানেল আর একটা নরম তোয়ালে নিয়ে ফিরে এলো।

'আমি ওকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবো,' বললো ও।

বৃদ্ধা আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, এলিজাবেথ সন্তর্পণে স্বামীর মুখখানা ধুইয়ে দিলো, ফ্লানেল দিয়ে সযত্নে ওর বিশাল সোনালি গোঁফ জোড়াকে ঠোঁটের ওপর থেকে মুছিয়ে দিলো। এলিজাবেথের মনে এখন এক নিতল আতংক, তাই ও এমন করে স্বামীর পরিচর্যা করছে। বৃদ্ধার মন ঈর্ষায় ভরে উঠলো। বললেন, 'দাও, আমি ওকে মুছিয়ে দিই!'

এলিজাবেথ স্বামীকে ধুইয়ে দিতে লাগলো আর অন্য ধারে হাঁটু মুড়ে বসে বৃদ্ধা আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিতে লাগলেন ছেলের শরীর। মাঝে মাঝে বৃদ্ধার বিশাল কালো টুপিটা ছুঁয়ে যেতে লাগলো পুত্রবধূর কালো চুলভরা মাথাটাকে। এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাজ করে চললো দুজনে। ওরা কখনও ভোলেনি, এটা মৃত্যু। মৃত মানুষটার শরীরের স্পর্শ ওদের কাছে এক বিচিত্র অনুভূতি বয়ে আনছিলো। দুজনের কাছে অনুভূতিটা দু-রকম। মা-র মনে হচ্ছিলো, একটা মিথ্যাকে তিনি গর্ভে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আর স্ত্রী অনুভব করছিলো মানব-আত্মার চরম বিচ্ছিন্নতা, এমন কি গর্ভের সন্তানটার সঙ্গেও ওর যেন কোনো সংযোগ নেই।

অবশেষে ওদের কাজ শেষ হলো। ওয়াল্টারের চেহারাটা সুন্দর, মুখে সুরাসক্তির কোনো চিহ্ন নেই। মাথায় সোনালি চুল, পেশীবহুল শরীর, সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু মৃত।

'আহারে, বাছা আমার!' ছেলের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বৃদ্ধা নিবিড় আতংকে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আমার সোনা ছেলে!' আতংক আর মাতৃস্নেহের নিটোল উচ্ছ্বাসে অস্ফুট ওঁর কণ্ঠস্বর।

ফের মেঝেতে বসলো এলিজাবেথ। তারপর স্বামীর গলায় নিজের মুখটা ডুবিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো বারবার। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে আনতে হলো ওর। কারণ মানুষটা এখন মৃত, তার কাছে এলিজাবেথের প্রাণময় শরীরের এখন কোনো ঠাঁই নেই। এক প্রচণ্ড আতংক আর পরম অবসাদ এলিজাবেথকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। এমনি করেই নষ্ট হয়ে গেলো ওর জীবনটা।

'ছাখো, কেমন দুধের মতো সাদা ওর গায়ের রঙ···আর কি পরিষ্কার ওর চামড়া, ঠিক যেন একটা বারোমাসের বাচ্চা। কোথাও এতোটুকু দাগ নেই—একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ফর্সা।' বৃদ্ধা মাতৃগর্বে বিড়বিড়িয়ে বললেন। এলিজাবেথ নিজের মুখ লুকিয়ে রাখলো।

'ও শান্তি মতোই চলে গেছে, লিজি—ছাখো, ঠিক যেন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। কি সুন্দর আমার সোনাটা, তাই না গো? ও নিশ্চয়ই শান্তি পেয়েছিলো, লিজি। ওখানে আটক হয়ে ও নিশ্চয়ই শান্তি-ভিক্ষা করে নেবার মতো সময়টুকু পেয়েছিলো। শান্তি না পেলে ওকে কিছুতেই এমন ছাখাতো না। বাছা আমার, আমার সোনা-মানিক! ভীষণ প্রাণখুলে হাসতো ও, আমি শুনতে খুব ভালোবাসতুম। জানো লিজি, ছেলেবেলায় ও দারুণ প্রাণ খুলে হাসতো'

এলিজাবেথ চোখ তুলে তাকায়। গোঁফের নিচে মানুষটার ঠোঁট দুটি সামান্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো আধবোজা, তাতে এতোটুকুও দীপ্তি নেই। ধোঁয়াটে আগুনকে সঙ্গে নিয়ে জীবন ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে—এখন ও এলিজাবেথের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ অপরিচিত। মানুষটা যে ওর কাছে কতোটা অপরিচিত ছিলো, এখন তা বুঝতে পারে এলিজাবেথ। এখন ওর জরায়ুতে আতংকের হিম—কারণ আলাদা শরীরের ওই অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে ও এতোদিন এক দেহে লীন হয়ে জীবন কাটিয়েছে। তাহলে এজন্যেই কি সব কিছু? তাহলে কি সবাই সম্পূর্ণ আলাদা, শুধু জীবনের উত্তাপ দিয়ে সেই সত্যটাকে অস্বচ্ছ করে রাখা হয়? নিবিড় আতংকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এলিজাবেথ। ওর মুখটাও এখন মৃতের মতো। আসলে ওদের মধ্যে কোনোদিনই কোনো সম্পর্ক, কোনো সংযোগ ছিলো না। তবু ওরা পরস্পরের কাছে এসে একত্র হয়েছে, বারবার বিনিময় করেছে নিজেদের নগ্নতা। মানুষটা ওকে উপভোগ করেছে, কিন্তু কোনোদিনই ওদের সম্পূর্ণ মিলন হয়নি—চিরদিনই ওরা ছিলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আজকের মতো চিরকালই ওরা ছিলো পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরে। এ জন্যে এলিজাবেথের চাইতে মানুষটার দায়িত্ব বেশি নয়। জরায়ুর বাচ্চাটাকে বরফের মতো হিমেল বলে মনে হয় এলিজাবেথের। কারণ মৃত মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর শীতল অনাসক্ত মনটা সুস্পষ্ট ভাবে বলে ওঠে, 'কে আমি? এতোদিন আমি কি করেছি? যার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না, আমি সেই স্বামীকে নিয়ে সংগ্রাম করেছি। অথচ মানুষটা ছিলো। তাহলে আমি এমন কি অন্যায় করেছি? কাকে নিয়ে বাস করেছি এতোদিন? আসলে সে ওই মানুষটা, যে ওখানে

পড়ে রয়েছে।' এলিজাবেথের আত্মাটা ভয়ে মরে যায়।' এবারে ও বুঝতে পারে, ও কোনোদিনও মানুষটাকে সত্যি করে দেখেনি—ওয়াল্টারও দেখেনি ওকে। অন্ধকারে ওদের দেখা হয়েছিলো, অন্ধকারেই ওরা সংগ্রাম করেছে। কিন্তু কেউই জানে না কার সঙ্গে দেখা হলো, সংগ্রামই বা কার সঙ্গে। এখন ও সবকিছু দেখতে পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। কারণ এতোদিন ও ভুল করেছে··· ওয়াল্টার যা নয়, ও তাকে তা-ই বলেছে। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছে। অথচ চিরদিনই ওয়াল্টার ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা—তার জীবন আলাদা, আলাদা তার অনুভূতি।

ভয়ে আর লজ্জায় ওয়াল্টারের নগ্ন দেহটার দিকে তাকায় এলিজাবেথ। এই মানুষটাকে ও ভুল চিনেছিলো, অথচ এই মানুষটাই ওর সন্তানদের জনক। ওর আত্মাটা ওর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষটার নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে ওর লজ্জা হয়, যেন মানুষটাকে ও অস্বীকার করেছে। ব্যাপারটা ওর কাছে ভয়ংকর বলে মনে হয়। ওয়াল্টারের মুখের দিকে একবারটি তাকিয়ে দেয়ালের দিকে নিজের মুখটা ঘুরিয়ে নেয় ও—কারণ ওয়াল্টারের চেহারা ওর চেহারার মতো নয়, ওয়াল্টারের পথ আর ওর পথ সম্পূর্ণ আলাদা। এখন ও বুঝতে পেরেছে, ওয়াল্টার যেমনটি ছিলো ও তাকে তেমনটি বলে মেনে নেয়নি, তার প্রকৃত সত্তাকে ও অস্বীকার করেছে। আর এটাই তো ছিলো ওদের জীবন—শুধু মিথ্যের বেসাতি। প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে মৃত্যুর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় এলিজাবেথের মন ভরে ওঠে—ও বুঝতে পারে, ও নিজে মরে যায়নি।

অথচ মানুষটার জন্যে দুঃখ আর করুণায় এলিজাবেথের বুকটা যেন ফেটে যায়। কতোটা কষ্ট সইতে হয়েছিলো মানুষটাকে? কি প্রচণ্ড আতংকই না অনুভব করেছিলো অসহায় মানুষটা! তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে এলিজাবেথ। বিপদের সময় মানুষটাকে ও সাহায্য করতে পারেনি। নির্দয় আঘাত পেয়েছিলো ওয়াল্টার—এই উলঙ্গ মানুষটা, এই অন্য অস্তিত্বটা। এলিজাবেথ তা এতোটুকুও মেরামত করে তুলতে পারেনি। অবিশ্যি বাচ্চারা রয়েছে—কিন্তু বাচ্চারা তো জীবনের জন্যে, ওদের সঙ্গে এই মৃত মানুষটার কোনো সম্পর্ক বা সংযোগই নেই। ওরা দুজনে ছিলো দুটি নদীখাত, যার ভেতর দিয়ে জীবনধারা বয়ে গিয়েছিলো সন্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এলিজাবেথ মা—কিন্তু আজ ও বুঝতে পেরেছে, স্ত্রী হওয়াটা কতো ভয়ানক। আর ওয়াল্টার—যে এখন মৃত, সে নিশ্চয়ই অনুভব করতো স্বামী হওয়াটা কি ভয়ংকর।

এলিজাবেথের মনে হয়, পরলোকে গিয়ে ও মানুষটাকে চিনতে পারবে না। সেখানে দেখা হলে ইহলোকের সম্পর্কের কথা ভেবে ওরা দুজনেই লজ্জা পাবে। কোনো এক রহস্যময় কারণে ওদের দুজনের দেহ থেকে সন্তানেরা এসেছে। কিন্তু তারা ওদের দুজনকে মিলিত করেনি। আজ মৃত্যু এসে বুঝিয়ে দিয়েছে, চিরদিনই ওদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিলো, চিরদিনের মতোই ওদের সমস্ত সম্পর্ক এখন ছিন্ন হয়ে গেছে। এলিজাবেথ বুঝতে পারে, ওর জীবনে এই উপাখ্যানের এখানেই পরিসমাপ্তি। জীবনে ওরা একে অন্যকে মেনে নেয়নি। আজ ওয়াল্টার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে আর এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা নেমে এসেছে এলিজাবেথের জীবনে। তাহলে আজ সবই শেষ! মানুষটার মৃত্যুর বহু আগেই ওদের মধ্যে সবকিছু অর্থহীন হয়ে উঠেছিলো। তবু সে ছিলো ওর স্বামী। কিন্তু সে আর কতোটুকু!

'ওর জামাটা পেয়েছো, এলিজাবেথ?'

এলিজাবেথ কোনো জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। ওর শাশুড়ির ইচ্ছে, ও একটু কান্নাকাটি বা ওই ধরনের কিছু করুক। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ও তা পাবে না, শুধু নিশ্চুপ হয়ে থাকে। রান্নাঘর থেকে জামাটা নিয়ে আসে ও।

'জামাটা শুকিয়েছে,' ওয়াল্টারকে পরাবার জন্যে সুতির জামাটা আঁকড়ে ধরে এলিজাবেথ। মানুষটাকে স্পর্শ করতে যেন লজ্জা হয় ওর। ওই দেহটাকে স্পর্শ করার কি অধিকার আছে ওর কিংবা অন্য কারুর? তবু বিনত শ্রদ্ধায় মানুষটার গায়ে হাত দেয় ও। এ অবস্থায় পোশাক পরানো রীতিমতো কঠিন। দেহটা যেমন ভারি, তেমনি নিঃসাড়। ওই প্রচণ্ড গুরুভার আর নিঃসাড় নিস্পন্দতায় এক ভয়ঙ্কর আতংক যেন এলিজাবেথের সমস্ত অস্তিত্বটাকে আঁকড়ে ধরে। ওদের দুজনের মাঝখানকার বিপুল দূরত্ব ওর পক্ষে প্রায় অসহ্য—এ যেন এক অন্তহীন শূন্যতা যার ওধারে ওকে চোখ মেলে তাকাতে হবে।

অবশেষে পোশাক পরানো শেষ হয়। ওয়াল্টারের দেহটা চাদরে ঢেকে, মুখের কাছটা বেঁধে দেয় ওরা। পাছে বাচ্চারা দেখে ফেলে, তাই বাইরের ঘরের দরজাটাও এলিজাবেথ শক্ত করে এঁটে রাখে। তারপর বুকভরা শান্তির ভার নিয়ে রান্নাঘরটা সাফ-সুফো করতে যায় ও। ও জানে, জীবনের কাছে ও নিজেকে নিবেদন করেছে—জীবনই ওর প্রত্যক্ষ প্রভু। কিন্তু পরম প্রভু মৃত্যুর কথা মনে হতেই ভয় আর লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠে এলিজাবেথ।

* Odour of Chrysanthemums

মাটিতে সামান্য বরফ, গির্জার ঘড়িতে সবেমাত্র মাঝরাতের ঘণ্টা বেজেছে। পায়ের তলায় শুভ্র নিষ্কলঙ্ক পৃথিবী, মাথার ওপরে চাঁদের বদলে পথের আলো আর আলোগুলোর ওপরে গাঢ় অন্ধকার আকাশ—সব মিলিয়ে শীতের রাতে অন্তত একটিবারের জন্যে হ্যাম্পস্টেডকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

কয়েকটা কণ্ঠস্বরের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেলো, ফুটে উঠলো কোনো লুকিয়ে থাকা হলদে আলোর অস্পষ্ট আভাস। তারপরেই উঁচু আর অন্ধকার জর্জিয়ান বাড়িটার বাগানের দরজা আচমকা খুলে গেলো, তিনটি বিভ্রান্ত মানুষ বেরিয়ে এলো বাইরে। গাঢ় নীল রঙের কোট আর ফারের টুপি পরা ভীষণ ঋজু চেহারার একটি মেয়ে, ছোট্ট একটা বাক্স হাতে কুঁজোমতো একটা লোক আর টুপিবিহীন, লাল দাড়িওয়ালা একটি রোগা-পাতলা মানুষ। দোরগোড়া থেকে উঁকি মেরে ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে লণ্ডনের দিকে নেমে যাওয়া পথটার দিকে তাকালো।

'চেয়ে ভাখো। এ এক নতুন পৃথিবী!' উতরাইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা লোকটা বিদ্রূপের সুরে চিৎকার করে উঠলো।

'না, লরেনজো—নতুন নয়! শুধু চুনকাম করা হয়েছে!' ওভারকোট পরা তরুণ উঁচু গলায় জবাব দিলো। ওর কণ্ঠস্বরটা সুন্দর, অনুনাদী, আশ্চর্য ধ্বনিময় আর তার সঙ্গে রয়েছে এক ক্লান্ত তিক্ততার ছোঁয়া। পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ওর মুখটা ছায়ার আড়ালে আবছা হয়ে ওঠে।

ঋজু চেহারার মেয়েটি পাখির মতো তৎপর ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে মানুষ দুটির দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

'কি বললে?' ক্ষিপ্র আর শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো ও।

'লরেনজো বলছে, এ এক নতুন পৃথিবী। তাই আমি বললাম, এটা স্রেফ কলি ফেরানো হয়েছে।' রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষটা চড়া গলায় জবাব দিলো।

মেয়েটি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পশমি দস্তানা পরা আঙুলগুলো ওপরের দিকে তুলে ধরলো। আসলে ও বধির, কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করছে।

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে ও। খিলখিল করে হেসে উঠে ও চকিতে গোল টুপি পরা মানুষটার দিকে তাকালো। তারপর ফের তাকালো আস্তর লাগানো

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবার ভঙ্গিমায় হাত নাড়তে থাকা মানুষটার দিকে। মুখ কুঁচকে স্যাটারের* মতো হাসছে মানুষটা।

'চলি লরেনজো, বিদায়!' গোল টুপি পরা মানুষটার ক্লান্ত অনুনাদী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'বিদায়!' রাত-পাখির মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বললো মেয়েটি।

সবুজ দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ভেতরের দরজা: মোড়ের পুলিসটা বাদে রাস্তায় শুধু ওরা দুজন। এঁকেবেঁকে প্রচণ্ড ঢালু রাস্তাটা নেমে গেছে পাহাড়তলির দিকে।

'খেয়াল রেখে পা ফেলো!' গোল টুপি পরা মানুষটা কুঁজো হয়ে পথ চলতে চলতে ঋজু আর তৎপর মেয়েটির কাছে ঝুঁকে উঁচু গলায় বললো। মানুষটা কি বলছে তা বোঝার জন্যে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মেয়েটি।

'আমার কথা ভাবতে হবে না, আমি ঠিকই আছি। তুমি বরং নিজের দিকে খেয়াল রাখো!' দ্রুত জবাব দিলো ও।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছল তুষারে পা হড়কে পড়তে পড়তেও কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিলো মানুষটা। পা টিপে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করলো মেয়েটি। টুপিটা ছিটকে পড়েছে মোড়ের কাছে বাতিটার তলায়। নিচু হয়ে টুপিটা তুলে নেবার সময় মানুষটার মাথায় খানিকটা টাক দেখা গেলো, কালো কোঁকড়ানো চিকন চুলের মাঝখানে ঠিক যেন কিছুটা জায়গা কামিয়ে ফেলা হয়েছে। মানুষটা যখন চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকালো, তখন তার ভ্রূকুটো অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বেঁকে উঠেছে, বাঁকা নাকে উপহাসের ছোঁয়া। টুপিটা ফের মাথায় চাপাতেই তাকে দেখে মনে হলো যেন শয়তানিতে ভরা এক তরুণ পুরোহিত। রোম্যান দেবতা ফ্যান-এর মতো মানুষটার মুখের রেখাগুলো সুন্দর, মুখে যেন শহীদের অভিব্যক্তি। যেন দুর্বোধ্যতার সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ ফ্যান।

'চোট পেয়েছো?' আবেগবর্জিত ঠাণ্ডা গলায় মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

'না!' উপহাসের সুরে চিৎকার করে জবাব দিলো মানুষটা।

'যন্ত্রটা আমায় দাও,' মেয়েটি ওর পশমি দস্তানা পরা হাতটা এগিয়ে দিলো। 'মনে হচ্ছে, ওটা আমার কাছে রাখাই নিরাপদ।'

'তুমি এটা নিতে চাও?'

'হ্যাঁ, ওটা আমার কাছে রাখা ঢের বেশি নিরাপদ।'

---

* গ্রীক বনদেবতা। অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক ছাগলের মতো চেহারা।

মানুষটা মেয়েটির হাতে বাদামি রঙের ছোট্ট বাক্সটা তুলে দেয়। আসলে ওটা বধিরদের জন্যে একটা মার্কিনি শ্রুতি-যন্ত্র। আগের মতোই ঋজু ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলে মেয়েটি। মানুষটা ওভারকোটের পকেটে নিজের হাত দুটো গুঁজে দিয়ে কুঁজো হয়ে ওর পাশাপাশি হেঁটে চলে। মনে হয়, নিজের পা দুটোকে সে কিছুতেই দৃঢ় আর বলিষ্ঠ করে তুলবে না। ওদের সামনেই রাস্তাটা বাঁক নিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। নিষ্কলঙ্ক তুষারের প্রলেপে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে রাস্তাটা। একটা মোটর গাড়ি বরফ ভাঙতে ভাঙতে ওপরের দিকে উঠে আসে। গুটিকয়েক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে ঢাকা ঘরের কোণে ফিরে যাচ্ছে, ঠিক যেন সমুদ্র গর্ভে সাদা বালির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের খাঁজে ঢুকে পড়ছে মাছের দল। ওদের বাঁদিকে গাছের সারি, অন্ধকারের ভেতরে গাছগুলো সারি বেঁধে উঠে গেছে ওপরের দিকে।

সুগঠিত চিবুক আর বাঁকানো নাকটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে যেন কি শোনার জন্যে চারদিকে তাকাচ্ছিলো মানুষটা। হিথের দিকে উঠে যাওয়া মোটর গাড়িটার আওয়াজ তখনও শুনতে পাচ্ছিলো সে। নিচে ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা হ্যাম্পস্টেড পাতাল-রেল স্টেশনের হলদে আলোর দীপ্তি। ডান দিকে গাছের সারি।

মেয়েটি গোলাপি-গৌর মুখে তীক্ষ্ণ প্রশ্নালু ভঙ্গিমা তুলে মানুষটার দিকে তাকায়। ওর মধ্যে কুমারী-সুলভ এক বিচিত্র অনুসন্ধিৎসা রয়েছে—যা কখনও পাখির মতো, কখনও কাঠবেড়ালির মতো আবার কখনও বা খরগোশের মতো : কিন্তু আদপেই মেয়েদের মতো নয়। শেষ অব্দি মানুষটা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন আর এক পা-ও এগুবে না। তার ফ্যাকাসে-হলদে মুখে একটা বিচিত্র হাসির অস্ফুট প্রয়াস।

'জেমস,' মেয়েটির কানের কাছে ঝুঁকে মানুষটা চড়া গলায় বলে, 'শুনতে পাচ্ছো, কে যেন হাসছে ?'

'হাসছে ?' মেয়েটি তৎক্ষণাৎ মুখর হয়ে ওঠে, 'কে হাসছে ?'

'জানি না। কেউ একজন।' বিশ্রীভাবে দাঁত বের করে চিৎকার করে ওঠে মানুষটা

'ন্যাঃ, আমি কারুর হাসি শুনতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু এ যে একেবারে অস্বাভাবিক !' মানুষটার কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় ওঠা নামা করে। 'তুমি তোমার যন্ত্রটা পরে নাও।'

'যন্ত্রটা পরবো ? কেন ?'

'ছাখো, যদি শুনতে পাও।'

'কি শুনবো ?'

'হাসিটা! কে যেন হাসছে। একেবারে অদ্ভুত কাণ্ড।'

উপহাসের ভঙ্গিমায় মুখ টিপে হেসে মানুষটার হাতে যন্ত্রটা তুলে দেয় মেয়েটি। মানুষটা যন্ত্রটাকে ধরে থাকে, মেয়েটি, ডালা খুলে তারগুলো জুড়ে নেয়। তারপর একজন বেতার চালকের মতো সংযোজক বন্ধনিটা মাথায় গলিয়ে, গ্রাহযন্ত্র দুটো দুই কানে লাগায় ও। হিম-অন্ধকারে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ঝরে পড়ে। যন্ত্রটার বোতাম টিপে দেয় মেয়েটি, কাচের নলের মধ্যে ছোটোছোটো হলদে আলোগুলো ঝিলমিলিয়ে জলে ওঠে। তার মানে, যন্ত্রটার সঙ্গে মেয়েটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে—এবারে ও শুনতে পাচ্ছে।

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো মানুষটা। আচমকা সে মুখ তুলে এক বিকট অপার্থিব হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসির দমকে বেরিয়ে পড়ে তার ফাঁকা-ফাঁকা বলিষ্ঠ দাঁতগুলো, ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে কালো ভ্রূদুটি। ছাগলের মতো বিচিত্র জুলজুলে চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

মেয়েটি যেন সামান্য আতংকিত হয়ে ওঠে।

'ওই তো! শুনতে পাওনি?'

'তোমার হাসিটা শুনেছি।' মেয়েটির কথার স্বর বুঝিয়ে দেয়, এটুকু জবাবই যথেষ্ট।

'কিন্তু সেটা কি তুমি শোনোনি?' ঠোঁট দুটো বিশ্রীভাবে ফাঁক করে ফের চিৎকার করে ওঠে মানুষটা।

'না!'

প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকায় মানুষটা, ফের মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে সে। মেয়েটি আগের মতোই সটান, হাতে ফারের টুপি। যন্ত্রের বন্ধনিতে আঁটা ওর সুন্দর চুলগুলোতে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারের অন্তরঙ্গতা। ঝলমলে চোখ আর বধির-পরীর মতো মুখখানা ওপরের দিকে তোলা—মিথ্যেই কিছু শোনার আগ্রহে উন্মুখ।

'ওই যে!' আচমকা মানুষটার মুখ উল্লাসে দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'তা-ও বলবে, তুমি শুনতে পাওনি!' চরম নারকীয় ভঙ্গিমায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। কিন্তু অন্য একটা শক্তি তার চাইতেও বেশি শক্তিমান। আচমকা এক বিচিত্র হাসিতে তার সমস্ত মুখটা মুচড়ে ওঠে, যেন ঝিকিয়ে ওঠে। তারপর

পশুর হাসির মতো একটা অস্বাভাবিক বিকৃত অট্টহাসি ফেটে বেরোয় মানুষটার ভেতর থেকে। মেয়েটির কানে অদ্ভুত শোনায় হাসিটা, ঠিক যেন ঘোড়ার ডাকের মতো চিঁহি' চিঁহি' আওয়াজ।

একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি ওদের দিকে এগিয়ে আসে—নিখুঁতভাবে গোঁফ-দাড়ি কামানো একটি অল্পবয়সী পুলিস।

'রেডিও নাকি?' অত্যন্ত সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করে সে।

'না, এটা আমার শোনার যন্ত্র। আমি শুনতে পাই না!' মিস জেমস স্পষ্ট ভাষায় দ্রুত জবাব দেয়। বৃথাই ও একজন ব্যারনের মেয়ে হয়নি।

গোল টুপি পরা মানুষটা মুখ তুলে তরুণ পুলিসটির সতেজ মুখের দিকে তাকায়। মানুষটার চোখে এক আশ্চর্য শুভ্র দীপ্তি।

'আচ্ছা, শুনুন!' স্পষ্ট ভাষায় সে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কারুর হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছেন?'

'হাসির শব্দ? আমি আপনার হাসি শুনতে পেয়েছি, স্যার।'

'না না, আমার হাসি নয়।' অধৈর্য হয়ে নিজের হাত ঝাঁকায় মানুষটা, ফের মুখটা তুলে ধরে ওপরের দিকে।' ওর মসৃণ মুখটাতে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম বিজয়রেখা। সরাসরি যাতে তরুণ-পুলিসটির দিকে তাকাতে না হয়, সেজন্যে সে যথেষ্ট সতর্ক। 'অমন অস্বাভাবিক হাসি আমি জীবনেও শুনিনি।'

পুলিসটি চিন্তিত দৃষ্টিতে মানুষটার দিকে তাকায়।

'না, না—সব ঠিক আছে,' মিস জেমস ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'উনি মাতাল নন। উনি এমন কিছু শুনতে পাচ্ছেন, যা আমরা পাচ্ছি না।'

'মাতাল!' গোল টুপি পরা মানুষটা যেন বিপুল বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে। 'আমি যদি স্রেফ মাতালই হতাম...' বলতে বলতে ফের সেই উদ্দাম জান্তব হাসিতে ফেটে পড়ে সে, অন্য দিকে ফেরানো মুখটাও যেন লালচে হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে।

মানুষটার হাসির শব্দে মেয়েটি এবং পুলিসটার রক্তে কি যেন জেগে ওঠে। পরস্পরের আরও কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায় দুজনে, একজনের জামার আস্তিন অন্য জনকে ছুঁয়ে থাকে। অবাক বিস্ময়ে উলটো দিকে দাঁড়ানো গোল টুপি পরা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা।

মানুষটা নিজের কালো ভ্রূজোড়া তুলে ওদের দিকে তাকায়, 'বলতে চাইছো, তোমরা কিছুই শোনোনি?'

'শুধু তোমার হাসিটা শুনেছি,' মিস জেমস জানায়।

'শুধু আপনার হাসি, স্যার!' পুলিসটা মেয়েটির কথার প্রতিধ্বনি তোলে।

'হাসিটা কেমন?' মিস জেমস জানতে চায়।

'হাসিটার বর্ণনা দিতে বলছো!' নিদারুণ ঘৃণায় তরুণ মুখর হয়ে ওঠে, 'ওটার আওয়াজ পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে অবিশ্বাস্য।'

মানুষটাকে সত্যিই যেন এক নতুন রহস্যে মোড়া বলে মনে হয়।

'কোত্থেকে আসছে হাসিটা?' প্রশ্ন করে মিস জেমস।

'মনে হচ্ছে, ওদিক থেকে,' অবজ্ঞার স্বরে জবাব দিয়ে রাস্তার ওধারে বেষ্টনীর ভেতরকার গাছ আর ঝোপঝাড়গুলোর দিকে দেখায় মানুষটা।

'বেশ তো, তাহলে চলো—গিয়ে দেখা যাক!' মেয়েটি বলে, 'আমি আমার যন্ত্রটা বইতে পারবো। তাহলে শোনাও যাবে।'

মানুষটা যেন বোঝাটা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তি পেয়েছে বলে মনে হয়। ফের পকেটে হাত গুঁজে রাস্তার ওধারে এগুতে থাকে সে। পুলিসটার সতেজ তরুণ মুখখানিতে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি থিরথির করে কাঁপে। মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্যে ওর একখানি বাহু সাবধানে চেপে ধরে সে। মেয়েটি তার বিশাল হাতে ভর রাখার জন্যে এতোটুকুও হেলে থাকে না—কিন্তু ওর ভালো লাগে, তাই অসন্তুষ্ট হয় না। সারাটা জীবন পুরুষমানুষের দৈহিক সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখার পর, কোনোদিনও কোনো পুরুষকে স্পর্শ করার অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও—এখন ও তরুণ পুলিসটির বিশাল হাতটাকে ওকে সাহায্য করতে দেয়, উতরাই ভেঙে নেকড়ের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে চলা অন্য মানুষটাকে অনুসরণ করতে থাকে ওরা। গাঢ় নীল উর্দির পুরু আবরণের ভেতর দিয়েও তরুণ পুলিসটার উপস্থিতি অনুভব করে ও—অনুভব করে তার তারুণ্য, তৎপরতা আর উজ্জ্বলতাকে।

গোল টুপি পরা মানুষটার কাছে উঠে গিয়ে ওরা দেখতে পায়, সে মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে লোহার বেষ্টনীটার কাছে কান পেতে রেখেছে। বেষ্টনীর ওধারে তুষারে মোড়া হলি গাছের ঘন ঝোপ আর নীরব সভঙ্গ প্রাচীন এল্‌ম্ গাছের অরণ্য।

পুলিস আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বধিরা-কুমারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঝোপঝাড়গুলোতে উঁকি মারে মেয়েটি। গোল টুপি পরা মানুষটা উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। আচমকা পৃথিবী কাঁপিয়ে একটা লরি পাহাড়তলির দিকে নেমে যায়।

'ওই যে!' লরির শব্দটা মিলিয়ে যাবার অনেক পরে চিৎকার করে ওঠে

মেয়েটি। ঝিলমিলিয়ে ওঠা চোখ দুটি মেলে পুলিসটার দিকে ফিরে তাকায় ও। ওর নরম মুখখানিতে চমকিত জীবনের আভা। তরুণ পুলিসটার বিভ্রান্ত আর বিমুগ্ধ চোখের দিকে সরাসরি চোখ মেলে তাকায় ও।

'দেখতে পাচ্ছেন না?' খানিকটা উদ্ধত স্বরে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

'কি, মিস?'

'আঙুল তুলে দেখাবো না। আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকে তাকান।'

ঝলমলে চোখ দুটির দৃষ্টি হলি গাছের অন্ধকার ঝোপগুলোর দিকে মেলে দেয় ও। মেয়েটি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে, কারণ ওর মুখে সূক্ষ্ম সুতৃপ্তির অস্ফুট হাসি। নিজের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার গর্বে টান করে মেলে রাখা মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি তোলে ও। ঝোপের দিকে তাকাবার বদলে পুলিসটা মেয়েটির দিকে তাকায়। ওর ছিপছিপে শরীরটার সমস্ত ভারসাম্যতায় বিজয়ের উদ্ভাসিত দীপ্তি।

'চিরদিনই জানতাম, আমি ওঁকে দেখবো,' বিজয়িনীর ভঙ্গিমায় নিজের মনেই বললো মেয়েটি।

'কাকে দেখলে তুমি?' গোল টুপি পরা মানুষটা চিৎকার করে জানতে চাইলো।

'তুমিও ছাখোনি?' কোমল, পরীর মতো মুখখানা উৎকণ্ঠাভরে মানুষটার দিকে ঘুরিয়ে ধরলো মেয়েটি। মানুষটাকে দেখাবার জন্যে ও একান্তই উদগ্রীব।

'না, আমি কিছুই দেখিনি। তুমি কি দেখেছো, জেমস?' গোল টুপি পরা মানুষটা সচিৎকারে ফের জানতে চায়।

'একটা মানুষ।'

'কোথায়?'

'ওই তো, হলি ঝোপগুলোর মাঝখানে।'

'এখনও আছে?'

'না। চলে গেছে।'

'কি ধরনের মানুষ সে?'

'জানি না।'

'দেখতে কেমন?'

'তা-ও বলতে পারবো না।'

সেই মুহূর্তে গোল টুপি পরা মানুষটা আচমকা উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, অরণ্যবীথির দিকে আঙুল তুলে বলে, 'সে নিশ্চয়ই ওখানে রয়েছে। তুমি তার

হাসি শুনতে পাচ্ছো না? নিশ্চয়ই ওই গাছগুলোর পেছনে রয়েছে সে।'

মানুষটার কণ্ঠস্বর ফের এক বিচিত্র উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তুষারের ওপরে দাঁড়িয়ে পা দাপায় মানুষটা, মাথা ঝুলিয়ে নাচতে থাকে নিজের হাসির তালে তালে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সারি বাঁধা প্রাচীন গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলা পথটা ধরে দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে ওপরের দিকে উঠে যায়।

ঝরে পড়া তুষারে শুভ্র হয়ে থাকা বাগান-পথটার শেষপ্রান্তে একটা দরজা আচমকা খুলে যেতেই নিজের গতি শ্লথ করে দেয় মানুষটা। দরজার ওধারে লম্বা ঝালর লাগানো শাল গায়ে জড়িয়ে একটি মহিলা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরের দিকে উঁকি মেরে তাকালো ও। তারপর এগিয়ে এলো বাগানের নিচু ফটকটার কাছে। তখনও গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ঝরে পড়ছে। মহিলাব মাথায় কালো চুল আর একটা লম্বা কালো চিরুনী।

'আপনি কি আমার দরজায় টোকা দিয়েছিলেন?' গোল টুপি পরা মানুষটাকে প্রশ্ন করলো মহিলা।

'আমি? না!'

'কেউ আমার দরজায় টোকা দিয়েছিলো।'

'দিয়েছিলো নাকি? আপনি ঠিক বলছেন? কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়! তুষারে কোনো পায়ের ছাপ নেই।'

নেই! কিন্তু কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে কি যেন বললো!'

'এ তো ভারি অদ্ভুত কথা!' গোল টুপি পরা মানুষটা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কাউকে আশা করছিলেন?'

'না, কাউকে ঠিক আশা করিনি। তবে জানেনই তো, মানুষ সর্বদাই কাউকে না কাউকে আশা করে।'

শুভ্র তুষারের অস্পষ্ট আভায় গোল টুপি পরা মানুষটা দেখতে পেলো, দুটি কালো আয়ত চোখ মেলে মহিলা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কেউ হাসছিলো কি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, কেউ ঠিক হাসেনি। কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা দিলো আর আমিও দরজাটা খোলার জন্যে ছুটে এলাম। সবাই যেমনটি আশা করে, আমিও ঠিক তেমনি আশা করেছিলাম যে, মানে বুঝতেই পারছেন...'

'কি?'

'মানে, ভেবেছিলাম যে একটা চমৎকার কিছু ঘটবে।'

নিচু ফটকটার একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলো মানুষটা। দরজার বিপরীত

দিকে মহিলা। ওর চুলগুলো কালো। অর্থময় ছুটি কালো চোখ তুলে মানুষটার দিকে তাকাবার সময় ওর মুখখানা যেন বিষণ্ণ বলে মনে হলো।

'আপনি কি চাইছিলেন, কেউ আসুক?'

'ভীষণভাবে চাইছিলাম,' ইহুদীদের মতো রিনরিন করে বেজে ওঠা কণ্ঠস্বরে জবাব দিলো মহিলা। ও নিশ্চয়ই ইহুদী।

'তা সে যে-কেউই হোক না কেন?' মানুষটা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

'পছন্দমতো মানুষ হলেই হলো।' নিচু গলায় অর্থপূর্ণ আর নকল-লাজুক স্বরে জবাব দিলো মহিলা।

'সত্যি নাকি! তাহলে না জেনে হয়তো আমিই ধাক্কা দিয়েছিলাম।'

'আমারও তাই ধারণা। নিশ্চয়ই তাই।'

'ভেতরে আসবো?' ছোট্ট দরজাটাতে হাত রাখলো মানুষটা।

'সেটাই ভালো হবে, তাই নয় কি?'

মানুষটা যখন নিচু হয়ে দরজার ছিটকিনি খুলছে, কালো শাল জড়ানো মহিলাটি তখন কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয়। তারপর উঁচু-গোড়ালির জুতো পরা অবস্থায় তুষারের বুকে এলোমেলো পা ফেলে দ্রুত বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। শিকারী কুকুরের মতো মানুষটাও দ্রুত অনুসরণ করে ওকে।

ইতিমধ্যে বধির মেয়েটি আর পুলিসটাও ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে। গোল টুপি পরা মানুষটাকে বাগানের পথ ধরে কালো শাল জড়ানো মহিলার পেছন পেছন যেতে দেখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটি।

'ও কি ভেতরে যাচ্ছে?' চকিতে প্রশ্ন করে ও।

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে নয় কি?'

'ও কি মহিলাকে চেনে?'

'বলতে পারছি না। তবে শীগগিরি চিনবেন,' পুলিসটা জবাব দেয়।

'কিন্তু মহিলাটি কে?'

'বলতে পারছি না।'

বিভ্রান্ত ছায়ামূর্তি দুটো আলোকিত দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়।

'চলে গেলো!' বাইরের তুষারে দাঁড়িয়ে বললো মেয়েটি। ত্রস্ত হাতে মাথা থেকে গ্রাহযন্ত্রের বন্ধনীটা খুলে ফেললো ও। যন্ত্রের বোতামটা টিপে দিতেই গোপন আলোর নলটা উধাও হয়ে গেলো পলকে। চামড়ার ছোট্ট বাক্সের মধ্যে

যন্ত্রটা গুছিয়ে রেখে, মাথায় ফারের নরম টুপিটা চাপিয়ে, ফের তৈরি হয়ে দাঁড়ালো ও। মুখ থেকে উদ্বেগ আর বিমূঢ়তার ভাবটা কেটে যাওয়ায় সামরিক বাহিনীর মতো লম্বা গাঢ়-নীল কোটটাতে এখন ওকে আগের চাইতেও বেশি সপ্রতিভ বলে মনে হয়। মনে হয়,ও যেন হাত-পাগুলোকে ছড়িয়ে শরীরের জড়তা ছাড়িয়ে নিচ্ছে। ওর নরম পুরুষ্টু গাল দুটি থেকে নিষ্ক্রিয়তার চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। অহমিকা আর নতুন এক ভয়ংকর নিশ্চয়তার দীপ্তিতে ওর গাল দুটো এখন সতেজ।

লম্বা তরুণ পুলিসটার দিকে চকিতে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো মেয়েটি। হেলমেটের নিচে নিখুঁত কামানো সতেজ গালে মৃদু হাসির স্পর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসটা, ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি লক্ষ্য করলো, মানুষটা অল্পবয়সী, দেখতেও বেশ—এ ধরনের মানুষরা শুধু অপেক্ষায় থাকে।

'আমার মনে হয় অপেক্ষা করার কোনো অর্থ হয় না,' বললো ও।

'ওঁর জন্যে আপনার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাই নয় কি?' পুলিসটা জিজ্ঞেস করলো।

'একটুও না। ও যেখানে আছে, সেখানেই বরঞ্চ বেশি ভালো আছে।' অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ছোট্ট করে হাসলো মেয়েটি। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে, ছোট্ট স্যুটকেসটা নিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। নিজের পা দুটোকে ভীষণ হালকা বলে মনে হচ্ছিলো ওর। মনে হচ্ছিলো পা দুটো যেন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ। ঘাড় ঘুরিয়ে ফের পেছন দিকে তাকালো ও। তরুণ পুলিসটা ওকে অনুসরণ করছে। নিজের মনেই হাসলো মেয়েটি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে এতো নমনীয় আর শক্তিমান বলে মনে হচ্ছে যে ও ইচ্ছে করলে সহজেই ওই পুলিসটার চাইতে বেশি জোরে ছুটতে পারে। ইচ্ছে করলে শুধু নিজের হাত দুটো দিয়েই মানুষটাকে ও খুন করে ফেলতে পারে।

কথাটা আচমকাই মনে হলো মেয়েটির। কিন্তু মানুষটাকে ও খুন করবে কেন? বেশ তো সুন্দর অল্পবয়সী মানুষটা। ওর চোখের সামনে হলি গাছের ঝোপগুলোর মধ্যে একটা বিষণ্ণ মুখ, বিদ্রূপে ঝকঝক করছে তার চোখ দুটো। মেয়েটির মনে হলো ওর বুকভরা শক্তি, পা দুটো লম্বা বলিষ্ঠ আর উদ্দাম। নিজের বুকের গভীরে বলিষ্ঠ স্পন্দনের অনুভূতিতে নিজেই অবাক হয়ে ওঠে ও—জয় আর গোলাপি-ক্রোধের এ এক বিচিত্র অনুভূতি। মণিবন্ধের ওপরে হাত দুটো যেন উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। অথচ ও চিরদিনই বলে এসেছে, ওর শরীরে মাংসপেশী বলে কোনো পদার্থই নেই। এমন কি এখনও, এটা পেশী

নয়— এক ধরনের অগ্নিশিখা।

আচমকা প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হয়, সেই সঙ্গে হিমেল বাতাসের হিংস্র দাপট। গুঁড়ো গুঁড়ো জমাট তুষার তীক্ষ্ণ হয়ে মেয়েটির মুখে এসে বেঁধে। ওর চারদিকে যেন তুষারের ঘূর্ণি, যেন ও নিজেই একখণ্ড মেঘের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু তাতে ওর কিছুই এসে যায় না। ঘূর্ণির মধ্যেও ওর শরীরের মাঝে এক আশ্চর্য শিখার অস্তিত্ব, ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন শিখায় শিখাময় আর শক্তিময়। আর হিমেল ঘূর্ণি বাতাসটা যেন কাদের উপস্থিতিতে ভরা। বাতাসে বাতাসে অসংখ্য অশ্রুত কণ্ঠস্বর। যে শব্দ ও শুনতে পায় না, তা ও অনুভব করতে পারে। এখন সেই অনুভূতিটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ও বুঝতে পারে, দামাল বাতাসে কিছু একটা ঘটছে।

লণ্ডনের বাতাস এখন আর ভারি, স্যাঁতসেঁতে বা অনিচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া মানুষের ভূত-প্রেতে সংপৃক্ত নয়। মেরু অঞ্চল থেকে এখন এক নতুন ঝড় বয়ে আসছে এবং ঝোড়ো বাতাস শুধু শব্দে ভরা।

কণ্ঠস্বরগুলো ডাকছে। বধিরতা সত্ত্বেও মেয়েটি শুনতে পেলো কে যেন, কারা যেন কাকে ডাকছে, শিস দিচ্ছে। যেন অসংখ্য মানুষ বাতাসে বাতাসে চিৎকার করছে, 'ফিরে এসেছে। সে ফিরে এসেছে !'

তুষারের ঝড়ে কারা যেন উদ্দাম খুশিয়াল সুরে শিস দিয়ে ওঠে। তারপর বাতাসের তুষারে ঝিকিয়ে ওঠে বিদ্যুতের রোশনাই।

'এ কি বজ্র আর বিদ্যুৎ?' তরুণ পুলিসটা ঘূর্ণি-তুষারের আবরণ ভেদ করে কাছে আসতেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

'তাই তো মনে হলো,' জবাব দিলো পুলিসটা।

সেই মুহূর্তেই ফের বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে আর সেই অন্ধকার হাসিভরা মুখটাকে নিজের মুখের একেবারে কাছাকাছি দেখতে পায় মেয়েটি। মুখটা যেন প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছিলো মেয়েটির মুখখানা।

চমকে উঠে পেছনে সরে যায় মেয়েটি, কিন্তু খুশির শিখা ছড়িয়ে পড়ে ওর সমস্ত শরীরে।

'ওই তো!' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি দেখেছেন?'

'বিজলীর চমক,' পুলিসটা বললো।

প্রায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো মেয়েটি। কিন্তু মানুষটার জান্তব সতেজ ত্বক আর তার আতঙ্কিত চোখে পোষা-প্রাণীর মতো দৃষ্টি দেখে মজা পেলো ও। নিচু গলায় জয়ের হাসি হাসলো মেয়েটি। অপ্রাকৃত দৃশ্য

দেখে ভয় পাওয়া কুকুরের মতো স্পষ্টই ভয় পেয়েছে মানুষটা।

সহসা ঝড়টা আবার তীব্র স্বরে শিস দিয়ে ওঠে। মেয়েটির মনে হয় কণ্ঠস্বরগুলো যেন হাততালি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'সে এসেছে। সে ফিরে এসেছে!'

গম্ভীর ভঙ্গিমায় মাথা নাড়ে মেয়েটি। পুলিসটা আর ও পাশাপাশি এগিয়ে চলে। পাহাড়তলির একটা গলিতে আস্তর লাগানো ছোট্ট একটা বাড়িতে একা একাই বাস করে মেয়েটি। সেখানে একটা গির্জা এবং একটা তরুবীথিকার পরেই এক সারি ছোটোছোটো পুরনো বাড়ি। তুষারে ভারি হয়ে ওঠা বাতাস এখন হিংস্র হয়ে বইছে। মাঝে-মধ্যে অপার্থিবভাবে আলো ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে এক একটা ট্যাক্সি। কিন্তু তুষার আর ওই কণ্ঠস্বরগুলোর কথা বাদ দিলে গোটা পৃথিবীটাকেই যেন শূন্য আর বসতিহীন বলে মনে হয়।

তরুবীথিকাটা পেরিয়ে মোড় ঘুরে গির্জার কাছাকাছি আসতেই একটা নিদারুণ ঘূর্ণি বাতাসে ওরা দুজনে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ওরা শুনতে পেলো, সমুদ্র-সারসের মতো খুশিয়াল স্বরে কারা যেন চিৎকার করে বলছে: 'সে এসেছে। সে এসেছে!'

'সে ফিরে এসেছে বলে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি,' শান্ত গলায় বললো মেয়েটি।

'কি বললেন?' মেয়েটির কাছাকাছি উদ্বিগ্ন মনে এগিয়ে চলা বিচলিত পুলিসটা জিজ্ঞেস করলো।

বাতাসটা ওদের এগুতে দিচ্ছিলো না। বেষ্টনীটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের মনে হলো, গির্জাটার জানলা-দরজা সব কিছুই খোলা রয়েছে আর কণ্ঠস্বরগুলো দামাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গির্জাটার সর্বত্র।

'কি আশ্চর্য কাণ্ড, গির্জাটাকে ওরা খোলা রেখে গেছে!' মেয়েটি বললো।

পুলিসটা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো জবাব দিতে পারলো না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা বাতাসের শব্দ আর গির্জার ভেতরে অজস্র কণ্ঠস্বরের কলোরোল শুনতে লাগলো।

'এবারে আমি হাসিটা শুনতে পাচ্ছি,' আচমকা মেয়েটি বললো।

গির্জার ভেতর থেকে আসছিলো শব্দটা: নিচু গলায় অন্তহীন হাসি, একটা বিচিত্র উলঙ্গ আওয়াজ।

'এবারে শুনতে পাচ্ছি!' বললো ও।

কিন্তু পুলিসটা কোনো কথা বললো না। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে, যেন দু পায়ের মাঝখানে লেজটা নামিয়ে, গির্জার ওই অদ্ভুত শব্দটা—শুনছিলো সে।

বাতাসে নিশ্চয়ই একটা জানলা খুলে গিয়েছিলো—কারণ ওরা দেখতে পাচ্ছিলো, তুষার-কণাগুলো পাক খেতে খেতে ওই কালো গহ্বরটা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকছে, একটা অস্পষ্ট আলোর মতো পাক খাচ্ছে গির্জার ভেতরে। আচমকা কি যেন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো, তার পরেই এক নিদারুণ নগ্ন অট্টহাসি। তুষারগুলো গির্জাটার মধ্যে যেন একটা আশ্চর্য আলো গড়ে তুলেছে, যেন বড়োসড়ো লম্বা লম্বা প্রেতাত্মারা চলাফেরা করছে ভেতরে।

তারপর আরও হাসি, কি যেন ছিঁড়ে ফেলার আওয়াজ। তুষারের সঙ্গে অন্ধকার জানলাটা দিয়ে বাতাসের দমকে কাগজের টুকরো আর বইয়ের পাতাও ঘুরতে ঘুরতে বাইরে বেরিয়ে আসে। কি একটা সাদা জিনিস যেন একটা খেয়ালি পাখির মতো ডানায় ভর রেখে বাতাসে গা ভাসিয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। বাইরের একটা অন্ধকার মাথা গাছে আটকে গিয়ে, প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে জিনিসটা। আসলে ওটা বেদীর আচ্ছাদন।

তারপর ভেসে আসে এক টুকরো ঠুংঠাং মিঠে বাজনা। অর্গানের ভেতর দিয়ে দ্রুত বহে যাওয়া বাতাসে বেজে উঠছে অর্গানটা। টুকরো টুকরো উদ্দাম মিঠে বাজনা আর নিচু গলায় নগ্ন হাসি।

'সত্যি, এ একেবারে অস্বাভাবিক কাণ্ড!' মেয়েটি বললো, 'আপনি বাজনা আর হাসি শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কেউ অর্গানটা বাজাচ্ছে!' পুলিসটা বললো।

'আর উষ্ণ বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছেন? বাতাসে বসন্তের গন্ধ। আসলে ওটা কাগজি-বাদাম ফুলের সৌরভ। কি মিষ্টি গন্ধটা! ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, নয় কি?'

গির্জাটা পেরিয়ে মেয়েটি সারি বাঁধা ছোটেছোটো পুরনো বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। নিজের বাড়ির বেষ্টনী দেওয়া প্রবেশপথের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢোকে ও।

'এসে গেছি!' শেষ অব্দি মেয়েটি বললো, 'বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমার সঙ্গে আসার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তরুণ পুলিসটার দিকে তাকালো মেয়েটি। মানুষটার গোটা শরীরটা তুষার-জমা-দেয়ালের মতো সাদা। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখটা অসহায় আর আতংকিত বলে মনে হয়।

'নিজেকে একটু গরম করে নেবার জন্যে আমি ভেতরে যেতে পারি?' বিনত ভঙ্গিমায় জিজ্ঞেস করলো মানুষটা।

মেয়েটি জানে, ঠাণ্ডার চাইতেও মানুষটা আতংকে আরও বেশি জমে উঠেছে।

মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে মানুষটা।

'ইচ্ছে হলে নিচের বৈঠকখানায় বসতে পারেন।' মেয়েটি বললো, 'কিন্তু ওপরে আসবেন না যেন—বাড়িতে আমি একা। আপনি বৈঠকখানায় বসে আগুন পোহান, শরীরটা গরম হলে না হয় চলে যাবেন।'

আগুনের কাছে লম্বা নিচু সোফায় মানুষটাকে বসিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। আতংকে মানুষটার মুখ নীল আর বিহ্বল। নীল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে মেয়েটির চলে যাওয়া লক্ষ্য করলো। কিন্তু মেয়েটি ওপরের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিলো।

সকাল বেলায় ছবি-আঁকার ঘরে বসে নিজের আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনেই হাসছিলো মেয়েটি। ঝড়ের পরে ফুটে ওঠা রোদ্দুরে ওর ছোট্ট ক্যানারি পাখিগুলো কথা বলছিলো আর শিস দিচ্ছিলো কর্কশ স্বরে। বাইরের হিমেল তুষার এখনও অমলিন। এবং তারই শুভ্রতার ঝিলিকে রোদটা আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজের আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের কাণ্ডে নিজেই খিলখিল করে হাসলো মেয়েটি। হঠাৎ ছবিগুলোকে একেবারে অবাস্তব বলে মনে হলো ওর। এতো অদ্ভুত লাগছিলো ছবিগুলোকে যে ওগুলোকে দেখতে ওর দিব্যি মজাই লাগছিলো। বিশেষ করে ওর আত্ম-প্রতিকৃতিখানা—সুন্দর বাদামি চুল, সামান্য হাঁ করে রাখা খরগোশের মতো মুখ, আর খরগোশের মতোই অনিশ্চিত দুটো চোখ। নিজের আঁকা মুখটার দিকে তাকিয়ে এক দীর্ঘ খিলখিলে হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো মেয়েটি—ফ্যাকাসে ড্যাফোডিলগুলোর মতো হলদে-রঙা ক্যানারিগুলোও পাগল হয়ে উঠলো আরও চড়া সুরে গান গাইবার প্রচেষ্টায়। মেয়েটির সুদীর্ঘ খিলখিলে হাসি অপার্থিবভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সমস্ত বাড়িতে।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা, বিষণ্ণমুখী এক উন্নাসিক তরুণী—আসলে ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত মানুষই খানিকটা উন্নাসিক, কারণ উন্নাসিকতা একটা ইংরেজী অসুখ – খানিকটা বিরক্তির ভঙ্গিতে ব্যাপারটার খোঁজ নিতে এলেন।

'মিস জেমস, আপনি কি আমায় ডাকলেন?' সচিৎকারে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'না, না—ডাকিনি। কিন্তু আপনি চিৎকার করে কথা বলবেন না। আমি দিব্যি শুনতে পাচ্ছি।'

তত্ত্বাবধায়িকা ফের মিস জেমসের দিকে তাকালেন।

'একজন অল্প বয়সী ভদ্রলোক যে বৈঠকখানায় রয়েছেন, তা কি আপনি জানেন?'

'না তো!' মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো, 'তবে কি সেই অল্পবয়সী পুলিসটা? আমি তো তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঝড়ের সময় নিজেকে একটু গরম করে তোলার জন্যে সে এখানে এসেছিলো। তাহলে সে কি যায়নি?'

'না, মিস জেমস।'

'কি অদ্ভুত লোক। এখন কটা বাজে? পৌনে নটা। তা সে শরীর গরম করে চলে যায়নি কেন? তাহলে একবার গিয়ে লোকটার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত।'

'উনি বলছেন, উনি খোঁড়া.' তত্ত্বাবধায়িকা নিন্দে করার ভঙ্গিমায় উঁচু গলায় বললেন।

'খোঁড়া! কি অদ্ভুত কথা! গতকাল রাতে সে অবশ্যই খোঁড়া ছিলো না। ...কিন্তু আপনি চ্যাঁচাবেন না। আমি বেশ ভালোভাবেই শুনতে পাচ্ছি।'

'মিঃ মার্চব্যাংকস কি সকালের জলখাবার খেতে আসছেন?' তত্ত্বাবধায়িকার কণ্ঠস্বরে আরও, আরও বেশি অবজ্ঞার সুর ফুটে ওঠে।

'তা আমি বলতে পারছি নে। তবে আমার খাবারটা দেওয়া হলেই আমি নিচে চলে আসবো। অবিশ্যি পুলিসটার সঙ্গে দেখা করতে আমাকে তো এখুনি নিচে নামতে হবে। অদ্ভুত কাণ্ড, লোকটা এখনও এখানে রয়েছে।'

একটু চিন্তা করে নেবার জন্যে জানলার পাশে রোদ্দুরে গিয়ে বসলো মেয়েটি। বাইরের তুষার আর রিক্ত, বেগনী-আভা-লাগা গাছগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলো ও। আচমকা পৃথিবীটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে: যেন চামড়া বা খোসাটা ভেঙে গেছে...যেন বয়স্ক, কুঁকড়ে ওঠা চামড়ার মতো লণ্ডনের হিমেল ছাঁচে গড়া আকাশটা ফেটে গুটিয়ে গেছে—বেরিয়ে পড়েছে একটা সম্পূর্ণ নতুন নীল আকাশ।

'ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত।' মেয়েটি নিজের মনে বললো, 'আমি অবশ্যই সেই মানুষটার মুখ দেখেছি। কি অপূর্ব সেই মুখ! আমি কোনোদিনও তা ভুলবো না। আর সেই হাসি! যে শেষ হাসে, তার হাসি সব চাইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। শেষ হাসিটা নিশ্চয়ই সে হাসবে। এই জন্যেই তাকে আমার ভালো লাগে, কারণ সে সবার শেষে হাসবে। নিশ্চয়ই সে সত্যিকারের অসাধারণ কেউ! সবার শেষে হাসতে কি ভালোই না লাগে! সে নিশ্চয়ই সবার শেষে হাসবে। কি আশ্চর্য তার অস্তিত্ব! ওকে আমি বরং অস্তিত্বই

বলবো, কারণ ও তো ঠিক মানুষ নয়।

'ও ফিরে আসায় কি ভালোই না হয়েছে। আর ফিরে এসেই ও গোটা দুনিয়াটাকে বদলে দিলো। জানি না মার্চব্যাংকসকেও ও বদলে দিয়েছে কি না। অবিশ্যি মার্চব্যাংকস কোনোদিনই তাকে দেখেনি, তবে তার গলা শুনেছে। তাতেই কি কাজ হবে না? কে জানে! কে জানে!'

মার্চব্যাংকসের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে মেয়েটি। মার্চব্যাংকস আর ও ভীষণ বন্ধু। প্রায় দু বছর ধরেই ওদের এমন বন্ধুত্ব। কিন্তু ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। আদপেই নয়। শুধু বন্ধু।

আর যাই হোক না কেন, ও আপাদমস্তক সেই মানুষটার প্রেমে ডুবে ছিলো। এখন ব্যাপারটা ওর কাছে ভীষণ হাস্যকর বলে মনে হয়। শত হলেও, জীবনটাই ছিলো বড্ড অযৌক্তিক আর হাস্যকর।

এখন ও বুঝতে পেরেছে, ওরা ছিলো এক অদ্ভুত যুগল। হাস্যকরভাবে মানুষটা জীবনকে, বিশেষ করে নিজের জীবনটাকে, ভীষণ গভীরভাবে নিয়েছিলো। আর মানুষটাকে তার নিজের কাছ থেকে বাঁচাবার জন্যে ও-ও ছিলো হাস্যকরভাবে বদ্ধপরিকর। মানুষটার নিজের কাছ থেকে মানুষটাকে বাঁচাবার স্থিরসংকল্প ছিলো ওর, আর তারই প্রচেষ্টায় উন্মাদের মতো মানুষটাকে ভালোবেসে ফেললো ও।

অবাস্তব! অসম্ভব! অযৌক্তিক! হলি গাছের ঝোপগুলোর মধ্যে মানুষটাকে হাসতে দেখার পর থেকে—কি অসাধারণ আর অপূর্ব সেই হাসি—নিজের হাস্যকর মনোবৃত্তিটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। একটা মানুষকে তার নিজের কাছ থেকে বাঁচাবার ব্যাপারটা সত্যিই কি প্রচণ্ড বোকামো! তা সে যাকেই হোক না কেন। কি নিদারুণ মূর্খতা! এর চাইতে কোনো মানুষকে তার নিজের ইচ্ছেমতো পথে নরকে যেতে দেওয়াটা অনেক বেশি মজাদার আর প্রাণময়। মুক্তির চাইতে নরকবাস অনেক বেশি মজার এবং অধিকাংশ পুরুষ মানুষের কাছেই নরকটা যাবার পক্ষে অনেক বেশি ভালো জায়গা।

এখন ও সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে, ও কোনোদিনও কাউকে ভালোবাসেনি—মার্চব্যাংকসের সঙ্গে শুধু প্রেমের ছল করেছে। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাই একটা অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও কোনোদিনও এই অপমানজনক ভুলটা করেনি।

প্রেমে পড়াটা যে সত্যিই হাস্যকর, কোনো পুরুষকে তাড়া করে ছুটে বেড়ানো বা কোনো পুরুষের তাড়া খেয়ে ছুটে চলাটা যে মর্যাদাহানিকর—তা

হলি ঝোপের ভেতর থেকে সেই মানুষটা ওকে একেবারে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

'প্রেম কি সত্যিই অতোটা অযৌক্তিক আর মর্যাদাহানিকর?' মেয়েটি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো।

'অবশ্যই!' হাসিভরা একটা ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি, কিন্তু কাউকেই দেখা গেলো না।

'মনে হচ্ছে ফের সেই মানুষটা!' মেয়েটি নিজের মনেই বলে চললো, 'এটা সত্যিই একটা লক্ষণীয় জিনিস। আমি কোনোদিনও কোনো পুরুষমানুষকে সত্যি সত্যি চাইনি এবং এটাকে আমি একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। এদিকে আমার বয়েসও তিরিশের ওপরে হয়ে গেলো। এটা কি আমার নিজেরই কোনো দোষ না গুণ, তা আমি বলতে পারবো না। প্রমাণ করতে না পারা অব্দি আমি নিজেও তা জানতে পারবো না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওই মানুষটা যদি অমনি করে হাসতে থাকে তাহলে আমার কিছু একটা হবে।'

ঘরের মধ্যে কাগজি-বাদাম ফুলের একটা আশ্চর্য নির্যাস অনুভব করলো মেয়েটি, দূরায়ত সেই হাসিটাও শুনতে পেলো আবার।

'কাল রাতে মার্চব্যাংকস যে কেন ওই ইহুদীদের মতো দেখতে মহিলাটির সঙ্গে গেলো, তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। মহিলার কাছে ওর চাইবার মতো কি থাকতে পারে? মহিলারই বা কি চাইবার থাকতে পারে ওর কাছে? ঘটনাটা এমনই আশ্চর্য যে মনে হয়, ওরা যেন আগে থেকেই কোনো একটা ব্যাপারে মনস্থির করে রেখেছিলো! জীবনটা সত্যিই কি অদ্ভুত বিভ্রান্তিময়। কি ভীষণ গোলমেলে।

'আচ্ছা, কেউ কোনোদিনও ওই মানুষটার মতো হাসে না কেন? মনে হয় মানুষটা কি অপূর্ব! কি প্রচণ্ড বিদ্রূপময়! কি অহংকার! আর কতোটা বাস্তব। শুধু বিদ্রূপময় হাসি আর বিস্ময়ে বিহ্বল করে তোলা দুটো চোখ— শুধু হাসে আর ফের উধাও হয়ে যায়। ওই মানুষটা একটা ইহুদীদের মতো দেখতে মহিলার পিছু নিয়েছে বলে আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিংবা অন্য যে কোনো মেয়েকেও তাড়া করছে বলে ভাবতে পারি না। ব্যাপারটাই যে ভীষণ বিশৃঙ্খল। কুকুরের মতো কোনো মেয়ের পিছু নিলে, আমার ওই পুলিসটাও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। কুকুর আমি অপছন্দ করি, সত্যিই অপছন্দ করি। অথচ পুরুষমানুষগুলোর যে কি ভীষণ কুকুরের মতো স্বভাব।'

কিন্তু গভীর চিন্তার মধ্যেও মেয়েটি ফের নিজের মনে নিচু গলায় হাসতে

শুরু করলো। মানুষটা কিভাবে এসে, ওমনি করে হেসে, পুরনো চামড়ার মতো আকাশটাকে ফাটিয়ে আবরণ গুটিয়ে দিলো। কি অদ্ভুত ওই মানুষটা। মানুষটা ওকে শুধু একটু স্পর্শ করলেও কি যে ভালো হতো। শুধু একটু স্পর্শ। মেয়েটির মনে হলো: মানুষটা ওকে স্পর্শ করলে পুরনো কঠিন চামড়ার ভেতর থেকে ও আবার নতুন করে ফুটে উঠবে।

অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো মেয়েটি। আচমকা বলে উঠলো, 'ওই তো, সে এখুনি আসছে।' আসলে ও মার্চব্যাংকসের কথা বললো, হাসিতে মুখর হয়ে ওঠা সেই লোকটার কথা নয়।

মার্চব্যাংকসের হাত দুটো এখনও ওভারকোটের পকেটে গোঁজা, গোল টুপিতে ঢাকা মাথাটা চোরের মতো হেঁট করা, পা দুটো যেন এখনও বিশ্রীভাবে টলছে। ওপরের দিকে একবারও না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে এলো সে। মানুষটা নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর বিক্ষোভ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা। কথাটা মনে হতেই হেসে ফেললো মেয়েটি।

ওপরের জানলাটা দিয়ে মানুষটাকে লক্ষ্য করতে করতে এক দীঘল হাসিতে ফেটে পড়লো মেয়েটি আর ক্যানারিগুলোও ফের উন্মাদ হয়ে উঠলো সেই সঙ্গে।

নিচের হলঘরে এসে ঢুকেছে মানুষটা। অধীর অনুনাদী কণ্ঠস্বরে ডেকে বললো, 'জেমস। তুমি কি নিচে আসছো?'

'না,' মেয়েটি বললো, 'তুমি ওপরে এসো।'

সিঁড়ির দুটো করে ধাপ একসঙ্গে পেরুতে লাগলো মানুষটা। যেন সিঁড়িটা বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে বলে তার পা দুটো ঈষৎ ক্ষেপে উঠেছে সিঁড়িটার ওপরে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে ব্যঙ্গভরা শূন্যদৃষ্টিতে তাকালো মানুষটা। ওর ধূসর চোখ দুটোতে এক বিচিত্র আলোর চঞ্চলতা। মেয়েটিও এক অদ্ভুত উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাকালো তার দিকে।

'তুমি সকালের জলখাবার খাবে না?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো। মানুষটা প্রতিদিন সকালে এসে ওর সঙ্গে জলখাবার খায়—এটাই তার রীতি।

'না,' মানুষটা উঁচু গলায় জবাব দিলো। 'আমি একটা চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'চেঁচিয়ো না,' মেয়েটি বললো, 'আমি তোমার কথা বেশ শুনতে পাচ্ছি।'

বিদ্রূপ আর বিদ্বেষের ছোঁয়া লাগা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো মানুষটা।

আগের মতোই উঁচু গলায় বললো, 'চিরদিনই শুনেছো বলে আমার বিশ্বাস।'

'তা সে যা-ই হোক না কেন, এখন শুনছি। কাজেই তোমাকে আর চ্যাচাতে হবে না।'

ফের এক আশ্চর্য অনুপ্রভ আলোর দীপ্তি নিয়ে মানুষটার ধূসর চোখ দুটো বিদ্বেষী ভঙ্গিমায় মেয়েটির মুখে স্থির হয়ে লেগে রইলো।

'আমার দিকে তাকিয়ো না,' মেয়েটি শান্ত গলায় বললো, আমি সব জানি।'

মানুষটা একরাশ বিদ্বেষী হাসি ছড়ালো, 'কে শেখালো তোমাকে? ওই পুলিসটা?'

'ওহো, ভালো কথা—সে নিশ্চয়ই নিচের তলায় রয়েছে। না, পুলিসটা ঘটনাচক্রের ব্যাপার। আর আমার ধারণা, শাল গায়ে জড়ানো ওই মেয়েমানুষটাও বোধহয় তাই। তা তুমি কি সারা রাতই ওখানে ছিলে নাকি?'

'পুরোটা নয়। ভোর হবার অনেক আগেই চলে এসেছি।'

মেয়েটি যেন নিচু স্বরের সেই দীঘল হাসিটা শুনছে বলে মনে হলো।

'কি হলো?' মানুষটা কৌতুহলী হয়ে উঠলো, 'তুমিই বা কি করছিলে?'

'ঠিক জানি না। কেন—তুমি কি আমার জবাবদিহি নেবে নাকি?'

'তুমি সেই হাসিটা শুনেছো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তা ছাড়া আরও অনেক কিছুই শুনেছি। দেখেওছি।'

'পত্রিকাটা দেখেছো?'

'না। কিন্তু তুমি চেঁচিয়ো না। আমি শুনতে পাই।'

'একটা দারুণ ঝড় উঠেছিলো। গির্জার জানলা-দরজা উড়িয়ে নিয়েছে, খুব ক্ষতি হয়েছে জায়গাটার।'

'আমি দেখেছি। গির্জা থেকে বাইবেলের একটা পৃষ্ঠা সোজা আমার মুখে উড়ে এসেছিলো।' নিচু গলায় হাসলো মেয়েটি।

'কিন্তু তুমি আর কি দেখেছো?'

'আমি 'তাঁকে' দেখেছি।'

'কাকে?'

'তা জানি না।'

'কিন্তু তাঁকে দেখতে কেমন?'

'তা-ও বলতে পারবো না। আমি সত্যিই তা জানি না।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো। তোমার পুলিসটাও কি তাকে দেখেছে?'

'না, সম্ভবত দেখেনি।...আমার পুলিস!' দীর্ঘ খিলখিলে হাসিতে মুখর

হয়ে ওঠে মেয়েটি। 'সে কোনো দিক দিয়েই আমার নয়। কিন্তু আমাকে নিচে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'ব্যাপারটা তোমাকে সত্যিই ভারি অদ্ভুত করে তুলেছে। তোমার আত্মা বলতে কিছু নেই।'

'সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে, 'কিন্তু আমি জানি, আমার পুলিসটার আত্মা আছে। আমার পুলিস!' ফের খিলখিল দীঘল হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটি। ক্যানারিগুলোও কর্কশ স্বরে গলা মেলায় ওর সঙ্গে।

'কি হলো তোমার?'

'আমার আত্মা নেই। সত্যি বলতে কি, কোনোদিনই ছিলো না। চিরদিনই সেটা নিয়ে আমাকে ঠকানো হয়েছে। তোমার আর আমার মধ্যে একমাত্র যে জিনিসটি ছিলো, তা হচ্ছে আত্মা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেটা এখন নেই। কিন্তু তুমিও কি তোমার আত্মাটাকে হারিয়ে ফেলোনি? যেটা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মতো তোমার অষ্টপ্রহরের দুশ্চিন্তা ছিলো?'

'কি সমস্ত বলছো তুমি?'

'জানি না। সমস্ত ব্যাপারটাই কি প্রচণ্ড অস্বাভাবিক! কিন্তু শোনো, আমাকে নিচে গিয়ে আমার পুলিসটার সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। সে নিচের বৈঠকখানা ঘরে রয়েছে। তুমি বরঞ্চ আমার সঙ্গে এসো।'

ওরা দুজনে একসঙ্গে নিচে নেমে আসে। জামার ওপরে শুধু ওয়েস্ট-কোট পরে থাকা পুলিসটা ভীষণ বিষণ্ণ মুখে সোফায় শুয়েছিলো। মিস জেমস তাকে বললো, 'এই যে, শুনুন। শুনলাম, আপনি নাকি খোঁড়া। কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি। হাঁটতে পারছি না, তাই এখানেই পড়ে রয়েছি।' সাদা চুলের তরুণ পুলিসটার দু'চোখে জল এসে যায়।

'কিন্তু কি করে এমন হলো? কাল রাতে তো আপনি খোঁড়া ছিলেন না!'

'জানি না, কি করে হলো ··কিন্তু ঘুম ভাঙার পরে দাঁড়াতে গিয়ে, পারলাম না।' পুলিসটার অসহায় গাল দুটোতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

'কি অদ্ভুত কাণ্ড! আমরা এখন কি করবো?'

'কোন্ পা?' মার্চব্যাংকস প্রশ্ন করে। 'আমাদের একটু দেখান তো!'

'আমার দেখাতে ইচ্ছে করছে না।' হতভাগ্য লোকটা বললো।

'আপনি বরং আমাদের দেখতে দিন,' বললো মিস জেমস।

লোকটা আস্তে আস্তে মোজা খুলে দেখালো, তার ফর্সা বাঁ-পাটা অদ্ভুতভাবে মুড়ে রয়েছে। ঠিক যেন কোনো জন্তুর রহস্যময় থাবা। নিজের বিকৃত পায়ের

দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো মানুষটা।

মানুষটার ফোঁপানির মধ্যেই ফের নিচু স্বরের সেই উল্লসিত হাসিটা শুনতে পেলো মেয়েটি। কিন্তু সেদিকে এতোটুকুও ভ্রূক্ষেপ না করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে কান্নাতুর তরুণ পুলিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

'যন্ত্রণা হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হাঁ'ার চেষ্টা করলে হয়।'

'শুনুন, আমরা তাহলে একজন ডাক্তারকে টেলিফোনে ডাকি। তিনি আপনাকে ট্যাক্সিতে করে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

তরুণ পুলিসটা লাজুক মুখে চোখ মুছলো।

'কিন্তু এটা কি ভাবে হলো, সে বিষয়ে আপনার কি কোনো ধারণাই নেই?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো ম্যর্চব্যাংকস।

'আমি কিছুই জানি নে!'

সেই মুহূর্তে ঠিক কানের কাছে সেই অন্তহীন হাসিটা শুনে মিস জেমস চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। পরমুহূর্তেই গুলি-বিদ্ধ জন্তুর মতো মার্চব্যাংকসের তীব্র আর্তনাদ শুনে, ফের চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো ও। মার্চব্যাংকসের ফ্যাকাসে মুখটা তখন এক চরম বিকৃতিতে কুঁচকে উঠেছে। তার চোখ দুটো কোনো কিছুর দিকে স্থির। সে বুঝতে পেরেছে এবারে সে নিজেকে এক চরম উপহাসের পাত্র করে তুলেছে—তার বিস্ফারিত চোখের বিক্ষুব্ধ চঞ্চলতায় তারই বীভৎস প্রকাশ।

'আমি জানতাম, এটা 'সে'!' উঁচু পর্দায় আর্তনাদ করে উঠলো মার্চব্যাংকস। তারপর কাঁপুনি জাগানো এক বিচিত্র হাসি হেসে গালচের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত ছটফট করলো মানুষটা, তারপর এক অপার্থিব বিকৃত ভঙ্গিমায় স্থির হয়ে পড়ে রইলো বজ্রাহত মানুষের মতো।

ধূসর দুটি চোখ মেলে মিস জেমস বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মানুষটার দিকে।

'ও কি মরে গেছে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো ও।

তরুণ পুলিসটা তখন এতো কাঁপছে যে প্রায় কথাই বলতে পারছে না। তার দাঁতে-দাঁত লেগে কাঁপুনির শব্দটা শুনতে পেলো মেয়েটি।

'দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে,' পুলিসটা আমতা আমতা করে জবাব দিলো। বাতাসে তখন কাগজি-বাদাম ফুলের মৃদু সৌরভ।

* The Last Laugh

ডাক্তার ব'লেছিলেন, 'ওকে দূরে কোনো রোদ্দুরের দেশে নিয়ে যান।'

ও নিজে সূর্য সম্পর্কে অবিশ্বাসী। তবু ও নিজের সন্তান, মা আর একজন নার্সের সঙ্গে সমুদ্র পেরিয়ে দূরদেশে যেতে রাজি হয়ে গেলো।

জাহাজ মাঝরাতে ছাড়লো। তার আগে দুটি ঘণ্টা স্বামী ওর সঙ্গেই ছিলো। বাচ্চাটাকে তখন শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, যাত্রীরা উঠতে শুরু করেছে জাহাজে। কালো অন্ধকার রাত্রি। গাঢ় অন্ধকার নিয়ে দুলছিলো হাডসন নদীর জল, তাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ছলকে পড়া কয়েকটি আলোর বিন্দু। জাহাজের বেষ্টনীতে শরীর এলিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ও ভাবছিলো: এই হচ্ছে সমুদ্র—মানুষ যেমনটি ভাবে সমুদ্র তার চাইতেও বেশি গভীর, অজস্র স্মৃতিতে ভরা। সেই মুহূর্তে সমুদ্রটা নড়েচড়ে উঠেছিলো ঠিক যেন চিরজীবী অনন্তনাগের মতো।

'জানো, এই বিদায় নেবার ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়।' স্বামী ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলো, 'একেবারে বিশ্রী ব্যাপার। আমার একটুও ভালো লাগে না।'

মানুষটার কণ্ঠস্বর আশংকা আর উদ্বেগে ভরা। সেই সঙ্গে যেন আশার শেষ কুটোটাকে আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টা।

'আমারও ভালো লাগে না,' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলো ও। ওর মনে পড়ছিলো, কি প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে ওরা একজন আর একজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলো। বিদায়ের আবেগ ওর মনটাকে একটু নাড়া দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে ওর হৃদয়ের কাঠিন্যটুকুই আরও গভীরে পৌঁছে গেছে।

তাই ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। বাবার চোখ দুটো জলে ভিজে উঠলো। কিন্তু চোখ সজল হওয়ায় কিছু এসে-যায় না। যাতে এসে-যায় তা হলো সারা বছর, সমস্ত জীবন ধরে অভ্যাসের কঠোর ছন্দ—সত্তার গভীরে জেগে থাকা শক্তির প্রকাশ। ওদের দুজনের জীবনে শক্তির এই প্রকাশ পরস্পরের বিরোধীপক্ষ। পরস্পরের বিপরীত দিকে ছুটে আসা দুটো এঞ্জিনের মতো ওরা একে অন্যকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে।

'পারে নামুন! পারে নামুন আপনারা।' হুকুম শোনা যায়।

'মরিস, তুমি এবারে যাও।' স্বামীকে কথাটা বলে মেয়েটি মনে মনে ভাবে: ওর এখন পারে নামার পালা। আর আমার পালা সমুদ্রে ভাসার।

জাহাজটা যখন কূল থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন মাঝরাত্রির বিষণ্ণতায় ফেরিঘাট থেকে রুমাল ওড়ালো মানুষটা। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে একজন। ভিড় করা মানুষের একজন।

আলোর সারিতে সাজানো বড়ো বড়ো থালার মতো ফেরি-নৌকোগুলো তখনও হাডসন পারাপার করছে। ওই কালো গহ্বরটা নিশ্চয়ই লাকাওয়ানা স্টেশন। জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে, হাডসনটা যেন আর শেষ হয় না। অবশেষে ওরা বাঁকটা ঘুরলো। এখান থেকে দেখা যায়, গোলন্দাজ বাহিনীর কেন্দ্রে আলোর অপ্রতুলতা। স্বাধীনতার মূর্তিটা বদমেজাজের ঘোরে মশালটা ধরে রেখেছে। সমুদ্রে ঢেউ জেগেছে এতোক্ষণে।

অতলান্তিকের রূপ ছিলো লাভার মতো ধূসর, তবু শেষ পর্যন্ত রোদ্দুরের দেশে পৌঁছে গেলো ও। এমন কি সুনীল সমুদ্রের ধারে বাড়িও পেয়ে গেলো একটা। বাড়িতে মস্তো বাগান, কিংবা দ্রাক্ষাকুঞ্জ। অজস্র আঙুরলতা আর জলপাইবীথি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্র-সৈকতের সঙ্কীর্ণ ভূ-ভাগ অব্দি বাগানটা অসংখ্য গোপন জায়গায় ভরা। মাটির গহ্বরে অনেক নিচে লেবু গাছের ঘন কুঞ্জবন। লুকিয়ে থাকা একটা অকৃত্রিম সবুজ জলের কুণ্ড। ছোট্ট একটা গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ঝরণা -গ্রীকরা আসার আগে আদিম সিকিউলরা হয়তো এখানে জলপান করতো। শূন্যগর্ভ একটা প্রাচীন কবরে ধূসর রঙের একটা ছাগল ডাকছে। বাতাসে মিমোসার সৌরভ আর দূরে আগ্নেয়-গিরির তুষার চূড়া।

এসব কিছুই দেখলো মেয়েটি। একদিক দিয়ে এসব মনটাকে স্নিগ্ধ করে তোলে। কিন্তু এ সব কিছুই বাইরের, এসবে ওর সত্যিকারের কোনো আকর্ষণ নেই। ওর ভেতরকার রাগ আর হতাশা, বাস্তবের কোনো কিছুকে অনুভব করার অক্ষমতা সব কিছু নিয়ে ও ঠিক সেই আগেকার মতোই রয়ে গেছে। বাচ্চাটাও ওকে বিরক্ত করে তোলে, ওর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়। ছেলের সম্পর্কে ও নিজেকে ভয়ংকর দায়ী বলে মনে করে—যেন ছেলের প্রতিটা নিঃশ্বাসের জন্যেই ওকে দায়ী থাকতে হবে। এবং এটাই ওর কাছে যন্ত্রণাদায়ক, ওর ছেলে এবং ওদের সঙ্গে জড়িত অন্য সকলের পক্ষেও তাই।

'আচ্ছা জুলিয়েট, ডাক্তারবাবু তোকে জামা-কাপড় না পরে রোদ্দুরে শুয়ে থাকতে বলেছেন। তুই তা করিস না কেন?' ওর মা জিজ্ঞেস করলেন।

'তা করার মতো সুস্থ হলেই করবো। তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো ও।

'না না। মারতে চাইবো কেন, বাছা। আমরা শুধু তোর ভালোই করতে চাই।'

'দোহাই তোমাদের, আর আমার ভালো করতে চেয়ো না।'

মা শেষ অব্দি রাগে-দুঃখে চলেই গেলেন।

সমুদ্র সাদা হয়ে উঠলো, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে উধাও। ঝরতে লাগলো দুরন্ত বৃষ্টি। রোদ্দুর পাবার জন্যে তৈরি করা বাড়িটা এখন ঠাণ্ডায় হিম।

তারপর ফের একদিন সকালে নগ্ন, গলিত, দীপ্ত সূর্যটা সমুদ্রের প্রান্তসীমায় নিজেকে উঁচু করে তুলে ধরলো। জুলিয়েটের বাড়িটা দক্ষিণ-পুব মুখো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও এই সূর্যোদয় দেখলো। মনে হচ্ছিলো, ও যেন আগে কোনোদিনও সূর্যোদয় দেখেনি। সমুদ্র-রেখার ওপরে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ সূর্য নিজের শরীর থেকে রাত্রিকে ঝেড়ে ফেলছে, এ দৃশ্য এতোদিন ওর অদেখা ছিলো।

তাই ওর গোপন-মনে নগ্ন দেহে সূর্যস্নানের বাসনা জেগে উঠলো। একটা গোপন রহস্যের মতো বাসনাটাকে ও সস্নেহে লুকিয়ে রাখলো মনের গভীরে। সূর্যস্নানের জন্যে ও বাড়ি ছেড়ে, মানুষের দৃষ্টির নাগাল এড়িয়ে, দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। কিন্তু যে দেশে প্রতিটা জলপাই গাছের চোখ আছে, যেখানকার প্রতটা ঢালই দূর থেকে চোখে পড়ে, সেখানে লুকোতে যাওয়াটা সহজ কাজ নয়। তবু একটা জায়গা খুঁজে পেলো ও—বড়ো বড়ো ফণীমনসা জাতের কাঁটাঝোপে ঘেরা একটা পাহাড়ি খাঁজ। সমুদ্র আর সূর্যের দিকে ঝুলে রয়েছে খাঁজটা। কাঁটাগাছের এই পাঁশুটে-নীল ঝোপের ভেতর থেকে বিবর্ণ গুঁড়ির একটা সাইপ্রেস গাছ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে নীল আকাশে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক যেন একজনের অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে নজর রাখছে গাছটা। অথবা যেন একটা রুপোলি মোমবাতি, যার বিশাল শিখায় আলোর বদলে রয়েছে অন্ধকার—যেন পৃথিবী তার বিষাদের গর্বিত বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে।

সাইপ্রেস গাছটার তলায় বসে জুলিয়েট ওর পোশাক খুলে ফেললো। ওর চারদিকে কাঁটা গাছের এক ভয়ংকর অথচ মনোরম অরণ্য। সেখানে বসে ও সূর্যের কাছে নিজের অন্তরকে উৎসর্গ করলো। তবু বাধ্য হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করার নিষ্ঠুরতায় এক নিদারুণ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও।

নীল আকাশের পথে এগিয়ে যেতে যেতে সূর্য নিজের কিরণ ছড়িয়ে গেলো নিচের পৃথিবীতে। ওর স্তন দুটি, যা কোনোদিনও পরিপক্ক হয়ে উঠবে না বলে

মনে হয়েছিলো, তাতে সমুদ্রের কোমল বাতাস অনুভব করলো জুলিয়েট। অথচ সূর্যের স্পর্শ যেন অনুভবই করলো না। ওর স্তন দুটি যেন পূর্ণ বিকাশের আগেই শুকিয়ে যাওয়া কোনো ফল।

কিন্তু শীগগিরি নিজের গভীরে সূর্যকে অনুভব করলো ও -প্রেমের চাইতে তপ্ত, বুকের দুধ বা ওর সন্তানের হাতের স্পর্শের চাইতেও বেশি উষ্ণ সে অনুভূতি। অবশেষে, অবশেষে উত্তপ্ত রোদে ফলে থাকা দীর্ঘ শুভ্র আঙুরের মতো হয়ে উঠলো ওর স্তন দুটি।

সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নগ্ন শরীরে সূর্যের আলোয় শুয়ে থাকে জুলিয়েট। শুয়ে শুয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকায় মাঝ-আকাশের সূর্যটার দিকে— যেন নীল রঙে স্পন্দিত একটা গোলক, প্রান্তভাগগুলো ধোঁয়াটে উজ্জ্বল। সূর্য… অপরূপ নীলে স্পন্দিত, প্রাণময়, প্রান্তসীমা থেকে শুভ্র আগুন ছড়িয়ে যাওয়া সূর্য। মুখ নিচু করে সূর্য নীল-আগুনের মতো দৃষ্টিতে জুলিয়েটের দিকে তাকায়— জড়িয়ে ধরে ওর স্তন, ওর মুখ, ওর গলা—ওর ক্লান্ত উদর, ওর হাঁটু, ওর উরু আর পা দুটিকে।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে জুলিয়েট। তবু চোখের পাতার ভেতর দিয়ে সূর্যের গোলাপি শিখা ওর চোখ দুটিকে ভরিয়ে তোলে। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি। গাছের কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে, চোখের ওপরে চাপা দিয়ে রাখে ও। তারপর শুয়ে পড়ে আবার—ঠিক যেন রোদ্দুরে রাখা একটা লম্বা সাদা লাউয়ের মতো, সূর্যের তাপে যাকে অবশ্যই সোনার মতো পরিপক্ক হয়ে উঠতে হবে।

জুলিয়েট অনুভব করে, সূর্যের আলো ওর দেহের অস্থি পর্যন্ত ঢুকে গেছে। না, ঢুকে পড়েছে আরও গভীরে—ওর আবেগ, ওর চিন্তার ভেতরেও। ওর আবেগের ঘন উদ্বেগ এখন শিথিল হতে শুরু করেছে, গলতে শুরু করেছে রক্তের মতো জমাট বাঁধা ওর চিন্তার হিমপিণ্ডগুলো। প্রাণের গভীরে উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করেছে জুলিয়েট। সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শোয় ও—সূর্যের তাপে গলে যেতে দেয় ওর কাঁধ, কোমর, উরুর পেছন দিক, এমন কি গোড়ালিও। বিস্ময়ে আধো বিহ্বল হয়ে শুয়ে শুয়ে ও ভাবে, এ কি হলো! ওর ক্লান্ত হিমতুহিন হৃদয়টা যে গলে যাচ্ছে, গলে-গলে মিলিয়ে যাচ্ছে বাষ্প হয়ে।

পোশাক-আশাক পরে ফের একবার শুয়ে পড়ে জুলিয়েট। সাইপ্রেস গাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে ছাখে, গাছটার নমনীয় চূড়া বাতাসে এধার থেকে ওধারে হেলে পড়ছে। ইতিমধ্যে মহান সূর্যের আকাশ-পরিক্রমা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠেছে ও।

সূর্যের আলোয় প্রায় অন্ধ আর বিহ্বল হয়ে বাড়ি ফিরলো জুলিয়েট। এই অন্ধতা ওর কাছে যেন এক পরম ঐশ্বর্য। আর এই অস্পষ্ট, উষ্ণ, গাঢ় অর্ধ-সচেতনতা যেন এক দুর্লভ সম্পদ।

'মামন। মামন!' বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো ওর দিকে। ছেলেটার পাখির মতো আশ্চর্য গলায় চাহিদার এক নিবিড় আর্তি। সব সময়েই ওকে চায় বাচ্চাটা। কিন্তু এই প্রথম ওর ডাকে সাড়া দেবার জন্যে কোনো সাগ্রহ ব্যাকুলতা অনুভব করলো না দেখে অবাক হলো জুলিয়েট। বাচ্চাটাকে দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরলো ও, কিন্তু মনে মনে ভাবলো : ও এমন একটা মাংসপিণ্ড হয়ে থাকবে না। রোদ্দুর পেলেই ও সজীব হয়ে বেড়ে উঠবে।

বাচ্চাটা ছোটোছোটো হাত দুটি দিয়ে বিশেষ করে ওর গলাটা আঁকড়ে ধরছিলো বলে খানিকটা বিরক্ত হলো জুলিয়েট। নিজের গলাটা টেনে সরিয়ে নিলো ও। ও চাইছিলো না, কেউ ওকে স্পর্শ করুক। বাচ্চাটাকে আস্তে করে নিচে নামিয়ে দিয়ে ও বললো, 'যাও, রোদ্দুরে গিয়ে ছোটাছুটি করো!'

এবং তক্ষুনি ছেলের সমস্ত পোশাক ছাড়িয়ে, ওকে নগ্নশরীরে উষ্ণ চত্বরটায় ছেড়ে দিলো জুলিয়েট। বললো, 'রোদের মধ্যে খেলা করো।'

বাচ্চাটা ভয় পেয়ে কাঁদতে চাইছিলো। কিন্তু জুলিয়েট শরীরভরা তপ্ত অবসাদ আর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মন নিয়ে একটা কমলা লেবু গড়িয়ে দিলো লাল রঙা টালিগুলোর ওপর দিয়ে। বাচ্চাটা নিজের অপরিণত ছোট্ট শরীর নিয়ে টলোমলো পায়ে এগিয়ে গেলো লেবুটার দিকে। লেবুটার স্পর্শ অপরিচিত মনে হওয়ায়, সেটা হাতে তুলেই ফেলে দিলো বাচ্চাটা। তারপর নালিশের ভঙ্গিমায় ফিরে তাকালো মা-র দিকে, কান্নার প্রস্তাবনায় কুঁচকে উঠলো ওর মুখখানা। আসলে নিজের নগ্নতায় ও ভয় পাচ্ছিলো।

'লেবুটা আমাকে এনে দাও,' বাচ্চাটার ভয় পাওয়া সম্পর্কে নিজের এমন গভীর উদাসীনতায় অবাক হলো জুলিয়েট। 'মামনকে কমলা লেবুটা এনে দাও, সোনা!' মনে মনে ও বললো, 'বাচ্চাটা ওর বাবার মতো, যে পোকা কোনো-দিনও সূর্য দেখেনি তার মতো, বড়ো হয়ে উঠবে না।'

ছেলের চিন্তা জুলিয়েটের মনে একটা বোঝার মতো, ছেলের দায়িত্ব ওর কাছে যেন অত্যাচার। বাচ্চাটাকে নিজের শরীরে বয়েছে বলে ওর সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে যেন জুলিয়েটকেই জবাবদিহি দিতে হবে। এমন কি ওর নাক দিয়ে জল গড়ালেও জুলিয়েটের বিরূপ মনে যেন অঙ্কুশের খোঁচা লাগে—

নিজেকে নিজেরই যেন বলতে হয়, 'ছাখো, কি এক সন্তানের জন্ম দিয়েছো তুমি!'

কিন্তু এখন একটা পরিবর্তন এসেছে। বাচ্চাটার বিষয়ে এখন ও আর ততোটা আন্তরিক আগ্রহী নয়। ওর ওপর থেকে নিজের উদ্বেগ আর বাসনার বোঝা তুলে নিয়েছে জুলিয়েট। আর ছেলেটাও এতে আগের চাইতে বেশি সতেজ হয়ে উঠছে।

নিজের মনের গভীরে জুলিয়েট এখন সুদীপ্ত সূর্য আর তার সঙ্গে ওর মিলনের কথা ভাবে। ওর জীবন এখন একটা সম্পূর্ণ উপাচার। সমুদ্রের প্রান্তসীমার মেঘ আছে কি না জানার জন্যে ও প্রতিদিন ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করে, ধূসর আকাশটাতে ফিকে সোনালি রঙ লাগলো কিনা। গলিত সূর্যটা যখন নগ্ন হয়ে জেগে ওঠে, কোমল আকাশের বুকে ছুঁড়ে দেয় নীল শুভ্র আগুনের ঝলক --তখন জুলিয়েটের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

সূর্য কখনও বড়োসড়ো লাজুক প্রাণীর মতো আরক্তিম, কখনও বা ক্রোধে লাল। আবার কখনও সে মেঘের আড়ালে সরে যায়। জুলিয়েট তখন তাকে দেখতে পায় না, শুধু মেঘের আড়াল থেকে ঝরে পড়ে লাল আর সোনা রঙ।

জুলিয়েট ভাগ্যবতী। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়—কোনো কোনো দিন সকালটা মেঘলা আর বিকেলটা ধূসর হলেও, সূর্যহীন অবস্থায় ওর কোনো দিন যায় না। শীতের বেলা হওয়া সত্ত্বেও আজকাল অধিকাংশ দিনই রোদে ঝলমলে হয়ে থাকে। মাটির বুকে জেগে ওঠে হালকা বেগনি রঙের ছোটো-ছোটো ক্রোকাস ফুল, বুনো নার্সিসাসগুলো ঝুলে থাকে শীতের নক্ষত্রের মতো।

জুলিয়েট প্রতিদিন সেই হলদেটে পাহাড়ের ধারে কাঁটাঝোপের মধ্যে সেই সাইপ্রেস গাছটার কাছ অব্দি চলে যায়। এখন ও আগের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী আর কৌশলী হয়ে উঠেছে। তাই আজকাল ও শুধু একটা হালকা ধূসর রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে আর চটি পায়ে দিয়ে ওখানে চলে যায়, যাতে যে কোনো নির্জন নিরালায় মুহূর্তের মধ্যে ও সূর্যের কাছে নগ্ন হতে পারে। আবার গায়ে চাদর জড়ালেই ও হয়ে ওঠে ধূসর, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায় তখুনি।

প্রতিদিন সকালে, একটু বেলার দিকে, ও সেই বিশাল সাইপ্রেস গাছের তলায় গিয়ে শুয়ে থাকে আর খুশিয়াল ভঙ্গিমায় সূর্য এগিয়ে চলে আকাশ পরিক্রমায়। এতোদিনে ও দেহের প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে সূর্যকে চিনে নিয়েছে, ওর

কোথাও আর এতোটুকু হিমেল ছায়া বাকি পড়ে নেই। শুধু একটি মাত্র পরিপক্ক বাঁজাধার রেখে সূর্যের তেজে খসে পড়া ফুলের মতো ওর সেই উদ্বিগ্ন, পীড়িত হৃদয়টাও গেছে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে।

আকাশের ওই গলিত, নীল-আগুন-ঝরানো সূর্যকে জুলিয়েট চেনে। সমস্ত পৃথিবীতে আলো দেয় ওই সূর্য। কিন্তু জুলিয়েট যখন বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে থাকে, তখন সূর্য নিজের সমস্ত রশ্মি ওর দিকেই কেন্দ্রীভূত করে তোলে। সূর্যের এ এক পরম বিস্ময়—এক সঙ্গে লক্ষ কোটি মানুষকে আলো ছড়িয়েও সে নিজের প্রদীপ্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে শুধু ওর প্রতিই একাগ্র হয়ে উঠতে পারে।

সূর্য সম্পর্কে ওর উপলব্ধি এবং পার্থিব কামনার দিক দিয়ে সূর্যও ওকে জানে —এই বিশ্বাসবোধের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছ থেকে নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় জুলিয়েটের। সমস্ত মানুষ জাতি সম্পর্কেই এক ধরনের ঘৃণা অনুভব করে ও। মানুষ বড়ো অ-মৌলিক, অ-প্রাকৃতিক- কবরখানার মাটির তলার পোকার মতো মানুষও সূর্যের স্পর্শে বঞ্চিত।

এমন কি যে সমস্ত কৃষকেরা তাদের গাধাগুলোকে নিয়ে প্রাচীন পাহাড়ি পথ ধরে যাতায়াত করে, সূর্যের তাপে তাদের গায়ের রঙ কালো হয়ে উঠলেও তাদের অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লাগেনি। খোসার নিচে শামুকের শরীরের মতো মানুষের মনের গভীরেও ভীতির একটা ছোট্ট নরম সাদা কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেছে—সেখানে মানুষের আত্মা মৃত্যু এবং জীবনের স্বাভাবিক দীপ্তির ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। সর্বদা শুধু গুটিয়ে থাকা, পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ার সাহস নেই। সমস্ত মানুষই এমনি।

তাহলে মানুষকে আর মেনে নেওয়া কেন!

মানুষের প্রতি নির্বিকার উদাসীনতায় জুলিয়েট এখন আর নিজেকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্যে আগের মতো অতোটা সতর্ক থাকে না। মারিনিনা ওর জন্যে গ্রামে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে যায়। তাকে ও বলেছে, ডাক্তার ওকে সূর্যস্নান করতে বলেছেন। এটুকুই যথেষ্ট।

মারিনিনার বয়েস ষাটের ওপরে। লম্বা, রোগা, ঋজু চেহারা। মাথায় গাঢ় ধূসর রঙের কোঁকড়ানো চুল। গাঢ় ধূসর রঙের চোখ দুটিতে হাজার বছরের তীক্ষ্ণতা। আর হাসিতে শুধু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার চিহ্ন। বিয়োগান্ত বেদনা আসলে অভিজ্ঞতারই অভাব।

মারিনিনা যেভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্য মহিলাদের দিকে তাকায়, তেমনিভাবে দু'চোখে ধূর্ত হাসির ঝিলিক তুলে বললো, 'পোশাক-আশাক খুলে রোদে থাকতে—

নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে।' মারিনিনা ম্যাগনা গ্রাসিয়ার মেয়ে, ওর মনে দূর অতীতের স্মৃতি। ফের জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে ও অতীতের মেয়েদের মতো রুদ্ধশ্বাসে এক বিচিত্র হাসি ছড়ালো, 'কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সুন্দরী হতে হবে। তা না হলে সূর্যকে অপমান করা হয়। তাই নয় কি?'

'কে জানে আমি সুন্দরী কি না!' বললো জুলিয়েট।

কিন্তু সুন্দরী হোক বা না হোক, ও জানে যে সূর্য ওকে পছন্দ করেছে। যার অর্থ সেই একই।

রোদ না থাকলে মাঝে-মধ্যে দুপুর বেলা জুলিয়েট পাহাড়ি খাঁজটা থেকে পা টিপে টিপে গভীর গিরিখাতটাতে নেমে আসতো। সেখানে চিরন্তন ঠাণ্ডা ছায়ার রাজত্বে গাছে গাছে অসংখ্য লেবু। সেই নিবিড় স্তব্ধতায় কোনো একটা গভীর স্বচ্ছ সবুজ জলাশয়ে দ্রুত স্নান সেরে নেবার জন্যে গায়ের চাদর খসিয়ে ফেলতো ও। তারপর লেবুপাতার নিচে নগ্ন সবুজ গোধূলি আলোয় লক্ষ্য করতো, ওর সমস্ত দেহটা গোলাপি এবং গোলাপি থেকে ক্রমশ সোনালি হয়ে উঠছে। ওকে অন্য কারুর মতো মনে হতো। ও যেন অন্য কেউ।

তখন গ্রীকদের কথাটা মনে পড়তো ওর। গ্রীকরা বলতো: একটা সাদা, রোদ না লাগা শরীর সন্দেহজনক এবং অস্বাস্থ্যকর।

গায়ে সামান্য একটু জলপাই-তেল ঘষে জুলিয়েট অল্প কিছুক্ষণ সেই অন্ধকার লেবুবনে ঘুরে বেড়ায়, নাভিতে একটা লেবুফুল রাখার চেষ্টা করে হেসে ওঠে আপন মনে। কোনো চাষী ওকে দেখে ফেলতে পারে, এমন একটা সূক্ষ্ম সম্ভাবনা অবিশ্যি থাকে। কিন্তু তা হলে জুলিয়েট তাকে দেখে যতো না ভয় পাবে, সে জুলিয়েটকে দেখে ভয় পাবে আরও বেশি। পোশাকে ঢাকা মানুষের শরীরে ভয়ের সাদা কেন্দ্রবিন্দুটার কথা জুলিয়েট জানে।

জুলিয়েট জানে, ওর ছেলের মধ্যেও ভয়ের সেই কেন্দ্রবিন্দুটা রয়ে গেছে। ও রোদ ঝলমলে মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে, বলে, এখন ছেলে আর ওকে বিশ্বাস করে না। প্রতিদিন ও ছেলেকে জোর করে নগ্ন শরীরে রোদে হাঁটায়। এখন ওর ছোট্ট শরীরটাও গোলাপি হয়ে উঠেছে। সোনা রঙের ঘন চুলগুলো কপালের ওপর থেকে পেছন দিকে ঠেলে তোলা। রোদ-লাগা গায়ের চামড়ায় কোমল সোনালি আভা, গাল দুটো ডালিমের মতো রাঙা। ছেলেটা ভারি সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান। চাকর-বাকরেরা ওর লাল আর নীলে-সোনায় মেশানো সৌন্দর্যকে ভালোবেসে ওকে স্বর্গের দেবদূত বলে ডাকে।

কিন্তু মা-কে ও বিশ্বাস করে না, কারণ মা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। ছোট্ট

ভ্রূকুটির নিচে ওর নীল আয়ত চোখ দুটিতে জুলিয়েট ভয়ের সেই কেন্দ্রটাকে দেখতে পায়। জুলিয়েটের ধারণা, প্রত্যেক পুরুষমানুষেরই চোখের মাঝখানে ওই আতংকের আবাস। জুলিয়েট একে 'সূর্যাতঙ্ক' বলে।

'ও সূর্যকে ভয় পায়,' ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট অস্ফুটে নিজেকে বলে।

পাখির মতো কিচিরমিচির শব্দ তুলে ছেলেটাকে টলোমলো পায়ে রোদের মধ্যে চলতে ফিরতে আছাড় খেতে দেখে জুলিয়েটের মনে হয় খোলসের মধ্যে থাকা শামুকের মতো ও নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্যকে একটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে খোলসের মধ্যে শক্ত করে আটকে রেখেছে, লুকিয়ে রেখেছে সূর্যের কাছ থেকে। দেখতে দেখতে ছেলের বাবার কথা মনে হয় ওর। মনে হয়, ও যদি মানুষটাকে এগিয়ে আনতে পারতো। যদি সে জীবনকে অভিবাদন জানাতে বেপরোয়া হয়ে ভেঙে ফেলতে পারতো নিজের খোলসটাকে!

জুলিয়েট স্থির করে, ছেলেকে ও কাঁটাগাছগুলোর মাঝখানে সেই সাইপ্রেস গাছটার কাছে নিয়ে যাবে। কাঁটাগুলোর জন্যে ছেলের দিকে ওকে নজর রাখতে হবে বটে, কিন্তু ওখানে গেলে ছেলেটা নিশ্চয়ই নিজের ভেতরকার ছোট খোলসটাকে ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তখন সভ্যতার ছোট্ট উদ্বেগটুকু উধাও হয়ে যাবে ওর ভ্রূ দুটি থেকে।

একটা কম্বল পেতে ছেলেটাকে তার ওপরে বসিয়ে দেয় জুলিয়েট। তারপর নিজের গায়ের চাদরটা খসিয়ে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করে নীল আকাশের বুকে অনেক উঁচুতে উড়তে থাকা একটা বাজপাখি আর সাইপ্রেস গাছের নুয়ে পড়া চূড়োটাকে।

ছেলেটা কম্বলে বসে পাথর নিয়ে খেলা করছিলো। তারপর সে টলোমলো পায়ে এগুতে যেতেই জুলিয়েট উঠে বসলো। পেছন দিকে ফিরে ওর দিকে তাকালো ছেলেটা। ওর নীল চোখ দুটিতে অভিযোগের ভাষা, ঠিক যেন সত্যিকারের পুরুষমানুষের উষ্ণ দৃষ্টি। ছেলেটা সত্যিই সুদর্শন। গোলাপি রঙের শরীরে সোনালি রঙের রোম। গায়ের রঙ এখন আর ঠিক ফর্সা নয়, ঘন সোনালি।

'দেখো সোনা, কাঁটা আছে কিন্তু!' বললো জুলিয়েট।

'কাঁটা!' পাখির মতো কিচিরমিচির করে ওর কথার প্রতিধ্বনি তোলে বাচ্চাটা। তখনও ও কাঁধের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ছবিতে আঁকা এক নগ্ন দেবশিশু।

'বিচ্ছিরি কাঁটা।'

'বিছছিরি কাঁটা।'

ছোট্ট চটিটা পায়ে গলিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলে ছেলেটা। কিন্তু ও কাঁটা ঝোপের ওপরে গিয়ে পড়ার আগেই জুলিয়েট সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রতায় এক লাফে ওর কাছে পৌঁছে যায়। নিজের ক্ষিপ্রতায় নিজেই অবাক হয় ও। মনে মনে বলে, 'সত্যি, আমি একটা বন-বেড়ালী!'

রোদ থাকলে জুলিয়েট প্রতিদিনই ছেলেকে সাইপ্রেস গাছটার কাছে নিয়ে যায়।

বলে, 'চলো, আমরা সাইপ্রেস গাছের কাছে যাই।'

আর মেঘলা দিনে এলোমেলো দমকা হাওয়া বইলে ও যখন বাইরে বেরুতে পারে না তখন বাচ্চাটা অনবরত শুধু বলে, 'সাইপ্রেস গাছ! সাইপ্রেস গাছ!'

জুলিয়েটের মতো বাচ্চাটাও এখন গাছটার জন্যে অভাব অনুভব করে।

এ তো শুধু সূর্যস্নান নয়, এ তার চাইতেও অনেক কিছু বেশি। জুলিয়েটের মনের গভীরে কি যেন ভাঁজ খুলে শিথিল হয়ে ওঠে। ওর পরিচিত চেতনা আর বাসনার গভীরে থাকা কোনো এক রহস্যময় শক্তিস্রোত ওকে সূর্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেয়—স্রোতটা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসে ওর জরায়ু থেকে। জুলিয়েট নিজে, ওর সচেতন সত্তা—এখানে গৌণ, অপ্রধান, প্রায় একজন দর্শক। আর ওর দেহের গভীর থেকে সূর্যের দিকে বয়ে যাওয়া ওই রহস্যময় স্রোতটাই সত্যিকারের জুলিয়েট।

চিরদিন জুলিয়েট নিজেই নিজের কর্তৃত্ব করেছে। ও কি করছে না করছে, সে সম্পর্কে ও চিরদিনই সচেতন -নিজের শক্তির রাশ ও নিজেই সামলে রেখেছে চিরকাল। কিন্তু এখন ও নিজের গভীরে এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে। এ শক্তি ওর নিজের চাইতে প্রবল, এ শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। এখন ও নিজে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত—কিন্তু এমন এক শক্তির অধিকারী যা ওকেও ছাপিয়ে গেছে।

ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি হঠাৎ খুব গরম পড়লো। এখন সামান্য একটু হাওয়ার স্পর্শেই কাগজি-বাদামের ফুলগুলো হালকা গোলাপি রঙের তুষারের মতো ঝরে ঝরে পড়ে। চারদিকে ফিকে বেগনি রঙের ছোটোছোটো রেশমি অ্যানিমোন ফুল আর লম্বা ডাঁটির অ্যাসফোডেল। সমুদ্রটা ঝুমকো ফুলের মতো নীল।

জুলিয়েট আজকাল কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন

অধিকাংশ দিনই ও বাচ্চাটাকে নিয়ে নগ্ন শরীরে রোদ্দুরে থাকে এবং এর চাইতে বেশি আর কিছুই ও চায় না। মাঝে মাঝে ও স্নান করার জন্যে সমুদ্রে গিয়ে নামে এবং প্রায়ই রোদে-ভরা গিরিখাতগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কখনও বা গাধা নিয়ে চলা কোনো চাষীর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়, সে-ও দেখে ওকে। কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ও তখন সহজ আর শান্ত ভাবে চলে যায়। দেহ আব মনের নিরাময়ে সূর্যশক্তিব সুনাম ইতিমধ্যেই সকলের মধ্যে এতো ছড়িয়ে পড়েছে যে আজকাল এতে আর কোনো চাঞ্চল্য ও জাগে না।

বাচ্চাটা আর জুলিয়েট—দুজনেরই সর্বাঙ্গ এখন রোদে পুড়ে গাঢ় সোনালি হয়ে উঠেছে। নিজের আরক্তিম সোনালি স্তন আর উরুর দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট নিজেই নিজেকে বলে, 'এখন আমি এক অন্য মানুষ!'

বাচ্চাটাও এখন অন্য রকম হয়ে উঠেছে। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য প্রশান্তি আর সূর্য-গাঢ় তন্ময়তা। এখন ও নিজের মনেই নিঃশব্দে খেলা করে, ওব দিকে জুলিয়েটের লক্ষ্য রাখার কোনো প্রয়োজনই প্রায় হয় না। ও যেন বুঝতেও পারে না, ও কখন একা রয়েছে।

কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই, সমুদ্রে ঘন নীল রঙ। সাইপ্রেস গাছটার থাবার মতো বিশাল শিকড়ের পাশে বসে রোদে ঢুলছিলো জুলিয়েট। অথচ ওর স্তন দুটি তখনও সজাগ, প্রাণরসে ভবা। জুলিয়েট অনুভব করছিলো, ওর মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠছে যা ওকে জীবনের এক নতুন পথে নিয়ে যাবে। অথচ এ চাঞ্চল্য সম্পর্কে ও সচেতন হতে চাইছিলো না। কারণ সভ্যতার শীতল প্রাণহীন বিশাল যন্ত্রটাকে ও ভালো করেই জানে- এবং এ-ও জানে যে যন্ত্রটাকে এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন।

পাহাড়ি পথটা ধরে একটা কাঁটাগাছের বিশাল ব্যাপ্তির ওধারে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়েছিলো বাচ্চাটা। জুলিয়েট ওকে দেখতে পাচ্ছিলো। ওর মনে হচ্ছিলো, পোড়া সোনার মতো চুল আর আরক্তিম গাল এক সত্যিকারের স্বর্ণকান্তি দেবশিশু যেন ছোটো ছোটো ফুটকি দেওয়া ষটপত্রী ফুলগুলোকে সংগ্রহ করে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখছে। এখন ও আর চলতে গিয়ে টলে না, প্রয়োজনমতো দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারে।

একটা বাচ্চা জন্তুর মতো নিবিষ্ট হয়ে নিঃশব্দে খেলছিলো বাচ্চাটা। হঠাৎ ওর ডাক শুনতে পেলো জুলিয়েট. 'ছাখো মামন, ছাখো!'

ওর পাখির মতো কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুর শুনে জুলিযেট একটু ঝুঁকে

সামনের দিকে তাকাতেই ওর হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হয়ে গেলো। ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর ছোট্ট একখানা আলতো হাত তুলে গজ খানেক দূরে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটা সাপকে দেখাচ্ছে। মুখ খুলে হিসহিস শব্দ করছে সাপটা, নরম দো-ফলা জিভটা লকলক করছে একটা কালো ছায়ার মতো।

'মামন, দ্যাখো!'

'দেখেছি, সোনা। ওটা একটা সাপ!' ধীর গম্ভীর স্বরে বললো জুলিয়েট।

মার দিকে তাকিয়ে রইলো বাচ্চাটা। ওর আয়ত নীল চোখ দুটিতে দ্বিধার ছোঁয়া—যেন বুঝতে পারছে না, সাপটাকে ভয় পাবে কি না। তবু মা-র মুখে ফুটে ওঠা সূর্যের প্রশান্তি ওকে আশ্বস্ত করে তুললো।

'সাপ!' আধোভাষে বললো ছেলেটা।

'হ্যাঁ, সোনা! ওকে ছুঁয়ো না কিন্তু, ও কামড়ে দিতে পারে।'

সাপটা তখন মাথা নামিয়ে কুণ্ডলী খুলে নিজের দীর্ঘ বাদামি-সোনা দেহটাকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলো। ছেলেটা সেদিকে ফিরে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সাপটাকে লক্ষ্য করে বললো, 'সাপ চলে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, বাবা! ওকে যেতে দাও, ও একা থাকতে ভালোবাসে।'

সাপটা দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওর ধীর দীর্ঘায়িত শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। তারপর বললো, 'সাপ চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, চলে গেছে। এবারে তুমি মামনের কাছে একটু এসো তো সোনা!'

ছেলেটা এগিয়ে এসে নিজের গোলগাল ছোট্ট নগ্ন শরীরটা নিয়ে জুলিয়েটের নিরাবরণ কোলে বসলো। জুলিয়েট ওর রোদে পোড়া ঝলমলে চুলগুলোকে হাত বুলিয়ে ঠিকঠাক করে দিলো, কিন্তু কিছুই বললো না। ও অনুভব করছিলো; সমস্ত উদ্বেগই এখন শেষ হয়ে গেছে। সূর্যের স্নিগ্ধ করে তোলার আশ্চর্য শক্তি যেন একটা জাদুর মতো ওকে, এই সম্পূর্ণ জায়গাটাকে, একেবারে ভরিয়ে তুলেছে। এবং জুলিয়েট আর এই বাচ্চাটার মতো সাপটাও এই জায়গাটারই অংশ বিশেষ।

আর একদিন জুলিয়েট এক জলপাইবীথির শুকনো পাথুরে দেয়াল দিয়ে একটা কালো সাপকে এগিয়ে যেতে দেখলো।

'মারিনিনা, আমি একটা কালো সাপ দেখেছি। ওগুলো কি কোনো ক্ষতি করতে পারে?'

'না, কালো সাপ তা পারে না। কিন্তু হলদেগুলো পারে! সাপে কাটলেই মৃত্যু! তবে কিনা সাপ দেখলেই আমার ভয় করে, কালো সাপ দেখলেও।'

জুলিয়েট তবুও বাচ্চাটাকে নিয়ে সাইপ্রেস গাছটার কাছে যায়। কিন্তু বসার আগে চারদিক ভালো করে দেখে নেয়—বাচ্চাটা যে সমস্ত জায়গায় যেতে পারে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেয় সেই জায়গাগুলোকে। তারপর আবার সূর্যের দিকে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে। ওর তামাটে, নাশপাতির মতো স্তন দুটি উদ্ধত হয়ে থাকে আকাশের দিকে। আগামীকালের কোনো চিন্তা ও মনে রাখে না। নিজের বাগানটুকুর বাইরে আর কিছুই ও চিন্তা করতে চায় না। নিজে চিঠিও লেখে না—তবে নার্সকে চিঠি লিখে দিতে বলে।

মার্চ মাস। সূর্যটা ক্রমশ আরও প্রখর হয়ে উঠছে। দিনের উষ্ণ প্রহরগুলোতে জুলিয়েট গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে অথবা সেই ঠাণ্ডা লেবু গাছগুলোর গভীরে নেমে যায়। বাচ্চাটা দূরে দূরে ছুটে চলে—ঠিক যেন প্রাণের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকা একটা তরুণ প্রাণীর মতো।

একদিন বড়োসড়ো একটা জলের কুণ্ডে স্নান সেরে জুলিয়েট গিরিখাতের দুরন্ত ঢালে বসে রোদ পোহাচ্ছিলো। নিচে, লেবু গাছগুলোর তলায়, বাচ্চাটা ছায়ায় ফুটে থাকা হলুদ-রঙা অকসালিস ফুলগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে খসে পড়া লেবুগুলোকে কুড়োচ্ছিলো আর ওর তামাটে ছোট্ট শরীরটাতে ফুটে উঠছিলো আলো-ছায়ার বিচিত্র নকশা। হঠাৎ অনেক উঁচুতে, পূর্ণ আলোকিত বিবর্ণ নীল আকাশের পটভূমিকায়, পাহাড়ের ধারে, মারিনিনা এসে হাজির হলো। ওর মাথায় এক টুকরো কালো কাপড় বাঁধা। শান্ত গলায় ও ডাকলো, 'সিনোরা! সিনোরা জুলিয়েত্তা!'

মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ালো জুলিয়েট। মাথায় রোদে বিবর্ণ হয়ে ওঠা শুভ্র চুলের মেঘ নিয়ে তৎপর ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়ানো ওই নগ্ন নারীমূর্তিটিকে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মারিনিনা। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এলো ঢাল বেয়ে।

রৌদ্র-রঙা রমনীর কাছাকাছি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধা।

'সত্যি, তুমি কি সুন্দর!' শান্ত, প্রায় বিষণ্ণ স্বরে বললো ও। 'শোনো, ওই যে তোমার স্বামী।'

'আমার স্বামী!' চিৎকার করে উঠলো জুলিয়েট।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ স্বরে বৃদ্ধা হাসলো।

'কেন, তোমার তো একটি স্বামী আছেন—তাই নয় কি?'

'কিন্তু সে কোথায়?'

বৃদ্ধা ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো।

'আমার পেছন-পেছনই আসছিলেন। তবে পথ খুঁজে পাননি বোধ হয়।' শব্দ করে ফের একটু হাসলো মহিলা।

ঘাস আর ফুলে ফুলে পথগুলো উঁচু হয়ে ঢেকে গেছে। ঠিক যেন একটা আদিম বন্য জায়গা। সভ্যতার আদিম অঞ্চলে এ এক আশ্চর্য প্রাণময় বন্যতা, এ বন্যতা শুদ্ধ বা কঠোর নয়।

চিন্তিত চোখে পরিচারিকার দিকে তাকালো জুলিয়েট। তারপর বললো, 'বেশ তো! আসুক এখানে।'

'এখানে আসবে! এখন?' মারিনিনার হাসিভরা ঘোলাটে চোখ দুটো বিদ্রূপের দৃষ্টিতে ভরে ওঠে। তারপর দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলে বলে, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে। তবে ওঁর পক্ষে এটা একটা দুর্লভ দৃশ্য হবে!'

শব্দহীন আনন্দের হাসিতে মুখ খুললো মারিনিনা। তারপর বুকের কাছে লেবু জড়ো করতে থাকা বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বললো, 'বাচ্চাটা কি সুন্দর, দ্যাখো! ওকে দেখে সে বেচারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। তাহলে আমি ওঁকে নিয়ে আসিগে।'

'আনো,' বললো জুলিয়েট।

বৃদ্ধা হামাগুড়ি দিতে দিতে পথ ধরে দ্রুত ওপরে উঠে গেলো। আঙুর-বাগানের মাঝখানে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মরিস। তার মাথায় ধূসর রঙের ফেল্ট টুপি, পরনে ধূসর রঙা স্যুট। ঝলমলে রোদ আর প্রাচীন গ্রীক পৃথিবীর শোভার মাঝখানে একেবারেই খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছিলো মানুষটাকে। মনে হচ্ছিলো যেন এক ফোঁটা কালির কলঙ্ক।

'আসুন!' মারিনিনা বললো, 'উনি নিচে রয়েছেন।'

ঘাসের ভেতর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে ও দ্রুত মানুষটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তারপর উৎরাইয়ের মুখটাতে এসে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। অনেক নিচে লেবু গাছগুলোর অন্ধকার চূড়া।

'আপনি—আপনি এখান দিয়ে নেমে যান,' মরিসকে বললো মারিনিনা। চকিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে মরিস ওকে ধন্যবাদ জানালো।

মরিসের বয়স চল্লিশ বছর, পরিষ্কারভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো পাণ্ডুর

মুখ, ভীষণ শান্ত আর সত্যিকারের লাজুক। কোনো চমকপ্রদ সফলতা না পেলেও নিজের ব্যবসাটাকে সে সযত্নে আর সুন্দরভাবেই সামলে চলে। কাউকে বিশ্বাস করে না। ম্যাগনা গ্রাশিয়ার বৃদ্ধাটি এক পলক দেখেই বুঝেছিলো : মানুষটা ভালো, তবে বেচারা সত্যিকারের পুরুষমানুষ নয়।

'সিনোরা ওই নিচে রয়েছেন,' নিয়তির মতো আঙুল তুলে দেখালো মারিনিনা।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!' বিনা উচ্ছ্বাসে ফের ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাবধানে পা বাড়ালো মরিস। খুশিভরা দুষ্টুমিতে মুখখানা ওপরের দিকে তুলে মারিনিনা বাড়ির দিকে ফিরে গেলো।

ভূমধ্যসাগরীয় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে নামছিলো মরিস। তাই জুলিয়েটের একেবারে কাছাকাছি এসে ছোট্ট বাঁকটা না ঘোরা অব্দি সে ওকে দেখতে পায়নি। পাহাড়ি খাঁজটার কাছে নগ্ন শরীরে ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছিলো জুলিয়েট। রোদ আর প্রাণের উত্তাপে ঝলমল করছিলো ওর সমস্ত শরীর। স্তন দুটি যেন উদ্ধত, সতর্ক, যেন কি শোনার জন্যে প্রস্তুত। উরু দুটি বাদামি। চোষ-কাগজে কালির ফোঁটার মতো মরিস ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে আসতেই, জুলিয়েট চকিতে ভয়ে ভয়ে মরিসের দিকে তাকালো। মরিস, বেচারা মরিস, অপ্রস্তুতভাবে ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরালো তখন।

'এই যে, জুলি!' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে সামান্য কাশলো মরিস, 'অপূর্ব! বাঃ, অপূর্ব!'

মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেও মাঝে মাঝে জুলিয়েটের দিকে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগলো মরিস। জুলিয়েটের তামাটে ত্বকে যেন এক আশ্চর্য রেশমি দীপ্তি। যে কোনো কারণেই হোক, ওর নগ্নতাকে যেন ততোটা প্রকট বলে মনে হচ্ছিলো না। সূর্যের সোনালি আভাই যেন ওর আবরণ হয়ে রয়েছে।

'এসো, মরিস!' মানুষটার কাছ থেকে নিজেকে একটু পেছিয়ে আনলো জুলিয়েট, 'তুমি এতো শীগগিরি আসবে বলে আমি আশা করিনি।'

'না, মানে—কোনো রকমে একটু আগে আগে পালিয়ে এলাম, আর কি!' অপ্রস্তুতভাবে ফের একটু হাসলো মরিস।

পরস্পরের কাছ থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে। দুজনেই নিশ্চুপ।

'ইয়ে, মানে—অপূর্ব! অপূর্ব লাগছে তোমাকে!' মরিস শুধালো, 'তা,

ইয়ে··· মানে ছেলেটা কোথায়?'

'ওই তো,' ঘন ছায়ায় গাছ থেকে খসে পড়া লেবুগুলোকে জড়ো করতে থাকা উলঙ্গ ছেলেটাকে আঙুল তুলে দেখালো জুলিয়েট।

ছেলের বাবা অদ্ভুতভাবে সামান্য হাসলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই তো! ওই তো, ছোট্টখাট্টো মানুষটি! বাঃ, চমৎকার!' মরিসের ভীতু, চেপে রাখা মনটা সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো 'এই যে, জনি! জনি!' ছেলেকে ডাকলো মরিস, কিন্তু ডাকটা যেন খানিকটা দুর্বল শোনালো।

বাচ্চাটা চোখ তুলে তাকালো, ওর গোলগাল হাত দুটি থেকে লেবুগুলো খসে পড়লো, কিন্তু ও কোনো জবাব দিলো না।

'মনে হচ্ছে, আমাদেরই ওর কাছে যেতে হবে,' জুলিয়েট মুখ ঘুরিয়ে পথ ধরে নিচে নামতে শুরু করলো। মরিস অনুসরণ করলো ওকে। কোমরের মৃদু আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েটের নিতম্ব দুটির দ্রুত ওঠা-নামা দেখে মরিস মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হলো তার। নিজেকে নিয়ে সে কি করবে? গাঢ় ধূসর রঙা স্যুট, ফ্যাকাসে রঙের টুপি, লাজুক ব্যবসাদারের সাদামাঠা পাণ্ডুর মুখ—সব কিছু নিয়ে এখানে সে একেবারেই খাপছাড়া।

'ছেলটাকে দেখে মনে হয় ভালোই আছে—তাই না?' হলুদ-রঙা অকনালিস ফুলের অথৈ সমুদ্র পেরিয়ে লেবু গাছগুলোর তলায় এসে জিজ্ঞেস করলো জুলিয়েট।

'অ্যাঁ—হ্যাঁ, হ্যাঁ! চমৎকার, অপূর্ব! কি গো জনি, তুমি কি তোমার বাপিকে চেনো? চেনো তোমার বাপিকে?' নিচু হয়ে হাত দুটোকে বাড়িয়ে দিলো মরিস।

'কতো লেবু!' বাচ্চাটা আধোভাষে বললো, 'দুটো লেবু!'

'দুটো লেবু!' মরিস বললো, 'অনেক লেবু।'

বাচ্চাটা এগিয়ে এসে বাবার দু'হাতে দুটো লেবু তুলে দিলো। তারপর বাবাকে দেখবে বলে একটু পেছিয়ে দাঁড়ালো।

'দুটো লেবু!' ফের বললো মরিস। 'এসো জনি! এগিয়ে এসে বাপিকে একটু ডাকো তো, সোনা!'

'বাপি চলে যাচ্ছো?' বাচ্চাটা শুধালো।

'চলে যাচ্ছি? না, মানে আজকে না।'

দু'হাতে ছেলেকে তুলে নিলো মরিস।

'কোট খোলো! বাপি তুমি কোট খোলো!' ছেলেটা ছটফট করে মরিসের পোশাকের সৌষ্ঠব নষ্ট করে দেয়।

'ঠিক আছে, সোনা। বাপি কোট খুলছে।'

গায়ের কোট খুলে সযত্নে সেটা এক পাশে রেখে, ফের ছেলেকে তুলে নিলো মরিস। নগ্নিকা জুলিয়েট শুধু শার্ট পরা মানুষটার কোলে উলঙ্গ শিশুটার দিকে তাকালো। ছেলেটা ততোক্ষণে বাবার টুপিটাকেও টেনে খুলে ফেলেছে। স্বামীর পাতা কেটে আঁচড়ানো কাঁচা-পাকা চুলগুলোর দিকে তাকালো জুলিয়েট। একটি চুলও এধার-ওধারে এলোমেলো হয়ে নেই। ঘরমুখো, প্রচণ্ড ঘরমুখো মানুষ। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলো ও। আর ততোক্ষণ বাবা কথা বলে চললো ছেলের সঙ্গে। ছেলেটা ভালোবাসে ওর বাপিকে।

'এ ব্যাপারে তুমি কি করবে, মরিস?' আচমকা প্রশ্ন করলো জুলিয়েট।

চকিতে আড়চোখে ওর দিকে তাকালো মরিস।

ইয়ে—মানে, কোন্ ব্যাপারে, জুলি?'

'সমস্ত ব্যাপারেই। এ ব্যাপারেও! আমি আর সেই ইস্ট ফটিসেভেনথ স্ট্রীটে ফিরে যেতে পারবো না।'

'ইয়ে- না, তা অবিশ্যি নয়।' মরিস ইতস্তত করে, 'অন্তত এখন তো নয়ই।'

'কোনোদিনও না,' জবাব দিলো জুলিয়েট। তারপর স্তব্ধতা।

'ইয়ে—মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' মরিস বললো।

'তোমার কি মনে হয়? তুমি কি এখানে চলে আসতে পারবে?' জুলিয়েট জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ! মাসখানেক এসে থাকতে পারবো। মনে হয় এক মাসের মতো বন্দোবস্ত করে ফেলা যাবে।' সামান্য ইতস্তত করলো মরিস। তারপর সাহস করে লাজুক চোখে জুলিয়েটের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, ফের মুখ লুকিয়ে নিলো।

জুলিয়েট স্বামীর দিকে তাকালো। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠলো ওর সতর্ক স্তন দুটি। যেন এক অস্থিরতার বাতাস কাঁপিয়ে দিলো ওর স্তন দুটিকে।

'আমি ফিরে যেতে পারবো না।' ধীরে ধীরে ও বললো, 'এমন সূর্যকে ছেড়ে আমি ফিরে যেতে পারি না। তুমি যদি এখানে আসতে না পারো…'

অসমাপ্ত রেখেই কথাটা শেষ করলো জুলিয়েট। চোরাচোখে বারবার ওর দিকে তাকালো মরিস। কিন্তু বিভ্রান্তি কমে গিয়ে ক্রমশ তার মনে মুগ্ধতাবোধ

বেড়ে উঠতে লাগলো।

'না।' মরিস বললো, 'এ সব কিছুই তোমার পক্ষে ভালো। কতো সুন্দর হয়ে উঠেছো তুমি! না, আমার মনে হয় না তুমি আর ফিরে যেতে পারবে।'

নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটটাতে জুলিয়েটকে ভাবছিলো মরিস। সেখানে সেই বিবর্ণ মৌন জুলিয়েটকে দেখে ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতো সে। মানবিক সম্পর্কের দিক দিয়ে মরিস শান্ত এবং ভীরু প্রকৃতির মানুষ। বাচ্চাটা জন্মাবার পর জুলিয়েটের নিশ্চুপ অথচ ভয়ংকর বিরোধিতা তাকে গভীরভাবে শংকিত করে তুলেছিলো। কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো, এ ছাড়া জুলিয়েটের আর কোনো পথ নেই। সমস্ত মেয়েই এমনি। ওদের অনুভূতিগুলো একটা বিপরীত পথ খুঁজে নেয়, এমন কি ওদের নিজেদের বিরুদ্ধেও চলে যায় এবং তখন সেটা ভয়ংকর—একেবারে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। যে মেয়ের অনুভূতিগুলো তার নিজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে, তেমন কোনো মেয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করা একেবারে ভয়াবহ! মরিসের মনে হতো, জুলিয়েটের অসহায় বিরোধিতার যাঁতাকলে সে যেন চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়েছে জুলিয়েট এবং সেই সঙ্গে ওদের বাচ্চাটাও। না, তার চাইতে বরং অন্য যা কিছু হোক—তাই-ই ভালো।

কিন্তু তুমি কি করবে?' জুলিয়েট জানতে চাইলো।

'আমি? তা আমি ধরো—ইয়ে—মানে যদ্দিন তুমি এখানে থাকতে চাও, ততদ্দিন আমি ব্যবসাপত্তর চালাবো আর ছুটিছাটায় এখানে আসবো। তোমার যদ্দিন এখানে থাকতে ইচ্ছে হয়, থাকো।' বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মরিস চোখ তুলে জুলিয়েটের দিকে তাকালো। তার অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে এক সনির্বন্ধ মিনতির স্পর্শ।

'চিরদিনের জন্যে হলেও?'

'হ্যাঁ—মানে, তুমি যদি তা-ই চাও। চিরদিন মানে অনেকটা সময়। তার মধ্যে তো একটা তারিখ ঠিক করে দেয়া যায় না!'

'আর...আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি?' প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে সরাসরি মরিসের চোখের দিকে তাকালো জুলিয়েট। ওর গোলাপি, বাতাসে কঠোর হয়ে ওঠা নগ্নতার কাছে মরিস একেবারে অক্ষম, অসহায়।

'হ্যাঁ, ইয়ে—মানে, তা পারো বই কি! মানে, যতোক্ষণ তুমি নিজেকে বা ছেলেটাকে অখুশি করে না তুলছো—ততোক্ষণ অব্দি।'

ফের এক জটিল, অস্বস্তিময় আবেদন নিয়ে জুলিয়েটের দিকে তাকালো মরিস। তার মনে বাচ্চাটার চিন্তা আর নিজের সম্পর্কে আশা।

'তা আমি করবো না,' দ্রুত জবাব দিলো জুলিয়েট।

'না, না। আমারও মনে হয় না, তুমি তা করবে।'

তারপর দুজনেই চুপ। গ্রামের ঘণ্টাগুলোতে দ্রুতলয়ে দুপুরের সংকেত বাজলো। তার অর্থ, দুপুরের খাওয়ার সময়।

ক্রেপ কাপড়ের ধূসর কিমোনোটা গায়ে গলিয়ে কোমরে সবুজ কাপড়ের একটা চওড়া পট্টি বেঁধে নিলো জুলিয়েট। তারপর ছেলেটার মাথা দিয়ে ছোট্ট একটা নীল জামা গলিয়ে, সবাই মিলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

টেবিলে বসে স্বামীকে ভালো করে লক্ষ্য করলো জুলিয়েট। লক্ষ্য করলো মানুষটার শহুরে পাণ্ডুর মুখ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো কাঁচা-পাকা চুল, টেবিলে বসে খাওয়ার নিখুঁত আদব কায়দা, পান ও ভোজনের চরম পরিমিতিবোধ— সবকিছুই। অল্প বয়সে বন্দী হয়ে আজীবন বন্দীদশায় কাটানো জন্তুর মতো মানুষটার চোখ দুটো সোনালি-ধূসর।

কফি খাওয়ার জন্যে ওরা বারান্দায় গেলো। নিচে, অনেক দূরে, ছোট্ট খাড়াই গিরিখাতটার ওধারে সবুজ গমক্ষেতটার কাছে মাটিতে একখণ্ড সাদা কাপড় বিছিয়ে এক চাষী আর তার স্ত্রী একটা কাগজি-বাদাম গাছের তলায় বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলো। ওদের সামনে মস্তো বড়ো একখণ্ড রুটি আর কয়েক গ্লাস ঘন রঙের মদ।

জুলিয়েট স্বামীকে ওই ছবিটার দিকে পেছন করে বসালো আর নিজে বসলো মুখোমুখি হয়ে। কারণ ও আর মরিস বারান্দায় আসতেই চাষীটা মুখ তুলে তাকিয়েছিলো।

দূর থেকে দেখে ওই চাষীকে জুলিয়েট বেশ ভালোভাবেই চেনে। লোকটা একটু মোটাসোটা, খুব চওড়া শরীর, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ, মুখভর্তি করে রুটি নিয়ে চিবোয়। ওর স্ত্রীর মুখখানা কঠোর, সুন্দর আর বিষণ্ন। ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ওদের সম্পর্কে শুধু এটুকুই জেনেছে জুলিয়েট।

গিরিখাতের উলটো দিকের জমিতে চাষীটি অধিকাংশ কাজই একা-একা করে। ওর পরনে সাদা পাতলুন, গায়ে রঙিন জামা আর মাথায় একটা পুরনো টুপি। লোকটার পোশাক-আশাক সব সময়েই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি থাকে। ও আর ওর স্ত্রী—দুজনের মধ্যেই একটা শান্ত আভিজাত্য আছে, যা কোনো শ্রেণীবিশেষের মধ্যে থাকে না, থাকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে।

সজীবতাই মানুষটার বড়ো আকর্ষণ। শক্তসমর্থ চওড়া শরীর হওয়া সত্ত্বেও

এক অদ্ভুত ক্ষিপ্র উদ্দীপনা ওর চলাফেরার মধ্যে এক আশ্চর্য মাধুর্য এনে দেয়। প্রথমদিকে, সূর্যস্নান করার আগে, একদিন গিরিখাতটা পেরিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের মাঝখানে আচমকা মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো জুলিয়েটের। জুলিয়েট তাকে দেখতে পাবার আগেই সে জুলিয়েটের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। তাই জুলিয়েট চোখ তুলে তাকাতেই সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে, আয়ত দুটি নীল চোখে লজ্জা আর অহংকারভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো ওর দিকে। লোকটার মুখখানা চওড়া, রোদে-পোড়া, ঠোঁটের ওপরে বাদামি রঙের ছাঁটা গোঁফ আর চওড়া কপালে প্রায় গোঁফের মতোই পুরু একজোড়া ভুরু।

'আমি এখানে বেড়াতে পারি?' জিজ্ঞেস করেছিলো জুলিয়েট।

'নিশ্চয়ই!' চলাফেরার মতোই আশ্চর্য তৎপরতায় জবাব দিয়েছিলো মানুষটা, 'এ জমিতে আপনি ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন।'

তারপর স্বভাবগত লাজুক উদারতায় দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো মানুষটা। জুলিয়েটও চলে এসেছিলো তাড়াতাড়ি। কিন্তু মানুষটার রক্তগত উদ্দাম উদারতা আর তেমনি সমান নিবিড় দ্বিধাগ্রস্ততাকে ও চিনে নিয়েছিলো সেই মুহূর্তেই।

তারপর থেকে জুলিয়েট প্রতিদিনই দূর থেকে মানুষটাকে দেখেছে আর বুঝেছে, একটা ক্ষিপ্র প্রাণীর মতো ওই মানুষটাও অধিকাংশ সময় নিজের মনেই থাকে। স্ত্রী ওকে নিবিড় করে ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসার মধ্যে মিশে রয়েছে ঈর্ষা, যা প্রায় ঘৃণারই নামান্তর। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্ত্রী তার যতোটুকু নিতে পারে, সে নিজেকে তার চাইতেও বেশি করে দিতে চায়।

একদিন জুলিয়েট দেখেছিলো, একটা গাছের তলায় বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে মানুষটা মনের আনন্দে একটা শিশুর সঙ্গে নাচছে আর তার স্ত্রী বিষণ্ণ মুখে তা দেখছে।

ক্রমশ দূর থেকেই জুলিয়েট আর ওই মানুষটা পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একজন সচেতন হয়ে উঠেছে অন্যজনের সম্পর্কে। জুলিয়েট জানে, সকালবেলা মানুষটা কখন তার গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছবে। যে মুহূর্তে জুলিয়েট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, তক্ষুনি ওর দিকে ফিরে তাকায় মানুষটা। কিন্তু কখনও ওকে অভিবাদন জানায় না। তবু যেদিন সে ক্ষেতে কাজ করতে আসে না, সেদিন মানুষটার জন্যে একটা অভাব অনুভব করে জুলিয়েট।

একদিন এক উষ্ণ সকালে দুটো জমির মাঝখানে গিরিখাতটার গভীরে নগ্নশরীরে ঘুরে বেড়াবার সময় জুলিয়েট হঠাৎ মানুষটার সামনে গিয়ে পড়েছিলো। মানুষটা তখন নিচু হয়ে সবল কাঁধ দুটোতে কাঠ তুলছিলো, নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা গাধাটার পিঠে চাপাবে বলে। আরক্তিম মুখটা ওপরে তুলতেই জুলিয়েটকে দেখতে পেয়েছিলো সে—জুলিয়েট তখন পেছনে সরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার চোখে একটা শিখা জেগে উঠেছিলো আর একটা শিখা জুলিয়েটের শরীরের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গলিয়ে দিয়েছিলো ওর হাড়গুলোকে। অথচ ও তখন নিঃশব্দে ঝোপগুলোর পেছনে সরে গিয়েছিলো—ফিরে গিয়েছিলো যেদিক দিয়ে ও এসেছিলো, সেদিকেই। ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মানুষটা কিভাবে অমন নিঃশব্দে কাজ করে, তা ভেবে খানিকটা বিরক্ত আর অবাক হয়েছিলো ও। বুনো জন্তুদের মতো এই গুণটা আছে মানুষটার।

সেই থেকে ওদের দুজনের শরীরেই সচেতনতার এক সুস্পষ্ট বেদনা—যদিও ওরা কেউই তা স্বীকার করে না এবং স্বীকার করার কোনো ইঙ্গিতও প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষটার স্ত্রী সহজাত প্রবৃত্তিবশেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

জুলিয়েট ভেবেছে, কেন আমি এই মানুষটার সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যে মিলিত হয়ে ওর সন্তান ধারণ করবো না? একটি পুরুষের জীবনের সঙ্গেই বা কেন আমার জীবনকে একাত্ম করে রাখতে হবে? যতোদিন কামনা-বাসনা রয়েছে, ততোদিন কেন আমি দেখা করবো না ওর সঙ্গে? এখনই তো আমাদের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে!

কিন্তু জুলিয়েট কোনোদিনও কোনো ইঙ্গিত প্রকাশ করেনি। আর এখন ও দেখলো—মাটিতে বেছানো সাদা কাপড়টার পাশে, কালো পোশাক পরা স্ত্রীর মুখোমুখি বসে মানুষটা মুখ তুলে মরিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার স্ত্রীও মুখ ঘুরিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো।

জুলিয়েট অনুভব করলো, এক সুতীব্র বিরাগে ওর সমস্ত মন ভরে উঠেছে। আবার ওকে মরিসের সন্তান বহন করতে হবে। স্বামীর দৃষ্টিতে ও তা দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে ওর কথার জবাবে স্বামীর কথা শুনেও।

'তুমিও পোশাক ছেড়ে রোদ্দুরে হেঁটে বেড়াবে?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলো ও।

'কি বলে · ইয়ে—মানে, হ্যাঁ! এখানে যখন রয়েছি, তখন তা করতে ভালোই

লাগবে। আশা করি জায়গাটা একেবারেই নিরিবিলি, তাই না?'

মরিসের চোখে এক আশ্চর্য দীপ্তি, তাতে বাসনার দুঃসাহস। চকিতে চাদরে ঢাকা জুলিয়েটের উদ্ধত স্তন দুটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়েছিলো সে। তার দিক থেকে দেখতে গেলে, সে-ও একটা পুরুষমানুষ, সে-ও পৃথিবীর মুখোমুখি হয়েছে –কিন্তু তার পুরুষ-সত্তার তৃষ্ণা এখনও সম্পূর্ণ মেটেনি। হাস্যকর-ভাবে হলেও, সে রোদ্দুরে হেঁটে বেড়াবার সাহস রাখে।

কিন্তু মরিসের সমস্ত অস্তিত্বে দাসত্বের শৃঙ্খল আর বর্ণসংকরের ভীরুতায় ভরা পৃথিবীর গন্ধ। তার সত্তায় যে ছাপটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সেরা সামগ্রীর ছাপ নয়।

জুলিয়েট এখন সুপক্ক, সম্পূর্ণ পরিণত। সূর্যরশ্মির স্পর্শে ওর সবাঙ্গে এখন ফিকে গোলাপি আভা। আর হৃদয়টা খসে পড়া গোলাপের মতো। প্রাণময়তায় উষ্ণ আর লাজুক ওই চাষীর কাছে নিজেকে নিবেদন করে ও তার সন্তানকে দেহে ধারণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওর আবেগভরা অনুভূতিগুলো ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে গেছে। মানুষটার রৌদ্রদগ্ধ মুখে ও রক্তের উচ্ছ্বাস দেখেছে, আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখেছে তার দক্ষিণী নীল চোখ দুটিতে। আর তার জবাবে ওর ভেতরে জেগে উঠেছে দুরন্ত আগুনের বন্যা। ওই চাষী ওর কাছে এক জন্মদায়ক সূর্যস্নান হতে পারতো, আর জুলিয়েটও তা-ই চেয়েছিলো।

তবু ওর পরবর্তী সন্তানটি হবে মরিসের। ধারাবাহিকতার নিদারুণ শৃঙ্খলই হবে তার কারণ।